

ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା-

ସ୍ୱର୍ଗମନ୍ତ ଦାକ୍ଷତ୍ୱ

କବିରାଜ
୧୯୭୮

ভূমিকা

সেটা ছিলো পথ তৈরীকরণ। যাবা পথ তৈরী করতে এলো তারা অবিশ্বাস, উপেক্ষা, বিবোধিতা, দেশবাসীৰ উদাসীনতা, সব তুচ্ছ কবে স্বাধীনতার শিখবে পৌছাবার জন্তে পথ বচনা করতে লেগে গেলো। বড়ো ঐক্য ছিলো সেই সাধনা। পবল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কোনো অবস্থাতেই সহজ নয়, আব দেশের তখনকার অবস্থাতে সেটিব বাস্তব সাধনত সম্বন্ধে খুব অল্প লোকেরই বিশ্বাস ছিলো। এমন অবস্থায় যাবা এগিয়ে এলো তারা ভ্রাসাবাদী নিকাম আদর্শবাদী। তাদের অন্তর্বেব মধ্যে দেশাত্মবোধ ও মানব-প্রেমের অনিবার্ণ দীপ-শিখা জ্বলিয়ে দিয়েছেন বামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দৈবচন্দ্র বিজ্ঞানাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, অবিনন্দ ও আরো বহু মননশীল সাধকবাব।

আত্ম-অবস্থানী জাতিবে জাতিব মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা ও পবম আত্মিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন কবে তোলবাব তন্ত্বে শতাব্দীব্যাপী সাধনা কবে গিয়েছিলে এহ অনগ্রসাধারণ পুরুষের। জাতিব ও ব্যক্তির জীবিত্র এমন কোনো সমস্তা ছিলো না যাব উপবে তাঁদের প্রদীপ্ত মনের আলো পড়ে নি, যার সমাধান তারা যোগানান।

জাতির চিত্ত ভূমিতে যখন পাল পড়লো তখন জাতির চিত্তের বক্ষ্যাক্ষ ঘুচলো আর জাতিব চেতনা-দীপ্ত মন বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সর্বপ্রকার মুক্তির দিকে যাত্রা শুরু কবে দিলো।

বাজনৈতিক স্বাধীনতায যাত্রা এই অমিতবীৰ্যশালী পুরুষেরাই শুরু কবিয়ে দিলেন।

সেই পথ তৈরীর যুগের তৃতীয় পর্বেব ছবি এঁকেছেন ক্রীষ্টপূর্ণাশ্রম দাশগুপ্ত তাঁর 'বিপ্লবেব পথে' বইটিতে। এই যুগের বহু তথ্য বা

বিপ্লবের পথে

শুধু বৈপ্লবিক আন্দোলনেব কর্মীদের জানা ছিলো, অজানা ছিলো দেশবাসীদের, সেগুলি গ্রন্থকার আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন। কিন্তু বইটি শুধু তথ্যের তালিকা নয়, আর বর্তমান কালের আত্মজীবনী লেখকদের যেটি বিশেষত্ব আত্ম-বিজ্ঞপ্তি, সেই রুচিহীন বিশেষত্বের কালিমা চিহ্নিত নয়।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত হাসতে জানেন ও নিজেকে বিক্রপ করবার তাগদ রাখেন। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ে কারাগারের অকরণ ধূসর অবস্থাতেও হাসির অভাব, রসের দৈন্ত্য কখনও অনুভব করি নি তাঁর আলাপ আলোচনায়।

যার রস-জ্ঞান নেই সে মানুষ ভয়ঙ্কর, তাকে ভয় করে সাত হাত দূর থেকে চলা ভালো। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের মানবতা-বোধ ও রস-জ্ঞানের পরিচয় 'বিপ্লবের পথে' বইটিতে পাবেন বলে আমার বিশ্বাস। বইয়ের সবটাই সমান বৃহ্নির সাক্ষী দেয় না, কিন্তু গোটা বইটিতেই বৃহ্নির মুল্লিমানার দাবী ক'জন লেখকই বা করতে পাবেন! এটাও স্মরণ রাখা দবকার যে 'বিপ্লবের পথে' হচ্ছে লেখকের সর্বপ্রথম প্রয়াস সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

১৮ই পৌষ, ১৩৬৪

গৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তের 'বিপ্লবের পথে' তার বিপ্লবী-জীবনের কাহিনীই শুধু নহে, বাংলার বিপ্লব-প্রয়াসের একটা বলিষ্ঠ অধ্যায়ের রোমাঞ্চকর চিত্র। যাহারা স্বদীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত বিদেশী শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন তাহারা তাঁহাদের কর্মপ্রয়াস ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিলে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ও কর্মপ্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ অনেকটা সহজ-সাধ্য হয়। সেদিক হইতেই এই 'বিপ্লবের পথে' গ্রন্থের মূল্য আছে। শ্রীপূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে আমি প্রজ্ঞা করি, যেমন করি আবও বাংলাব ও ভারতব বিপ্লব-কামীদের, যাহাদের বিপ্লবেব আদর্শ-নিষ্ঠা ববাবব অল্লান রহিয়াছে। এই ধরনের বিপ্লব-নিষ্ঠ কর্মীগণ কি বাহিবে, কি কাবাভ্যন্তবে, সকল সময়েই অদম্য ও অনির্বাণ সংগ্রাম-শীলতাএ পরিচয় দিয়াছেন। এট সংগ্রাম-নিষ্ঠ বিপ্লবী লেখকের 'বিপ্লবের পথে' পাঠ কবিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পাবিবেন এই দুর্গম পথ-যাত্রীদের যে পাথেয় সঞ্চয় ছিল তাহা আপোষ-হীন আদর্শ-নিষ্ঠার দুষ্চর তপস্তার দ্বারাঐ শুধু সম্ভব হইয়াছিল।

লেখকের কথা

আমার লেখা আত্মজীবনী নয়। আত্মজীবনী লিখবাব সক্ষম
আমার নেই। সৈনিকের ডায়েরীর মত স্বাধীনতা সংগ্রামের অভিজ্ঞতা
এনের মতো বেখেঁচিলাম। কালের গতিপথে তা নিশ্চয় হয়ে যাওয়ার
পূর্বে লেখনীতে আবদ্ধ হবে বাণীব ইচ্ছা হলো। তাইই জগৎ আমার
এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

স্বাধীনতার ইতিহাসে আমার অবদান নগণ্য—সামান্য একটি
সৈনিকের মতন। সমুদ্রের বেলাভূমিতে গুণ্ডনতি বালুকণা যেমন,
স্বাধীনতার বিস্তৃত ইতিহাসে আমার অবদানও তেমন।
তবুও তাই মূল্য আছে—স্বাধীনতার ইতিহাসে প্রযোজনীয়। সভ্যতার
ইতিহাসে পিছে ইটাব ও আগে বাডাব নজির আছে—এভাবেই মানব
সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। ভাবতেই সভ্যতা এগিয়ে নেবার জন্য ভারতের
স্বাধীনতার প্রাঙ্গণে বহু আদর্শ-মানুষ ও মননশীল ব্যক্তিরা জন্ম নিলেন।
তাইই ভাবতক্রে জাগিয়ে তুললেন। সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার মঞ্চে
দীক্ষিত করবার জন্য মন্ত্রণাও পাবি বক্ষিমচন্দ্র দিখে গেলেন অমর
আদর্শ, তার চিত্র-ভাস্কর লেখনিতে। কবিতাও বলাইশে গানে,
গাঁথায়, কবিতায়, সাহিত্যে। ভাবতক্রে বেঁধে দিলেন স্তম্ভবিড় এক এক
বন্ধনে—অতীত ও বর্তমান এক হয়ে দেখা দিল। জাতির প্রভুতি
ঘোষণা করলেন খুদীবাম ও কানাইলাল নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে।
বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান তৈরী হলো, পি মিত্র, বিপিন পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে।
“সম্মত্য” “যুগান্তর” তাদের অগ্নি-গর্ভ বাগী নিয়ে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে
তুললো অপূর্ব প্রেরণা ও আত্মত্যাগে।

তাদের আদর্শ বহন করে চললো বাংলায় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান-
গুলো—অমূল্য, যুগান্তর ও পরবর্তী কালের বি, ভি, ত্রীমুখ প্রভৃতি।
তাদেরই হাতে গড়া ‘মামুদ আমরা, বন্ধুদের “সম্মান”। শোষিত
নিপীড়িত ভাবে পবাস্বীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার লক্ষ্যে

বিপ্লবের পথে

পৌছাবার আদর্শ তখনও জন মনে আত্মপ্রকাশ করেনি। জাতির এই অর্ধচেতনার যুগে স্বাধীনতার উচ্চাদর্শের দুর্গম পথ বেছে নিল, সম্ভানের দল। স্বাধীনতার জয়যাত্রার ইতিহাস সূচিত হলো। গ্রেপ্তার, কারাবরণ, দীপান্তর, ফাঁসী বা গুলিতে হত্যা। বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখা দিল। বাংলার আন্দোলন ভারতে ছড়িয়ে পড়লো।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর ঘটনাবলীর স্বযোগে ইংরেজ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জগ্ৰ যে ব্যাপক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ, নগেন দত্ত, (গিরিজা দত্ত) শচীন্দ্র সান্যাল, নরেন্দ্র ভট্টাচার্য গুরু মুখ সিং, কর্তার সিং, পিংলে প্রভৃতির নেতৃত্বে, তাতে প্রকাশ পেলো বিপ্লবীদের জাতীয় নেতৃত্ব করবার ক্ষমতা। এবং স্বাধীনতার আদর্শের উপর তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁদের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর একাদিকে বৈপ্লবিক দলের বহুসংখ্যক নেতৃবৃন্দ ও সভ্যদের এবং অস্ত্রাদিকে সৈন্যবাহিনীর সিপাহী ও অফিসারদের গ্রেপ্তার, নির্বাসন, কারাদণ্ড ও ফাঁসী বা গুলিতে হত্যাপর্য্যক অনিবার্যরূপে গ্রহণ হলো। ব্যর্থতার মানি ও পরাজয়ের পরিণাম জেনে বা দেখেও বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি স্বাধীনতার দৃঢ়তর তপস্বী থেকে বিরত হলো না। অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সম্মুখীন হবার জগ্ৰ তারা আবার নতুন করে তৈরী হতে লাগল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটলো, ১৯২০ সালের পর। আবেদন, নিবেদনের পালা শেষ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী কংগ্রেস জানালো—পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ তখনও বহু দূরে। শাসক ইংরেজ “স্বচাগ্র-মেদিনী”ও ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। কংগ্রেসের স্বায়ত্ত-শাসন মূলক দাবীর সঙ্গে সহায়ত্বভূতি রেখে বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলনের পাথে পা মিলালো, তাকে এগিয়ে নেবার জগ্ৰ। গোপন ও অর্ধগোপন বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি সারা বাংলায়

বিপ্লবের পথে

নানাভাবে ছড়িয়ে ছিলো—আদর্শ-নিষ্ঠ ও ত্যাগব্রতী বিপ্লবী সমাজের সহযোগিতার ও পবিচালনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সকাব্রই গড়ে উঠলো।

বিপ্লবীরা স্বাধীনতার আদর্শে পৌছাবার চিন্তাচালিত পন্থা ত্যাগ কবলো না—আহিংস আন্দোলনে সহযোগিতা বোঝে বৈপ্লবিক পন্থা তাবা অতুসরণ কবে চললো। তাই গ্রেপ্তার, কারাবরণ, দীপান্তর ব ফাঁসীব বহব কংগ্রেসেব স্বায়ত্ত শাসন আন্দোলনেব সঙ্গে সঙ্গেই চলতে শুরু কবলো। শুদীষ কাল ববে স্বাধীনতার পথ তৈরী কবেছিলো যাবা, যাদেব ত্যাগ বাীবত্ব ও আদর্শ-নিষ্ঠা, গণ চেতনা ও গণ-সাগরণ সম্ভব কবে তুলেছিলো, তাবা ছিলো। ভাবতেব পূর্ণ স্বাধীনতােব আদর্শেব অকুজ্রিম পূজাবা, জাতিব প্রাণশক্তি।

১৯২৯ সালে জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করলো। কিন্তু ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আহিংস আন্দোলনেব মধ্য দিবে স্বাধীনতােব দাবী বাজশক্তিকে দিয়ে নাবা মানাতে সক্ষম হয়ান। বিপ্লবীরাও নিকীসন কারাদণ্ড বা জীবন আছতি দিয়ে তােব আদর্শে পৌছতে পারেনি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব শেষ অব্যায়ে হংরেজ সাম্রাজ্যাদেব দুর্বলতা, সুভাষচন্দ্রেব নেতৃত্ব আজাদ-হিন্দ ফৌজের আঘাত ও তােব প্রতিক্রিয়া-জনিত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ভারতে স্বাধীনতােব পথ প্রশস্ত কবে দিলো। শ্রমিক দলেব ভারতেব আশা আকাঙ্ক্ষাব প্রতি সহানুভূতি ইংরেজেব ভাবত ত্যাগ প্রত্নকে বাস্তবে পরিণত কবলো। জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক সংঘর্ষেব পরিণামেব ফলে তা' সম্ভব হয়ে দেখা দিলো। তবু ও অবিমিশ্র আশীর্বাদরূপে ভারতে স্বাধীনতা এলোন। ভাবত ভাগ হয়ে গেলো। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের হাতে ক্ষমতা দিয়ে ইংবাজ বাজশক্তি ভারত ত্যাগ কবলো।

ইতিহাসের অগ্রগতের মুখে অতীত কালেব ঘটনা ও কার্যপন্থার এনে দিয়েছে বর্তমানের স্বাধীনতা। তাই স্বাধীনতার বুনানীতে, তার

বিপ্লবের গথে

বক্ষণ ও বিস্তারে, বস্তুমানের ন্যায় অতীতেব অভিজ্ঞতাগুলিব প্রয়োজন কম নয়। জাতির এই কালব্যাপী সাধনার বেদীতে নগণ্য অবদান ও ভুলে যাবাব নয়। যারা এই বেদী গড়ে তুলেছিলেন, সেই বেদীব পাদপীঠে আমাব ভক্তি অর্ঘ্যপানি অর্পণ করলাম।

আমাব লেখায় ভুল ক্রটি অনেক আছে। বাগ্দেরব সাধনা ক্ষেত্র হ'তে দূবে কাটিয়েছি বহুদিন। বণক্ষেত্রের সৈনিক হিসাবে অল্প পাহাবায় সগাইব মত নিযুক্ত ছিলাম, তাই ভাবাব ভুল ক্রটি অনেক জায়গায়ই থাকবাব কথা। পাঠকের নিকট নিবেদন তাবা যেন ভুলক্রটিগুলোকে ব'ডা করে না দেখেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য, আমাব যে সব বক্তবা বইখানাকে প্রকাশ কবতে সাহায্য কবেছেন নানাভাবে, তাদের ঋণ আমি স্বীকার কবে নিছি এবং একথা সত্যি যে তাদের সাহায্য না পেলে বইখানা প্রকাশ কবতে সমর্থ হতাম না। 'বিপ্লবী বাঙালী' সাপ্তাহিক কাগজখানা আমাব লেখা ছাপিয়ে বাজ্জনৈতিক বন্ধুদের মধ্যে যে উৎসাহ সঞ্চার কবেছেন তাও আমাকে লিখতে বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

১২ই মাঘ, ১৩৬৪

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

(২৬শে জামুয়াবি, ১৯৫৮)

এক

ঢাকা শহর থেকে দূরে—পল্লী মায়ের শ্যামাঞ্চলে কেটেছে
বাল্য ও কৈশোর। অভিজাত বংশে জন্মের অহমিকা বেশী মাথা
চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি, ভাগ্য সেখানে দারিদ্র্যের সত্য কঠিন
স্পর্শে গর্বকে চূর্ণ করেছে। মামাদের আশ্রয়ে থেকেই লেখাপড়া
শিখি। অসীম স্নেহ তাঁদের কাছে পেয়েছি। সবচেয়ে দামী যে
জিনিস পেয়েছি তাঁদের কাছ থেকে—তা করুণা নয়,—মর্যাদা।

গ্রামের স্কুলে পড়ি,—সমৃদ্ধ শ্রী সম্পন্ন গ্রাম। সহপাঠীদের
পোষাকে পরিচ্ছদে তার ছাপ ছিল। আমার নিজের জামাকাপড়
নিজেই সাবান দিয়ে কেচে নিতুম, পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি ব্যাহত হত
না ধোপছুরন্ত পরিচ্ছদের অভাবে। বাড়ীর দৈনন্দিন হাটবাজার
করতাম, গয়লা বাড়ী থেকে দুধ বয়ে নিয়ে আসতাম, আমার
রোজকার কাজের তালিকায় এগুলো অপরিহার্য ছিল, কোনদিনই
এগুলোকে অবাহিত ছোট কাজ বলে মনে করেনি। এতে লাভ
করেছিলাম একটা সহজ জীবন ধারা ও স্বাবলম্বনের অভ্যাস। তা

বিপ্লবের পথে

ছাড়া এসব কাজ করে মনে পেতুম সহজ আনন্দ। দারিদ্র্য তাই কোনদিনই তার শ্রমির বোঝার ভারে আমার জীবনকে নুইয়ে দেয়নি—দেয়নি নীচুতে নামিয়ে। পড়াশুনায় আমার আগ্রহ ও সাফল্য আমার জন্ম এনেছে সংপাঠীদের সাতর্ঘ্য ও বন্ধুত্বের মর্যাদা। ভবিষ্যৎ জীবনে চলার পথের পাথেয় হিসাবে আমি দারিদ্র্যের মাধ্যমে পেয়েছি স্বাবলম্বন ও শ্রমের অভ্যাস।

শিক্ষার প্রতি আগ্রহের সঙ্গে প্রাণশক্তি ছিল প্রচুর আমার মধ্যে। প্রথম মনন শক্তি প্রেরণা যুগিয়েছে দেশপ্রেমের। কিশোর বয়সের ধ্যান মূর্তিতে বিরাট দেশের ছবি কতটাই আর ফুটতো! গ্রামের আমকাঁঠালের বন,—পল্লী-পথের মাঝে মাঝে বটঅশ্বথের ঘন ছায়া,—চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দিতো। ঐ বাঁশ বনের ধারে, তালপুকুরের ওপারে আঁকাবাঁকা মেঠো পথের দুধারে চাষীদের বাড়ী—কোথাও ধোপাপাড়া, কোথাও মৎস্যজীবী ও বাকুইদের রকমারী গৃহগুলি। কোথাও বা ঘন বসতি কোথাও বা বিরল বসতি—এক অগোছালো বৈচিত্র্য গ্রামখানি ছবির মতো দেখাতো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবার স্নেহ পরিচয়ের মাধ্যমে অন্তরকে স্পর্শ কোরত সহজে। সবার সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগের টুকরো খবর ঐ বয়সে যতটুকু পেতাম তাতে অন্তরে কখনো জাগতো আনন্দের অনুভূতি,—কখনো বা সমবেদনায় ভেতরটা নরম হয়ে উঠত, কখনো বা প্রতিকারের জন্ম প্রাণ হত চঞ্চল। গ্রামের দীঘির পারে আমাদের খেলাধুলো ছটোপাটি চলেছে, দীঘির কালো জলে মাছরাঙা এক একবার ঝাপটা দিয়ে জল ছুঁয়ে যাচ্ছে, অনতিদূরে দিগন্তব্যাপী পাটের বা ধানের ক্ষেত; হাওয়ার সাথে

বিপ্লবের গথে

অশুষ্টি চেউয়ের ওঠানামা দেখতুম মুগ্ধ চোখে, কবির গানের কলি
নিজের অলক্ষ্যে কণ্ঠলগ্ন হয়ে আছে “ও আমার দেশের মাটি
তোমার পরে ঠেকাই মাথা”। সহজ ধ্যানে ভরা দৃষ্টিতে ফুটে
উঠতো দেশের অম্পষ্ট ছবি। গাছপালা, স্থাবর জংগম, পাহাড়
পর্বত, রকমারি পশু পক্ষী আর কতো মানুষের ভীড়। সবই
যেন একান্ত আপন—একান্ত নিজস্ব।

গ্রামের পাবলিক লাইব্রেরী পবিচালনের দায়িত্ব আমার
উপবে এসে পড়েছিল। সানন্দে ও সাগ্রহে সে দায়িত্ব বহন
করেছি। লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত গল্পেব ভিত্তর দিয়ে দেশবিদেশের
জ্ঞানীশুণীজনের কর্মকাণ্ডের সংগে ঘটলো নিবিড় পরিচয়। তাঁদের
চিন্তা ও প্রেরণা জীবনকে ভাবময় করে তুললো। নবীনচন্দ্রের
“পলাশীর যুদ্ধে” শাস্ত্রবনের তৃত্য ধ্বনি “কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গংগাজল”—যে ধ্বনি দিগন্তে তুলেছিল তার সুরলহরী
আমার প্রাণকে তুলিয়ে দিয়ে গেছে। হেমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের
গানগাঁথায় মর্মের মালধে মুকুলিত হয়েছে কতো নব নব আশার
কুসুম। বংকিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ মনের গভীর গহনের নিস্তকতা
ভংগ করে দাবী করেছে দেশ জননীর জ্ঞাত্য সর্বস্বপণের সংকল্প,
‘নীলদর্পণ’ পড়তে পড়তে পেশীগুলো এক এক সময় নিজের
অগোচরে দৃঢ় হয়ে হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে। এক এক সময়
দেখেছি বাস্তবের কঠিন আঘাতে গ্রামের শাস্ত্র সুনিবিড় ভাবটি
আচমকা ভেগে গেছে। গ্রামের জহিরুদ্দিন আর খরুশেখ দলবল
সহ পাট ও ধানের ভাগ নিয়ে লড়াইয়ে মেতেছে। লাঠি বল্লমে
সজ্জিত সংগ্রামিকেরা। চকিতে থেমে গিয়ে পথ করে দিয়েছে

বিপ্লবের গাথ

আমাদের কুলের পড়ুয়াদের। এতটা হানাহানির মধ্যেও বিবেক ও বিচার বুদ্ধি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ শুধু বাংলার শিক্ষিত মনকেই নাড়া দেয়নি, গ্রামের চাষী মজুরের প্রাণকেও তা দোলা দিয়ে গেছে। এরাও সুর করে গাইতো, “ছিল ধান গোলাভরা—শ্বেত ইন্দুরে করলো সারা”—ক্ষুদিরামের কাঁসীকে উপলক্ষ্য করে অশিক্ষিত চাষীর কণ্ঠেও জাগতো ভাটিয়ালী সুর “এবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি”। এক এক সময় আনমনা হয়ে যেতাম এ গান শুনে,—কখনও বা তন্ময় হয়ে থাকতাম। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রা বাংলার কুটিরে প্রবেশ করেছে—ঝড়ের বেগ নিয়ে; মধ্যবিত্ত সমাজের কচি কিশোর প্রাণে দিয়ে গেছে প্রলয়-দোলা, শাসকদের উদ্দেশ্যে কচি হাতের তর্জনী—অলক্ষ্যে শূণ্যে উঠেছে—কণ্ঠে জেগেছে রুদ্র ধ্বনি—“সাবধান সাবধান, আসিছে নামিয়া আয়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্ত মূর্তিমান”। এক কথায় বলা যায় বাঙালী তরুণের কণ্ঠে ছিল বজ্র, চোখে বিহ্বল-শিখা। কুলের বাঁধা কুটিনেব বাইরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য ও বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থরাজীর মধ্যে পেয়েছি দেশপ্রেমের প্রেরণা। বিবেকানন্দের জীবন ও ধ্যানী জীবনে জাগিয়েছে অভূতপূর্ব উদ্ভাদনা—পরবর্তী জীবনে দিয়েছে অভয় মন্ত্র।

Digbyর “Prosperous India (সমৃদ্ধ ভারত) পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতাম প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধির বিপুল সমারোহের মধ্যে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে দেখতাম শোষিত, সর্ববিভাবে বঞ্চিত, দরিদ্র ভারতবর্ষকে। ব্যথায় যখন ম্লিয়মান হয়ে পড়তাম তখন বীর

বিপ্লবের পথে

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বক্তৃতা কণ্ঠ কাণে আসতো—“উদ্ভিষ্ট জাগ্রত
প্রাপ্যবরান্ নিবোধত”।

সংবাদপত্র সংগ্রহ করে পাঠ করতাম। পাঠ্য পুস্তকের
পরিধি বাইরে বিরাট জগতেব সংগে ধৌবে ধৌবে হয়ে গিয়েছিল
একটা নাড়ীৰ যোগ। প্রথম যুদ্ধেব বণদামামা তখন সজোরে
বাঁধছে। পবাধীন ভাবতবর্ষ থেকেও সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছে—
ইংবেজেব পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংবেজেব শত্রুৰ জীবন হনন করতে ও
নিজেব জীবন দিতে। বিপুল সংখ্যক ভাবতীয় যুবক উৎসাহ ভরে
যুদ্ধে চলেছে। ভাবী বিসদৃশ ঠেকতো ধবিত ভারতবর্ষের এই
মনোবৃত্তি। শুধু অর্থের বিনিময়ে যারা পরের জন্য প্রাণ দিচ্ছে তারা
তো ভীক নয়, প্রাণ তো দিচ্ছে? কেন নিজের দেশের শৃংখল
মুক্তিৰ জন্য এগিয়ে আসে না? ইংবেজ এ যুদ্ধে জিতলে ভারতের
কি লাভ? ইংবেজেব সুসময়ে কী তাদের প্রত্যাশা—কী তাদের

সত্য-সংবাদ

দুই

ছোটবেলা থেকেই পড়তে ভাল লাগতো ইতিহাস। দেশ বিদেশের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে বেড়াতাম ভারতের কথা; ভারত আমার দেশ জননী, আমি তার সন্তান এই গৌরববোধ সামান্য ছিল না—আপন মনে স্মর করে কতদিন আবৃত্তি করতাম—“দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ”। অল্প জাতির ইতিহাসের পাতায় তাদের কতো উত্থান পতনের কাহিনী পড়তাম। ভারতের অতীত ও বর্তমানের সংগে সে কাহিনী মিলিয়ে দেখতাম, কখনো বক্ষ গর্বে ক্ষীত হতো কখনো বা হতো বেদনায় কাতর।

ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়ের মধ্যেও সন্ধান করতুম দেশমাতৃকার সত্যিকার রূপ। পড়েছি ভারত ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে অতুলনীয় সম্পদ ও সমৃদ্ধির বিবরণ,—শেষ অধ্যায়ে দেখলাম সহস্র শ্রান্তি ভরা নিঃশ্ব এক ভূখণ্ড। বুঝতে কষ্ট হয়নি বিদেশী আক্রমণের বন্যার ফলে ধুয়ে গেছে এ দেশের ধ্বলগিরি,—এ পারের সোনার তাল মহাসাগর পেরিয়ে গিয়ে জমা হয়েছে ওপারে স্বর্ষলংকার রাজধানী লগুন সহরে। ওপারে আলোর ঝর্ণাধারা—এ পারের নিরঙ্ক অন্ধকাব,—ঝিমিয়ে পড়া দেশ—যুমিয়ে পড়া মানুষ।

বিপ্লবের পথে

ম্যাট্রিক পাশ করে এসেছি ঢাকা শহরে। কলেজে পড়ছি। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আমার আধজাগা অন্তরে ঘটালো নতুন চেতনার অরুণোদয়। এতকাল মনের গহনে এক ভাষাহীন, স্মরহীন মূর্তিমান অন্ধ আবেগ গুমরে মরছিল। পথের দিশারী হিসাবে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস গণচেতনার স্বরূপ ও শক্তির প্রাণবন্ত প্রকাশ হবির মত মানসচক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল। চোখের উপরে যেন দেখলুম এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে উদ্ধত রাজমুকুট হলো ধূলিসাৎ। নিপীড়িত মনুষ্যের ভগ্ন দেউলে রক্তের লেখায় ফুটে উঠেছে অগ্র-গতির অমোঘ নির্দেশ। পরাধীন ভারতের মুক্তিপথের ইংগিতও যেন শোণিতাক্ষরে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পাতায় লেখা দেখলাম। Abbotএর লেখা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের জীবন-ইতিহাসের মধ্যে পেলাম দুনিয়াজয়ী ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ। যে সব ইংরাজ লেখক, বক্তা, স্বাধীনতার পূজারী সে দিনে মানুষের খ্যাতি ও বন্দনা লাভ করেছেন—তাদের লেখাগুলো শুদ্ধার সংগে পাঠ করতাম—আয়ত্ত করতাম। বার্ক ও ফল্জের লেখা আজও জীবন্ত হয়ে মনের প্রাকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রাজার বিরুদ্ধে হ্যাপডেনের লড়াইকে একান্ত আপন করে দেখতে পেয়েছি। ভারতবাসীর সংগে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর লড়াইয়ের সংগে একে দেখেছি অভিন্ন করে।

জাতির বুকের নিকষ কালো অন্ধকারে মাঝে মাঝে এখানে সেখানে আগুনের ফুলকী,—অগ্নিনালিকা গর্জে উঠেছে—কোথাও হচ্ছে বোমা বিস্ফোরণ :—সংবাদপত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ পায়

বিপ্লবের পথে

ছন্নছাড়া বিপ্লবী দলেব অসমসাহসিক কর্মকাণ্ড। একান্ত ভাবে কামনা করতাম এদেব সংগে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই বিপ্লবীরাই সেদিন ঘুমন্তপুরীকে জাগিয়ে তুলে মানুষের বুকের দরজায় ঘা মেরে গেছে। ছিল না কাকলী—ছিল না কোলাহল—ছিল না শ্লোগান ধনি—জয়ধ্বনিহীন হয়ে জয়যাত্রা ইতিহাস এমনি রচিত হলো।

সেদিন কলুতা বাজবে ফেবাবা বিপ্লব। ও পুলিশের সঙ্গে গেল গুলী বিনিময়, সাবা শহবে আঙুরের মত ছড়িয়ে গেল সেই সংবাদ; বোমাধ্বজের এই ঘটনা চমক লাগালো দেশের বুকে। চাপা সমর্থন লোকের চোখে মুখে,— মনে হল নিঃশেষিত বুকের পাজিরগুলো দপ ক'বে জ্বলে উঠলো। গুলীনিদ্ধ মরণপন্থী বিপ্লবী যুবকের রক্তাশ্রুত দেহকে ধিরে পুলিশের কি তৎপরতা! পুলিশ সাহেবের প্রশ্ন—“কে তুমি যুবক? কি পবিচয় তোমার?” আহত যুবক স্থির অচঞ্চল কণ্ঠে বলে—“আমাকে শাস্তিতে মরতে দাও।” শেষ নিঃশ্বাস ধীরে বাতাসে মিলে গেল—পরাজয় মানলো না, শেষ মুহূর্তেও আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা কোরল না, বিপ্লবী সাধনাকে জয়যুক্ত করেই চললো অমৃতলোকে। এর সম্বন্ধে কতো কথাই শুনেছি—ভারী ভাল লাগছিল। কি অতুলনীয় চরিত্র! কি অদ্ভুত সুন্দর। পরে প্রকাশ

বিপ্লবের পথে

পেয়েছিল—এই বিদ্রোহী গোঁহাটী সংগ্রামের বীর ফেরারী নলিনী বাগচী—অমূল্য দলের কর্মী। আত্মীয় মাণা নত হয়ে এসেছে বারে বারে। জাতির বুকে অনেকগুলো শূন্যের সামনে এ গেন একটা বিরাট ‘এক’। জাতির কাপুরুষতাকে, নিষ্ক্রিয়তাকে ভেঙে দিয়েছে এই ‘ভাঙার পূজারীদল’। অন্তরীণে, নিবাসনে এরা একক যাবী, দেশের লোকের স্বপ্নের মানুষ।

বি, এ, পড়ছি ঢাকা কলেজে। মহাযুদ্ধের সমাপ্তির সংগে সংগেই ভারতের সংগে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতাব নতুন অধ্যায় সূচক হোল, জালিয়ান ওয়ালা-বাগে হিন্দু-মুসলমান-শিখের তাজা খুনে ভিজে উঠলো পাঞ্জাবের উষ্ম ভূমি। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে দেখলো—ইংরেজের সভ্যতার মুখোস ধুলে গেছে।

সাবা ভাবও বিক্ষুব্ধ চঞ্চল।

গান্ধীজি এলেন ভারতের কংগ্রেসের আসরে, বিদ্রোহের নিশান হাতে। ভিক্ষাপান হাতে যারা এতকাল কংগ্রেসের আসর জমিয়েছিলেন, তাদের অনেকেই অপস্থত হলেন। ১৯২০ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে হল তার রূপান্তর। শাসক ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগের নির্দেশ দিলেন গান্ধীজি। আবেদন-নিবেদনের পালা শেষ করে কংগ্রেস সামনে এসে দাঁড়ালো,—এবার তার সাংগ্ৰামিকের বেশ। গোটা দেশ তাকে অভিনন্দিত করলে,—

বিপ্লবের পথে

জীবিত কঠোর কলধ্বনি “মহাত্মা গান্ধী কি জয়”--সংগ্রামের জয়-ধ্বনি হিসাবে দেশ বরণ করে নিলো।

গান্ধীজির প্রথম আত্মান দেশের প্রাণবন্ত অংশ ছাত্র সমাজেব প্রতি। ইংল্যান্ডের শাসন-শৃংখল ভাঙার কাজে তার ডাক তৎক্ষণাৎ প্রতি,--শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তৎক্ষণাৎ ভাষায় বয়েন-“গোলামখানা”।

পরাদীন তার বেদনা দুঃসহ মনে হল। বন্ধনহীন ঝরাপাতার মতোই প্রথম দমকা হাওয়ায় উড়ে চলল। কলেজের অধ্যক্ষকে একখানি চিঠি দিয়ে জানালাম--“দেশমাতৃকার আত্মানে ছাত্রজীবনে ছেদ টেনে দিলাম”। আমাব সংগে যুক্ত হয়েছিল নগেন ঘোষ নামে আমার এক ছাত্রবন্ধু। সম্ভবতঃ আমরা দুজনই প্রথম সত্যাগ্রহী। এতে “কেহ বা হাসিল, কেহ করিল দিকার”। কয়েক মাস পরেই নাগপুর কংগ্রেসে অসহযোগের প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হল--সে প্লাবনে গোটা দেশের ছাত্র সমাজ ভেসে গেলো,- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হোল ছাত্র শূন্য।

ঢাকায় জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলো। আমি শুধু উদ্যোক্তাই ছিলাম না--শিক্ষক হিসাবে কাজ করে যেতে লাগলাম। এর পেছনে খাঁদের দান ছিল অতুলনীয় তাদের স্মরণ না করে পারা যায় না-বিনয় দত্ত, প্রিয়কুমার গোস্বামী, শৈলেন দাশগুপ্ত (রুণু) প্রমুখ ত্যাগব্রতী কর্মী সমাজ।

বিপ্লবের পথে

অসহযোগের সংগে যুক্ত হল খিলাফত আন্দোলন। এই গংগাযমুনার সংগম স্থলে—ঢাকা জিলা কংগ্রেস অফিস পরিচালিত হল শংকর টোলায়,—পরিচালনের দায়িত্ব নাস্ত হল আমার উপর। এখান থেকেই হল আমার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তৎকালীন বিপ্লবী বাংলার শক্তিদর বহু ব্যক্তির সংগে হল পরিচয়—ঘনিষ্ঠ সংযোগ,— তাঁদের ক্রিয়াকাণ্ডে স্বল্প কাল মধ্যেই আমি অপরিহার্য হলাম। সেদিন বাংলার অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন শ্রীনরেন সেন। তাঁরই স্নেহদ্বারা হয়ে বিপ্লবীজীবনের যাবারস্ব হয় আমার। ঢাকায় তখন অন্য কোন বিপ্লবী দল ছিল না। এই কংগ্রেস অফিসকে কেন্দ্র করে যাদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম তাঁদের মধ্যে— কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, প্রভুচন্দ্র গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য, আশুতোষ কাহ্নলী, তরুণীভূষণ সোম, প্রবোধ দাশগুপ্ত, তারাশ্রম দে, স্ত্রবোধ নাগ, নলিনীকিশোর গুহ, রমেশ চৌধুরী, গোবিন্দ কর, রবীন্দ্রমোহন সেন, বোরেন চ্যাটার্জি, (বীরেনদা), ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), মদন ভৌমিক, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন রায় (ফেগা রায়), জিতেশ লাহিড়ী, জ্ঞান মজুমদার, সতীশ পাকড়াশী, নিশি পাইন, নলিনী ঘোষ, অম্বলা অধিকারী, ক্ষেত্র সিংহ, সতীশ সিংহ, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঘোষ, দেবেন্দ্র বণিক, যোগেশ চ্যাটার্জি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের আন্দোলন, আন্দোলন মাত্র, সংগ্রাম নয়—এর ফলে দেশে জাগরণ আসবে, স্বাধীনতা আসবে না,—এই সুনিশ্চিত ধারণা নিয়েই আমরা বিপ্লবীরা কংগ্রেসের আন্দোলন পরিচালনায়

বিপ্লবের পথে

অগণী হয়েছিলাম। কংগ্রেসের আন্দোলনের সংগে খিলাফৎ আন্দোলন যুক্ত থাকায় মুসলমান সমাজের প্রাণবন্ত গংশেব সংগে আমাদের যোগাযোগ হল। আমি ব্যক্তিগতভাবে একান্ত আন্তরিকতার সংগে খিলাফতের কর্মি সমাজের সংগে একাত্ম হয়ে গেলাম। সাম্প্রদায়িক সঙ্কটমুক্ত মন নিয়ে যে এগিয়ে গিয়েছি, এটা ঢাক। খিলাফৎ আন্দোলনের কর্মি ও নেতৃসমাজ উপলব্ধি কবেছিলেন। তাদের কাছে আমি সদিন অপরিহাণ্য হয়ে উঠেছিলাম। মুসলমান যুবকদের কয়েকজনের সংগে আমার ভাবগত ও আদর্শগত যোগাযোগ হয়, তাদের মধ্যে আমি ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য কবে-
ছিলাম। ধীরে ধীরে তেদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসটি আমার ছিল। ঢাকার নবাব পবিবানের দুটি যুবক ইছাক ও সেলিমের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। খিলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ ওবাও বাকনিষ্ঠতা আসে। এদের কয়েকজন আমার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। আজ মনে পড়ে ঢাকার শিবাজুল ইসলামের কথা। চমৎকার প্রাণ-ধর্মের অধিকারী উদাৎ হৃদয় যুবক, জীবনে কোন ছোট কাজ সে করতে পারে না। কারো বিকল্প কোন কার্যে তার অন্তর সাদা দিতে পারে না, তাব সাম্প্রদায়িকতার সংগে খুবই লোভনীয় ছিল।

বাহতঃ অসংযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেও অনুশীলন

বিপ্লবের পথে

দলের গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি। আমি কংগ্রেসের অফিস পরিচালনা করলেও আমার কাজ ছিল বিভিন্নমুখী। বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপের সংগে সংযোগ রক্ষা, খিলাফৎ আন্দোলনে সক্রিয় সহায়তা দান প্রভৃতি এক সংগে সবই চলত। মুসলমান কর্মীদের সংগে এক ঘনিষ্ঠতা সহ্যেও আমাদের বিপ্লবী কাজে মুসলমান কৃষকদের অস্তিত্ব ছিল না কেন এই প্রশ্ন অনেকে করেছেন। অনেকে তাজিলাভরে বলেছেন ওয়া ইংবাজের সমরক, ওরা ভীক। এমনি অনেক ছোট কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আমাদের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন মনেন কাছে মুসলমান সমাজের সত্যিকার ছবি ফুটে উঠতে পারেনি। ভীক তো তারা নয়ই। ঢাকার দুই দুইটি শোভাযাত্রার দেখছি, বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনতা ইংরাজের গুলীগোলা, পুলিশ গুলিটারী উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে। শাসক ইংরাজ ঢাকা সহরে ত্রাসেব মধ্যে বাস করেছে। অবশ্য খিলাফৎ কর্মীদের চলনে-বলনে গান্ধিজীর অহিংসার মর্যাদা বক্ষা হয়নি। সাহস, শক্তি, উৎসাহ, আঘাত করার প্ররণা - বিপ্লবী চরিত্রের এইসব গুণ এদের মধ্যে প্রচুর ছিল কিন্তু আগবা কাজে লাগাতে পারিনি। এর দুটো কারণ—উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমরা এগোতে পারিনি বলেই প্রাণবন্ত মুসলমান যুবকদের আমরা জাতীয় আন্দোলনের মাঝপথেই হারিয়েছি। মুসলমান কৃষক যারা সংখ্যায় বিপুল, তারা নির্যাতিত হয়েছে হিন্দু ছোট বড় জমির মালিকদের হাতে ; এদের উপর তাদের একটা বিহৃষা স্বাভাবিক ভাবেই ছিল। ইংরাজ রাষ্ট্রের অবসান

বিপ্লবের পথে

করে এই দেশের সর্বপ্রকার শোষণ আমরা বন্ধ করব, বিশেষ করে জমিদারী প্রথা লোপ করে কৃষককে তার জমির মালিক করব এবং এই জন্যই আমাদের বিপ্লবী অভ্যুত্থানের প্রয়োজন—এরূপ কোন আদর্শবাদ তখন প্রচার করা হয়নি। বরং হিন্দু জমিদারের পীড়নের প্রতিবিধানের জন্য তাদের ইংবাজের দ্বারস্থ হতে হবে এই কথাটাই মুসলমান কৃষকেরা বুঝতো। এই কারণেও জাতীয় সংগ্রামে হিন্দু মুসলমানের বহুমুখি এক সংগে উদ্যত হতে পারে নি। অজ্ঞান মুসলমানদের চেয়ে জ্ঞানপাগী হিন্দু নেতাদের দোষই এক্ষেত্রে বেশী বলে আমার মনে হয়েছে। এক কথায় নেতৃবৃন্দের হিন্দু মানসিকতা জাতীয় সংগ্রামে মুসলমানদের সহযোগিতার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে।

১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বরাজ হবে, এ প্রচার কংগ্রেসের; লোকের বিশ্বাস ও প্রতীক্ষা সত্যিই ছিল। কালের গতিপথে ৩১শে ডিসেম্বরের অতিক্রান্ত হল,—স্বরাজ এলো না। অহিংসার প্রাকারে আবদ্ধ সংগ্রামের জোয়ার ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে মরলো। বারদৌলীতে আইন অমান্য চরম সংগ্রামের প্রতীক্ষা ছিল ভারতীয়

বিপ্লবের পথে

জনতান চৌবীচৌবান হিংসাব বালুচেনে অহিংস আন্দোলন হলো—গতিহারা-চলো স্তব্ধ।

গান্ধীজি নৈষ্ঠিক অহিংসাত্মক, শাসন ও শোষণ থেকে তিনি ভাবতেন মুক্তির অল্প দেগতেন বক্তৃতা বিন্দু বিন্দু বিপ্লবের পথে। কিন্তু দু'শ বছর ঈবেদেব শাসনে পথ্যাদস্ত ও শোষণে জর্জরিত হয়ে তংবেজ ও ঈবেজ শাসনেব প্রতি জনসাধারণ যে দাকণ ঘৃণা ও বৈবাতাব পোষণ কনতো, আন্দোলনেব উৎসমুখে তা স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বাব হয়ে উঠেছিল। তাই সংগ্রামের সূচনায় আঘাত হানবাব স্বাভাবিক প্রেবণায় তারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। গান্ধীজি নীতিবাদ বা বিচক্ষণ নেতাদেব সংগ্রাম কৌশল হিসাবে অহিংসাকে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতাগল ভাবনায় জন সাধারণের তুর্জয় অগ্রগতি অহিংসাব বদ্ধজলায় সেদিন পথ হাবালো।

আমাদেব দেশেব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাব সমসাময়িক কালে রাশিয়ায় শুরু হয়েছে বিপ্লবেব জয়যাত্রা-এই বিপ্লবের হোতাদের সঙ্গে ভারতের অগ্নিপূজানীদের যোগ ছিল।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নকে ঘাঁরা তুলে ধরেছিলেন এবং ঘাঁরা তার বাস্তব রূপায়নে সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে তখন রাসবিহারী বসু, মানবেন্দ্র নাথ রায়, অবনী মুখার্জি, ডাঃ ভূপেন্দ্র দত্ত, বীরেন চাট্টার্জি, বরকত উল্লা (ভোপাল), হবদয়াল সিংহ (পাঞ্জাব) রামচন্দ্র

বিপ্লবের গথে

(পেশোয়ার) ভাই পরমানন্দ , রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য— তাঁরা সবাই ছিলো আমাদের গর্বের বিষয়বস্তু । অবনৌমুখার্জি ও নগিনী গুপ্তের রাশিয়া থেকে গোপনে ভারত আগমন আমাদের তরুণ বিপ্লবী মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছিল ।

ভিন্ন

অসহযোগ আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। জাতির বুকের ধুমায়মান বক্সি কিন্তু গান্ধিজীর নির্দেশে নিভে যায় নি। জাতির মন বিক্ষুব্ধ, চঞ্চল। বাংলার বিপ্লবী দলের কর্মী সমাজ অসহযোগের বিরতির পর স্বকীয় পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। বিপ্লবী সংস্থাগুলো স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে, অধীবতাও দেখা দেয় আখাত হানবার জন্য। অন্তর্শীলন দলের মধ্যেও ছুটি মত স্পষ্ট হয়ে উঠল— নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ চাইলেন ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে ইংরেজের সংগে একবার শক্তি পরীক্ষা শুরু করতে। সংগে সংগে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ও বাংলার বাইরে বিভিন্ন কেন্দ্রে যেখানে দলের শক্তি আছে—ভিন্ন ভিন্ন প্রোগ্রামে রাজশক্তিকে আগাত করার কথাই তখন হচ্ছিল। এতে সফল বিপ্লব হবে না, তবে একবার আগুন জ্বালাতে পারলে একে নেতাজে রাজশক্তির প্রচুর বেগ পেতে হবে। সরকারী অস্ত্রাগার দখল করা, সরকারী ব্যাংক লুণ্ঠ করা, কারাগার ভেঙে দেওয়া, যানবাহন চলাচল ব্যাহত করা,—এর অনেক গুলোই ছিল প্রোগ্রামের অন্তর্গত। অন্যমতের সমর্থকেরা বলেন, আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেছে। জনতাকে টেনে এনে আর বিপ্লব করা যাবে না। অসহযোগ

বিপ্লবের পথে

আন্দোলন যদি আর কিছুকালও চলত, ইংরাজকে অসহযোগের অহিংস আঘাত হানার প্রোগ্রাম নিয়েও জনতাকে সহিংস আঘাতে প্রবুদ্ধ করা যেত। কংগ্রেস নেতারা পিছিয়ে পড়লেও ওদের হাত থেকে আক্রমণোদ্ভোগের নেতৃত্ব বিপ্লবী নেতারা গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু অসহযোগের আচমকা রুদ্ধগতি জনতার পশ্চাৎ-গামিতাতেই পর্যাবসিত হয়েছে, কাজেই এ সময়ে বিপ্লবের আহ্বান সময়োচিত হবে না।

দলের মধ্যে এমনি দুইটি মতের সমর্থক লোক থাকলেও প্রস্তুতির ব্যাপারে সকলেই এক মত ছিল। এবং তারই আয়োজন পর চলছিল অত্যন্ত সংগোপনে।

১৯২৩ সালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন। “নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার”এর মধ্যে শক্তির লড়াই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মণিলাল নোহেরু এঁরা ছিলেন কংগ্রেসের নতুন নীতি নির্ধারণের পক্ষে। মহাত্মার অন্তরংগ হিসাবে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের অসহযোগ নীতির পক্ষে;—সেদিন “নো-চেঞ্জার ও প্রো-চেঞ্জার”এর লড়াই কাউন্সিলে প্রবেশ করা না করাকেই কেন্দ্র করে চলেছিল।

বিপ্লবের পথে

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার ধেমের যাবাব সাথে সাথে বাংলার বিপ্লবী দলের মধ্যে সহিংস আঘাতের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। এর এক অংশ অবিলম্বে কম সম্পাদনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। বাংলার দুর্ভাগ্য যে, বিপ্লবীরা কখনও একতাবদ্ধ হয়ে ইংরাজ শাসনকে আঘাত করতে পারে নি। তাই সেদিনের আঘাত প্রচেষ্টাও ছিল বিচ্ছিন্ন। কলকাতার বিপ্লবী নেতা সম্ভ্রাম মিত্রের দলের কমপ্রাচেষ্টা শাখারিটোলা ও উল্টাডাঙ্গা পোষ্ট আকিসে ডাকাতির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ, দলেব বিশ্বাসঘাতক কমীর জীবনাবসান চেষ্টায় মির্জাপুরে এক দোকানে বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে আক্রমণ করতে গিয়ে ভুলক্রমে এক নিবপরাধ শ্বেতাংগ ব্যবসায়ীকে হত্যা করে।

কলিকাতার জন ও যানমুখর রাস্তা—অফিসের সময় ভীড়ের অন্ত নেই। যুবক গোপীনাথ দুর্ধর্ষ টেগার্টের প্রাণ হননের নেশায় বিভোর হয়ে পথে বেরিয়েছে। টেগার্টকে তু'চারদিন লক্ষ্যও করেছে। শ্বেতাংগ ব্যবসায়ী মিঃ ডে'র চেহারার সংগে টেগার্টের চেহারার সাদৃশ্যও কিছুটা হয় তো ছিল। গোপীনাথের হাতের রিভলভার মুহূর্মুহ গর্জে উঠল। যুবক অচঞ্চল লক্ষ্যে—তার রিভলভার চালিয়ে চলেছিল। শেষ টোটাটি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করে—গোপীনাথ সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো—কোতুহলী জনতার সাথে পুলিশও এতক্ষণ ছিল নির্বাক জট্টা। এবার পুলিশ দল কাঁপিয়ে পড়লো তার উপর।

বিপ্লবের পথে

বিচারে গোপীনাথের ফাঁসি হল। বীর যুবক হাসি মুখে ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করলো। তার উদ্দেশ্যে—দেশবাসীর বন্দনা চারিদিক থেকে উৎসারিত হলো—তার দেশপ্রেমকে অভিনন্দিত করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন—কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে।

এই সময় এই দিল্লী কংগ্রেসকে কেন্দ্র করেই অমূল্য দলের নিখিল ভারতীয় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সমাবেশ হয়। বাংলার প্রত্যেক জেলায় বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ যারা আসীন ছিলেন, তাদের উপরও নির্দেশ ছিল দিল্লীতে সমবেত হবার। অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগের ফলে দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ সহজেই বিপ্লবী কর্মীরা পেয়েছিল। দিল্লীতে আমাদের দলের নিখিল ভারতীয় সদস্যদের গোপন বৈঠকে ভাবী কর্মকাণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবী কর্মীদের সংগে ভাবের আদানপ্রদান করার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। তা ছাড়া বাংলার বিভিন্ন জেলার দলের বিশিষ্ট কর্মীদের সংগেও আমরা অন্তরংগ ভাবে মেলাসেণা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এই দিল্লী কংগ্রেস অধিবেশনকে কেন্দ্র করে।

দিল্লী কংগ্রেস থেকে ফিরবার পথে হাওড়াতে বাংলার বিপ্লবী নেতারা অনেকেই “তিন আইনের” কবলে বন্দী হন। সুভাষচন্দ্র এই বন্দীদের অন্যতম। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রে এই সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে

বিপ্লবের পথে

কেউ কেউ গ্রেপ্তার এড়িয়ে আত্মগোপন করেন। পরবর্তী কালে এই ফেরারীরাই বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যান।

তখনও অমূল্য দলের নেতা নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য ও রবীন্দ্রমোহন সেন ফেরারী জীবন অবলম্বন করে দলের বিপ্লবী প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময় প্রধান কেন্দ্র ঢাকাতেই বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। রাশিয়া প্রত্যাগত নলিনী গুপ্ত মহাশয়ের পরিচালনায় বোমার মালমশলা সংগ্রহ ও কিছু কিছু experiment চলছে। বিভিন্ন জেলা থেকে বিশ্বস্ত কর্মীদের আনাগোনা চলছে এই উপলক্ষে। তখন আমি বাহ্যতঃ কংগ্রেসের পরিচালনের দায়িত্বে যুক্ত থাকলেও ফেরারী নেতৃত্বের (নরেন সেন ও প্রতুল গাঙ্গুলী) সংগে যোগাযোগ রক্ষা—বিভিন্ন কর্মীদের সংগে তাঁদের গোপন দেখাসাকাতের ব্যবস্থা করা ও অন্যদিকে বোমা প্রস্তুতির আস্তানার সাথেও সংযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে ব্যাপ্ত ছিলাম। এই সময় বীরেন চ্যাটার্জির (বীরেন দা) পরিচয় নিয়ে নোট জাল করার জন্য একজন বিশেষজ্ঞ ঢাকায় এলেন। দলের প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ অপরিহার্য্য। এতকাল দলের নিষ্ঠাবান সম্পন্ন কর্মীদের অর্থে ও ডাকাতির দ্বারা লব্ধ অর্থে কাজ চলেছে। ডাকাতির পথে অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে, ডাকাতির জন্য খুন এবং সেই খুনের মামলা চালাতে গিয়ে আবার ডাকাতি করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। এতে কাজের ক্ষতিও হয়েছে বিপুল। এ জন্যই নোট

বিপ্লবের পথে

জালের পরিকল্পনা করা হয়। এপথ কিছুটা নিরাপদ এবং ইংরাজের অর্থ ভাণ্ডারের উপর পরোক্ষ আঘাত এতে পড়তে পারতো। নোট জাল করেই টাকার ব্যবস্থা হলে কম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বৃহত্তর কর্ম সমাধা সম্ভব হয়। যাক, কাজ এগিয়ে চললো— আস্থানা তৈরী হল, শচীন চক্রবর্তী, প্রবোধ দাশগুপ্ত সব কাজ যেনে এই কার্যে সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করলো। দলের কর্তৃ-পক্ষের নির্দেশে আমি এই নোট জাল ব্যাপারে গভীরতর ভাবে যুক্ত হই। এই বিষয়ে আমরা ক্রমেই সফল হচ্ছিলাম।

১৯২৪ সালের শেষের দিকে Bengal ordinance জারী হল,—যে রাত্রে ordinance জারী হল সেই রাত্রেরই শেষ দিকে বাংলার সর্বত্র খানাতল্লাস, ধরপাকড় আরম্ভ হল। পূর্বে স্বল্প সংখ্যক বিপ্লবী নেতা তিন আইনে ধৃত হয়ে রাজবন্দী-জীবন যাপন কর-
ছিলেন। এবার প্রত্যেক জেলা থেকেই বিশিষ্ট কর্মীদের গ্রেপ্তার করে রাজবন্দী করা হল। গোটা বাংলা দেশ থেকে প্রায় দুই শত বিপ্লবী কর্মকে সেবার বিনা বিচারে আটক করা হল। আমিও সেই সময়ে ধৃত হই। আমাদের আরক্স বিপ্লব প্রস্তুতি অর্ডিন্যান্সের ফলে ব্যাহত হয়। ঢাকা শহরে ব্যাপক খানা-তল্লাসী হল। কিন্তু

বিপ্লবের পথে

গ্রেপ্তারের বেলায় বিশিষ্টতম ব্যক্তিদেব উপর হল প্রথম আঘাত।
বিনা বিচারে অবরুদ্ধ হয়ে আমরা রাজবন্দীর তালিকা দীর্ঘ
করলাম।

১৯২৪ সাল।

বহিমান এই বছরটি। ভাবতাব স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহ-
যোগের শ্বেত শিখাটি নিভে গেছে ; কিন্তু জনচিন্তেব ধুমায়মান বহি
ভাবতাব বিপ্লবী আধারে মাবো মাঝে লোহিত শিখায় জ্বলে ওঠে।
বাংলার বিপ্লবী তরুণের হাতের অগ্নিনালিক। এখানে সেখানে গর্জ
ওঠে ;—দেশের বুকের তমিস্রা ভেদ করে জ্বলে ওঠে রক্তশিখা।
অর্ডিন্যান্সের মুণ্ডবাঘাত এ আগুন নেভাতে পারে নি। অমুশীলন
ও যুগান্তর দলের প্রাণবন্ত কর্মীদের মধ্যে হল যোগাযোগ। দিল্লী
কংগ্রেসের পরে তিন রেগুলেশনে ও পরবর্তী অর্ডিন্যান্সের বেড়াঙ্কালে
বিপ্লবী নেতা ও কর্মী সমাজের অনেকেই কারাকদ্ধ, কিন্তু গ্রেপ্তার
এড়িয়ে ফেরারী জীবন যাপন করছেন এমন নেতা ও কর্মী তখনও
ছিলেন। অমুশীলন দলের পক্ষ থেকে বোমা প্রস্তুতি ও অস্ত্রশস্ত্র
সংগ্রহেব যে আয়োজন চলছিল,—নেতা ও বিপুল সংখ্যক কর্মীর
গ্রেপ্তারের পরেও তা খণ্ড খণ্ড ভাবে এগোতে থাকে। আমাদের
স্বপ্ন ছিল বিপ্লবী অভ্যুত্থান। কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের কারো

বিপ্লবের পথে

কারো মনে ছিল বিপ্লবী আঘাতের আয়োজন করা। আঘাত যদি দুর্বার করে তোলা যায়, অভুত্থানের ক্ষেত্র রচনা করা সহজ হয়— এই বিশ্বাস ছিল অনেকের। এই শেমোটক মতবাদে বিশ্বাসী আমাদের দলের কিছু কর্মী বাংলা দেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে দলের কাজে ব্যাপ্ত ছিল। এদের মধ্যে শচীন সান্যাল, যোগেশ চ্যাটার্জি, গোবিন্দ কর, রাজেন লাহিড়ী, চারুবিকাশ দত্ত, যতীন দাস, ঢাকার সুধীর ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে। এঁরা বাংলা দেশের অন্যান্য বিপ্লবী দলের কর্মীদের সংগেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। সেদিনেব যুগান্তর দলের কর্মীদের মধ্যে হরি নারায়ণ চন্দ, বীরেন ব্যানার্জি, নদীয়ার অনন্তহরি মিত্র, চট্টগ্রামের সূর্য্য সেন, নগেন সেন (জুল), বরিশালের অনন্ত চক্রবর্তী প্রামুখ শক্তিশালী কর্মীদের কথাও বলা যেতে পারে। জ্যোতিষ দা (অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ) এই সম্মিলিত বিদ্রোহী তরুণদেব আঘাতের পরিকল্পনাকে সাধামত সমর্থন করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্র মামলা ও কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা বাংলার ও ভারতের অমূলীন দলের ও বাংলার যুগান্তর দলের কিছু সংখ্যক কর্মী সহযোগে গঠিত দলের কার্যকলাপের ফলমাত্র। দক্ষিণেশ্বরে আবিক্কৃত বোমার ধ্বংস ক্ষমতা ছিল প্রচণ্ড ইংরাজ বিশেষজ্ঞের। এক বাক্যে তা স্বীকার করেছেন। সেবারে এই বিপ্লবী প্রস্তুতির পরিসমাপ্তি ঘটে দক্ষিণেশ্বর ও কাকোরী ষড়যন্ত্র আবিক্কারের সংগে সংগে। এই সময় আসাম ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমূহের বিপ্লবী প্রস্তুতি কলিকাতা ও কাশী থেকেই পরিচালিত হয়।

বিপ্লবের পথে

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলাব ব্যাপাবে বাংলা, আসাম, ব্রহ্ম দেশ এবং কাকোরী ষড়যন্ত্রে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেব খ্যাতনামা বিপ্লবীদের যোগাযোগ বিভিন্ন প্রামাণ্যসূত্রে আবিষ্কৃত হয়।

এর পবের অধ্যায় শেষ হয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায়। অনু-শীলেন দলের পাঞ্জাবী কর্মী ইন্দ্র নাবাং, বীরেন ভট্টাচার্য্য ও চট্ট-গ্রামের সুখেন্দু দত্ত প্রমুখ কর্মিগণের বিপ্লবী কার্য্য কলাপ এই ষড়যন্ত্র সূত্রে প্রকাশ পায়। যাদবপুর কলেজেব ছাত্র ইন্দ্র নারাং পাঞ্জাবী হলেও বাংলা ভাষা চমৎকাব বলতো,—ঢাকার কথ্য ভাষাও এমন সুন্দর বলতে পারত যে তাকে ঢাকার লোক বলেও অনেকে ভুল করতো। হাসি, গল্পে প্রাণখোলা তবণ ইন্দ্র নারাং আজও আমাদের স্মৃতিতে সজাগ হয়ে রয়েছে।

এই সময়ে বিনাবিচারে আটক রাজবন্দীদের সংখ্যা ছিল দুই শতের কিছু বেশী। দক্ষিণেশ্বর ও কাকোরী ষড়যন্ত্রে দীর্ঘ কারা দণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের সংখ্যাও সামান্য ছিল না।

এ ছাড়া ফাঁসীর মঞ্চে আত্মদান করেছেন যারা, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণেশ্বর ষড়যন্ত্রে দণ্ডিত ও পরে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ভূপেন চট্টোপাধ্যায়কে আলিপুর জেলের মধ্যে হত্যা

বিপ্লবের পথে

করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত চট্টগ্রামের অন্তর্শীলন দলের
প্রমোদ চৌধুরী ও নদীয়ার যুগান্তর দলের অনন্তহারি। কাকোরী
বড়যন্ত্র মামলায় যে চার জনের ফাঁসী হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন—
রাজেন লাহিড়ী, আসফাবুল্লা, রামপ্রসাদ ও রোসন সিং।

চার

১৯২৭ সালের শেষ দিকে বাংলায় রাজবন্দীরা ক্রমেই কাবাগার ও অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজ কর্মক্ষেত্রের দিকে ফিরে এলো। কিছুকাল জেলে বাস কবাব পর আমার উপর বাংলা দেশ ছেড়ে যাবার হুকুম হয়, ডিলাম কিছুকাল নৈনীতাল। দেশে ফেরার অনুমতি পেয়ে আমিও ফিরে এলাম। এই চার বছর আটকের ফলে বাংলার বিপ্লবী কর্মক্ষেত্রগুলো একের সংগে অন্যের সংযোগ-সূত্র হারিয়েছিল। ছেড়া তার জোড়া লাগানোর কাজ শুরু হল নতুন করে। এবার জেলখানায় কিছু সময় কর্মঠান থেকে চিন্তা কবার প্রচুর সুযোগ মিলেছে। তা ছাড়া একই জেলে অন্তরীণ ও যুগান্তর দলের নেতা ও কর্মীরা এক সংগে বাস কবাব পবম্পনের মধ্যে সচ্ছতাও বেড়েছিল। ভবিষ্যতে জেলের বাইরে গিয়ে এক সংগে মিলেমিশে একটি প্রোগ্রামে কাজ কবাব প্রয়োজনীয়তাও অনেকেই উপলব্ধি কবেছিলেন। সেই সুযোগ এবার এল।

ছাড়া পাবাব পরেই দুই বিপ্লবী দলের উপনের সুরের নেতারা পরস্পরবেব মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু কবে দিলেন। কর্মীরাও নতুন উত্তমে গড়ে তুলছেন সংগঠন। গোড়ার দিকে সবারই মনে একটা আশা জেগেছিল—বাংলার এই দুইটি দল এক হতে পারলে

বিপ্লবের পথে

বিপ্লবী সংস্থা যেমন মজবুত হবে তেমনি ইংবাজকে আঘাত দেবার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো, মিলনের আশা ততই দূরে সরে যেতে লাগলো। প্রোগ্রামে অমিল হয় নি,— অমিল স্থানীয় কর্তৃত্ব নিয়ে। নেতৃহীন বেলায় যেমন বাধা এসেছে তেমনি বাধা এসেছে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বা মহকুমায় দুই দলেরই সংগঠনে, পরিচালন ব্যবস্থায়। প্রাধান্যের প্রশ্নই সেখানে বড় হয়ে দেখা দিল। এক দল আর এক দলের স্থানীয় নেতার উপর নির্ভর করতে পাবছিল না। এটুটু দলের মিলন প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল।

উভয় দলের শ্রমিকদের বড় কর্মীর মধ্যে একটা ঘনায়মান অসহিষ্ণুতা পর্বিলক্ষিত হল। উপরের স্বাবে যদি মিলন না ঘটে তবে একটা জোড়ালো প্রোগ্রাম নিয়ে দুই দলের বিক্ষুব্ধ কর্মীরা নতুন ভাবে সংগঠন গড়বে। ১৯২৮ সালের কোলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যান্ত উপরের স্বরের মিলনপ্রচেষ্টা চলছিল। এ পর্যান্ত এসেই এ উদ্যমে ছেদ পড়ল। উভয় দলের অসহিষ্ণু কর্মীরা এবার তলে তলে দলের মধ্যে ভাঙন ধরাতে লাগলেন। দুই বিপ্লবী দলের অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী কর্মীদের অন্তর্দ্রোহের ফলে বৃহৎ সংগঠনগুলো ভেঙে পড়তে লাগলো।

সংগঠনিক দিক দিয়ে অনুশীলন দল অধিকতর কেন্দ্রিক ও ও দলীয় নিয়মশৃংখলার অনুবর্তী ছিল। স্বর্গীয় পুলিনবিহারী দাসের

বিপ্লবের পথে

লীক্‌স্টিন শৃংখলার ছাপ ওখনও দল থেকে একেবারে মুছে যায়নি।
 ওৎসাহ ও অনুশীলন দলেও যথেষ্ট ভাঙন দেখা দিল। যুগান্তর
 দলের মধ্যে নিকেন্দ্রিক মনোভাব সমধিক পরিস্ফুট ছিল। কাবণ
 এই দলটি ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার পরিচালনামূলক দল সমূহের সমবায়ে
 গঠিত। ভিন্ন ভিন্ন দলনেতার নামই দলের স্থানীয় পবিচয়।
 অনুশীলন দলে কিন্তু কোন দলনেতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত বা স্বীকৃত
 ছিল না। একজন ভাল কর্মী একটা জেলায় সাফল্যের সংগে দল
 গঠন ও পরিচালনা করতে পাবে, তাব এই যোগ্যতা তাকে এক
 জেলা থেকে অন্য জেলায় ছুটিয়েছে। সে কর্মী এক জেলায় ভাল
 দল গঠন করেছে—দলেব প্রয়োজনে তাপে হয়তো অন্য জেলায়
 গিয়ে দলের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। সবই দলের প্রয়োজনে ও দলেব
 নির্দেশে কথা হয়েছে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের গঠনতাত্ত্বিক
 পার্থক্য এমনি ছিল। এই কাবণে বিদ্রোহী, অসহিষ্ণু কর্মী সমাজের
 প্রচেষ্টা সাফল্যের সংগে যুগান্তর দলেব মধ্যেই গভীরতর ভাঙন সৃষ্টি
 করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও পরবর্তী কালে অনুশীলন দলের
 শ্রেষ্ঠ কর্মীদের অন্যতম সর্ভাশ পাকডাশা, নিরঞ্জন সেন, জগদীশ
 চ্যাটার্জী, পান্নালাল দানগুপ্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা দলেব গণ্ডী কেটে
 দেবিয়ে পাড়েছিলেন।

এই সময় অনুশীলন দলের প্রধান আড্ডা ছিল ১৬৪ নং বো-
 বাজার স্ট্রিটে। শ্রীযুক্ত বেদারেশ্বর সেনগুপ্ত সেখানে থেকেই দলের
 যাবতীয় পরামর্শ ও পরিচালনায় সাহায্য করতেন। দলের নেতাদের

বিপ্লবের পথে

মধ্যে প্রতুল গাঙ্গুলী, রমেশ আচার্য্য, রবাল্লমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। কেদার বাবু রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে যেন দলেব প্রাণকেন্দ্রে বসে আছেন। শ্রাস্তি নেই, ক্লান্তি নেই, দিনের পর দিন নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে দলের কাজ করে চলেছেন। তুলার ব্যবসা সূত্রে বহির্বাংলার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে দলের জন্য অর্থ সংস্থান কোবেছেন এই পথে। দধিচীর অস্তিদানের জীবন্ত প্রতীক। দাক্ষণ যক্ষারোগে শয্যালগ্ন বিশীর্ণ দেহ মানুষটি আমাদের বিপ্লবী যাত্রা পথের দিশাবী—প্রেবণদাতা; মন্থগুণ্ডিব সিদ্ধসাধক কেদার বাবুর পরামর্শ দলেব নেতৃস্থানীয়দের কাছে অপরিহার্য্য ছিল। প্রতিটি জেলার বিশিষ্ট কর্মীদের ও কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন হলে তাঁর শয্যাপার্শ্বে তারাও উপস্থিত হত। দলেব জগ্ন অর্থ ও অস্ত-শস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ ব্যাপারে কেদার বাবুর পরামর্শ ছাড়া চলত না। সেদিনে অনুশীলন দলেব বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাখান ব্যক্তির অভাব ছিল না—কিন্তু কেদার বাবু যেন অনেককেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন—এবং সেদিক থেকে তিনি যে কি ছিলেন তা বাক্য করার ভাষা আমার নেই—আগি শুধু বলবো—এ অপূর্ব।

ঐ কংকালটিকে দেখে কেউ কি কল্পনাও করতে পারে—কত বড় শক্তির আধার ছিল এই মানুষটি! দলেব প্রতিটি কর্মীব

বিপ্লবের পথে

জ্ঞা কি অতুলনীয় দরদ—এই পুণ্যপাঁজব গুলোর তলে ! অহর্নিশ
ধান জ্ঞান মনন—একটি আদর্শকে ঘিরে ।

কিছু দিন কনওয়ালিশ স্টেটের ডি, রচন ফটোগ্রাফার পাশের
বাড়ীতে আমবা থাকবাব ব্যবস্থা করলাম । সেখানে ছিলাম রমেশ
আচাৰ্য্যকে নিয়ে আমবা দুইই জন । বাম্বাবান্না সব স্বহস্তেই
চলছে । পরিশ্রম একটু বেশি হলেও ব্যয় অনেক কম । কিছুটা
স্বপাকের প্রেরণা এখানে । এতদ্ব্যতীত সত্বক তান খাতিরও
পরিচালক নিয়োগ চলে না । কাব্য গোয়েন্দা বিভাগের দবাজ
হস্তের পুরস্কার পেয়ে অনেক সময় এদের ভূমিকা হয় সংবাদ
সরবরাহকারীর । এখানে প্রতুল বাবু, রবিবাবু সবাই আসতেন ।
বিভিন্ন জেলা থেকে দলের পরিচালকরাও আসতেন । পাশের
বাড়ীতেই থাকতেন শ্রীনারেন চ্যাটার্জী সপরিবারে, বাব্বার বিপ্লবী
মহলে তিনি ‘বাব্বারনদা’ নামেই সুপরিচিত । অগ্নিযুগের প্রথম দিকে
বাব্বারনদার উপস্থিতি বুদ্ধি ও সাহসিকতার নত গল্প মুখে মুখে প্রচারিত
আছে, তার মধ্যে আছে ইংরাজ পুলিশকর্তা মিঃ লোম্যানের হাত
ভেঙে দেবার গল্পটি । বাব্বারনদার সাহস ও শক্তির স্বীকৃতি আমরা নত
মন্তকে মেনে নিতাম । উপরটা দেখলে মনে হাত বাপ-রে কি
কঠিন ! কিন্তু ভেতরটা ছিল দলের ছেলেদের জন্য কোমল স্নেহে
ভরা ।

আমাদের বিদ্রোহী বন্ধুদেরও কনওয়ালিশ স্ট্রীটের বাসায় আনা-

বিপ্লবের পথে

গোনা ছিল। বুঝতে পারছিলাম, তারা সম্মিলিত ভাবে একটা আঘাত হানবার পনিকল্পনা করছে। চট্টগ্রামের পাহাড় পরিদর্শনের খবরও পেলাম। এদের আগ্নেয়াস্ত্রের অভাব ছিল। অল্পশস্ত্র সংগ্রহের জোর চেষ্টা চলছিল। কিছুটা শক্তি সংগ্রহ কবেই এবা আঘাত হানবে ঠিক করেছিল। এদের ধারণা ছিল একটা সমীম ক্ষেত্রে শক্তি কেন্দ্রীভূত কবে একটা সফল আঘাত হান। ক্ষুদ্র সফল আঘাত বৃহত্তর আঘাতের ক্ষেত্র রচনা কববে, গোটা দেশেব বিপ্লবী তরুণ সমাজ প্রবুদ্ধ হনে বৃহত্তর আঘাতের ক্ষেত্র বচনায়।

বিদ্রোহী বন্ধুদের এই দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীরে বিপ্লবীদলগুলোর তরুণ কর্মীদের মধ্যে অন্তর্প্রেরণা সৃষ্টি করে। বাংলার বিপ্লবী ষড়যন্ত্র এতাবৎ কাল ষড়যন্ত্রেব স্তব পেরিয়ে এসে অভ্যুত্থানের স্তরে উঠতে পারেনি। আয়োজন সম্পূর্ণ হতে না হতেই রাজশক্তির আঘাত এসে আচমকা ভেঙে দিয়েছে সব প্রস্তুতি, উদ্যোগ পব অকস্মাৎ নিয়োগান্তক কপ পরিগ্রহ করেছে—ইতিহাসের এই মর্মান্তিক অধ্যায়গুলোর উপরই তরুণ কর্মীদের দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে থাকে। যে কোন অবস্থায় একটা কঠিন আঘাত বিদেশী রাজশক্তিকে দিতে হবে—প্রথম আগ্রহ এই দিকে গতি নেয়। বিপ্লবেব ক্রড়ে ইংরাজের রাজপাট ধূলিমাং করার স্বপ্ন এবার বিদ্রোহীর দুর্জয় আঘাত হানার সমীমতার প্রাকারে যেন আবদ্ধ হতে চললো। বিপ্লবী কপান্তরিত হতে চললো বিদ্রোহীতে—ইংরাজ সহজে বলবার সুযোগ পেলো এরা

বিপ্লবের পথে

“টেরোরিষ্ট”—সম্ভ্রাস বাদীর দল। বিদ্রোহী বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য—এই কনস্পিউচি বচনায়। ব্যাপকতর সংগঠন ও সুনিশ্চিত প্রস্তুতি ছাড়া দেশব্যাপী বিদ্রোহ সম্ভব নয়, একপ ধাবণা আমবা পোষণ কবতাম বলেই বিদ্রোহী বন্ধুদের প্রচেষ্টা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অগ্রসব হবাব জগু আমরা সক্ষম বন্ধ হলাম।

ব্যাপক বিদ্রোহ প্রচেষ্টায় বৈদেশিক শক্তির সাহায্য একান্ত আবশ্যক। ঠিক হোল, ভারতীয় বিপ্লবী বাসবিহারী বন্ধুর মধ্যস্থতায় জাপানেব সাহায্য পাবাব জগু গনতিবিলম্বে একজনকে পাঠাতে হবে এবং তদন্তযায়ী শ্রীবমেশচন্দ্র আচার্য্য মহাশয় আমাকে জাপানে যাবাব জগু প্রস্তুত হ’তে নির্দেশ দিলেন।

বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়া ইতিমধ্যেই সবগবম হ’তে সুরু করেছে। বিদ্রোহী বন্ধুবা তাদেন বৈপ্লবিক প্রস্তুতি দ্রুত অগ্রসর করে যেতে লাগলেন। বোঝা যাচ্ছে যে শীঘ্রই তাঁরা আঘাত হানবে। কলিকাতা ও মফঃস লর গোয়েন্দা পুলিশ তৎপর হয়ে উঠেছে। সহস্র (১) গুপ্তচর বিপ্লবী দলের সভ্যদের ও তাদের বিভিন্ন আড্ডাগুলি জানবার জগু নানাভাবে অনুসরণ করে চলেছে।

ইতিমধ্যে মেছুয়াবাজার এক মেসবাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ পেলো, তাজা বোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ। যুগান্তর ও অন্তর্দীপন দলের বহু বিশিষ্ট নায়ক ও কর্মীরা ধরা পড়ে গেলো। প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল।

বিপ্লবের গাথ

১৯৩০ সাল, ৮ই এপ্রিল রাত্রিবেলা চট্টগ্রাম সহরে বিপ্লবীরা উঠালো বিদ্রোহের নিশান। অজ্ঞাগার দখল ও লুণ্ঠন করে বিদ্রোহী বন্ধুরা পেলো, অস্ত্রের রাশি। সরকারী ভবন আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে চল্ল পাহাড়ে ও রাস্তায় সরকারী সৈন্তের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আশ্রয় নিল, বন্দরে।

ভারতের সঙ্গে চট্টগ্রাম সহরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হোল। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ মধ্যরাত্রে বেতার যোগে কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম ছুর্গের মারফত খবর পেলো, চট্টগ্রামের বিদ্রোহের এই সংবাদ। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সিদ্ধান্ত করলো রাত্রেই অন্ধকারেই বিশিষ্ট ও চিহ্নিত বৈপ্লবিক পার্টির সভ্যদের গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দিতে যেন তারা দিনের বেলায় সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহের বিস্তারে সহায়তা করতে না পারে। ভোর হ'বার আগেই বাংলার সর্বত্রই ধর পাকড় শুরু হয়ে গেলো।

৮ই এপ্রিল পৌঁছেচি গিরীডি সহরে—ভাঙ-বধূর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার খবর পেয়ে। পরদিন বিদ্রোহের সংবাদ সহরে পৌঁছাবার পূর্বেই বিহাবের ডেপুটি পুলিশ কর্তা কলকাতার পুলিশের নির্দেশে দলবলসহ গিরীডি সহরে এসে হাজির হলো এবং গ্রেপ্তার করে বাংলায় পাঠিয়ে দিল।

পাঁচ

বিনাবিচারে আটক বন্দী আনব। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমেই ভাঁও হচ্ছে। বিভিন্ন দলেব নেতা ও কর্মীদল ক্রমে ক্রমে গ্রেফতার হয়ে আসছেন। মেছুয়াবাজার বোমার মামলার আসামীদের মধ্যে জগদীশ চ্যাটার্জী, নিমল দাশ প্রমুখ যে চার জনকে রাষ্ট্রদ্রোহের ষড়যন্ত্র মামলার ফাঁসানো গেল না, তাঁদেরও রাজবন্দী কবে এখানে পাঠানো হ'ল। অন্তর্নীলন দলের কর্মী জগদীশ চ্যাটার্জীর কাছ থেকেই খবর পাওয়া গেল, বাংলার বিপ্লবী দলগুলোর মধ্য থেকে বিদ্রোহ করে যাঁবা বেরিয়ে এসেছিলেন, মেছুয়াবাজার বোমার ষড়যন্ত্র তাঁদের সবারই মিলিত প্রচেষ্টা। প্রচেষ্টার সূচনাতাই মেছুয়াবাজারে যে বিপর্যয় ঘটে গেল, তাতে তাঁদের ব্যাপক ভাবে আঘাতের পবিকল্পনা বানচল হ'য়ে গেল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়কেরা ছিলেন বিদ্রোহীদের একটি প্রধান অংশ। বাংলার অন্যান্য স্থানের বিদ্রোহীদের সাথে একই পরিকল্পনায় ব্যাপক ও হুসুতর আঘাত হানার ষড়যন্ত্রে এরাও যুক্ত ছিলেন। মেছুয়াবাজারে বিপর্যয় ঘটায় এবং বিদ্রোহীদের নেতৃস্থানীয় কয়েক জন ধৃত হবার কলে ব্যাপক আঘাত অসম্ভব হ'ল। এর পরে চট্টগ্রামের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা যে

বিপ্লবের পথে

একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস তাহা সহজেই বোঝা গেল। বুঝতে কষ্ট হয় না বাংলার বিভিন্ন অংশের বিজ্রোহীদের মধ্যে পার-ম্পরিক ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার ভাব গড়ে না ওঠায় যুগপৎ শক্ত আঘাত হানা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ কলকাতায় বেতার যোগে পৌঁছবার সংগে সংগেই সারা প্রদেশময় যে ব্যাপক ধর পাকড় শুরু হয়, তাতে তাঁদের প্রস্তুতির প্রচেষ্টার উপরও কঠিন আঘাত পড়ে।

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে গভর্নমেন্ট বাংলার বিপ্লবী দলগুলোকে ভেঙে দেবার জন্তে উঠে-পরে লাগল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংগে যাদের কোন সম্পর্ক থাকা মোটেই সম্ভব ছিল না, অথবা এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে যারা সমর্থন করতেন না,— সরকার এই সব বিপ্লবীদেরও রেহাই দিল না। এই অবস্থায় আমাদের দলের কয়েক জন কর্মী আত্মগোপন করে দলেব ও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

অস্ত্রাগারলুণ্ঠনের পরের বছর ক'টি আগুন লাগে। মাঝে মাঝে দেখা যায় বিদ্যুৎ বলক। কিন্তু ইহা আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস মাত্র। দেশের এ কোণে সে কোণে অগ্নি-নালিকা গর্জে ওঠে। কোথাও কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, কোথাও জজসাহেব, জেলের কর্তা, কোথাও পুলিশ কর্মচারী আঘাতের

বিপ্লবের পথে

লক্ষ্যস্থল হ'য়েছে। ডালহৌসী স্কোয়ারে কলকাতার দোদণ্ড প্রতাপ পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর যে প্রচণ্ড বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা সমগ্র দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে টেগার্ট সাহেব বেঁচে যায়,— একজন বিপ্লবী কর্মী ঘটনাস্থলে নিহত হন এবং তরুণ বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় ধৃত হন। ঢাকাতে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হডসন্ ও বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা লোম্যানের উপর যে আক্রমণ হয় তাতে লোম্যান নিহত ও হডসন্ গুরুতর ভাবে আহত হয়। কলিকাতায় সুরক্ষিত রাইটার্স' বিন্ডিং এ বিনয়, বাদল ও দীনেশ কারা বিভাগের প্রধানতম কর্তা সিমসনকে তাঁর সুরক্ষিত অফিস গৃহে হত্যা করে। কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশ কমিশনার টেগার্ট ও হোম মেম্বর হাচিন্স প্রভৃতির পরিচালনায় যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়, তার প্রতিশোধের প্রেরণাই ছিল এই আক্রমণের মূলে। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের (পেডী, ডগলাস, বার্জ) উপর পর পর আক্রমণ করা হয়। এই তিন জনই বিপ্লবী গুলীতে নিহত হয়।

বিপ্লবীরা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে তাদের ক্ষমতার পরিচয় দেয়। চট্টগ্রাম থেকে মেদিনীপুর—বিপ্লবী বাংলার প্রাণ চাকলা সত্যিই লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরের রাজনৈতিক চেতনাকে চরম নিপীড়নে স্তব্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যে পেডী প্রমুখ

বিপ্লবের পথে

অত্যাচারী শাসকেরা যেমন তৎপর হয়েছিল, বাংলার বিপ্লবীর অগ্নিনালিকাও তেমনি বজ্র নির্দোষে গর্জে উঠেছে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্ট্রীভেনস্ বিপ্লবী নাবী শান্তি ও সুনীতিব রিভালভারের গুলীতে নিহত হয়। বাংলার তদানীন্তন গভর্নরবেব উদ্দেশ্যে নাবীরা বীর কত্যা বীর দাসেব অগ্নিনালিকার ত্রুদ গর্জন বাংলাব সেনেট হলে প্রতিধ্বনিত হয়। আলিপুরেব দায়রা জজ গার্লিক বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হয়। অত্যাচারী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট 'ডুর্গো' গুলীতে আহত হয়। তদানীন্তন শেতাংগ সমাজেব মুখপাত্র ভাবত বিদ্রোহী "ষ্ট্রেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদক ওয়টসনও বিপ্লবীদেব আক্রমণেব হাত থেকে রেহাই পায় নি।

এই সব আক্রমণ বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও সংগ্রহভাবে এবে প্রতিফ্রিয়া শেতাংগ সমাজের উপর সামান্য ছিল না। বেদিনীপুবে পবনতী কালে এই বাবনেই শেতাংগ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ সম্ভব হয় নি।

দেশ জুড়ে সুক হয়েছে খানা তল্লাসীব চালনী চালা। যে খানেই একটু প্রাণেব সম্পদন দেখা গেছে সেখানেই তার টুঁটি চেপে ধরা হচ্ছ। প্রেসিডেন্সী জেল ক্রমে ভরে গেল। স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিল। মৈশ lock up শিথিল করে সেলের বাইবে ক্যাম্প খাট দিয়ে শোয়াবার ব্যবস্থা হোল। তাতেও কুলোয় না।

বিপ্লবের পথে

নতুন বন্দী শিবির না খুলে আর উণায় বঠল না সরকারের । ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে ভুটান সীমান্তবর্তী জয়ন্তী পাহাড়ের পূর্বাংশ বক্সা দুর্গ বন্দী শিবিরে পরিণত করা হয় শুধু স্থান সংকুলানের জন্যে এই দুর্গম স্থানের ব্যবহারের কথা সরকার ভেবেছে, তা নয় । বাংলা দেশের সংগে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে, এই সব বন্দীদের দূর বাথার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা হোল ।— বক্সা-দুয়াব স্টেশন থেকে বক্সা দুর্গের দূরত্ব সুদীর্ঘ । গভীর জংগলের মধ্য দিয়ে ঢোকাই ইংরাজি পাবত্য পথ । গভীর অরণ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর বালাভূমি । শুধু পথের দুর্গমতা ও স্বপদ কুণ্ডায় উপর নির্ভর করে কতদূর নিশ্চিন্ত ছিল না । অপ্রাঙ্কিত গোচর যথায় ও রোপ বন্য উদ্দেশ্যে কয়েকটি সার্বাঙ্গিক খঁট ও পথের ন্যায় স্থাপিত হোল । অরণ্যের গভীর নিস্তরতার মধ্যে একটা খম্বশমে ভয়াবহতা বিরাজ করে । মাঝে মাঝে দু'একটি পাহাড়ী—ভাটয়াকে পাহাড়ী পথে উঠা-নামা করতে দেখা যায় । ক্যাম্পে বসে মনে হল আমরা যেন একটা আলাদা জগতে বাস করছি—মানুষের জগতের সংগে তার কোন সম্পর্ক নেই ।

বাংলার বিভিন্ন জেলেও দিনা বিচারে আটক বন্দীদের ভীড় জমে গেছে । কলকাতা ও বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে দেড় শো'র মত রাজবন্দী এনে এই অরণ্য শিবির ভর্তি করা হোল । অন্তর্দীক্ষণ দলের কল্পনায় সব সময়েই গোটা ভারতব্যাপী বিপ্লবী অভ্যুত্থানের

বিপ্লবের পথে

স্থান ছিল। সামান্য ক্ষেত্র, সীমাবদ্ধ শক্তিকে নিয়োজিত করে অঘাতকে সমীচীন করার কথা কোন দিনই আমরা ভাবিনি। কিন্তু এখানে তা ভাবতে হোল। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতি অথবা চর্কিত আঘাতের ফলেই বানচাল হয়েছে। কোন দল এখানে-সেখানে দুচারটি ডাকাতি ও খুন ব্যবহারে গোটা বাংলার বিপ্লবী সমাজকে তার ফল ভোগ করতে হয়েছে। ১৯১৪ সালেও তাই হয়েছে। ১৯৩০ সালেও তাই হোল। চট্টগ্রাম অজ্ঞান লঠনকে কেন্দ্র করে গভর্নমেন্ট সব দলের নেতা ও কর্মীকে জেলে নিয়ে এলো। এক কথায় একটি দলেব কাছের ফল গোটা ভারতব বিপ্লবী সমাজ তাদের পরিবর্তনায়-যায়ী ক্রমশঃ ধ্বংস পেলে। এই দল অস্থায়ী আলীপুর জেলে থাকা কালীনই আনাদের নতুন উদ্দেশ্য নতুন পরিকল্পনায় কাজ করতে শুরু করেছে।

অনুশীলন দলের সভ্যদের মধ্যে ভার্সি দিনের যে কর্মসূচী স্থিরীকৃত হোল, তার সংবাদ বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ সহকর্মীদের কাছে ও দলের যে সব সভ্য বাইরে ছিল তাদের কাছে গোপনে পাঠানো হোল। মোটামুটি স্থির হোল, জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে পূর্ণাঙ্গ আদর্শের গভীরে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। আনাদের আপাতলক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই আনাদের উদ্দেশ্য। শুধু বিদেশী শাসনের অবলান ঘটানোই নয়, জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি

বিপ্লবের পথে

সাধনের জন্য ধনতত্ত্বেরও অবসান ঘটিয়ে সাধারণের অর্থনৈতিক সংগ্রামকে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের অঙ্গীভূত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় স্থির হোল, আমরা অত্যাচারী শাসকদের পৈশাচিক জুলুমের জবাব দেব। পুঁজিশ্বের উপর হানা, স্থানীয় বিদ্রোহ প্রভৃতি দলের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত কোরবো। সাংগঠনিক দিক থেকে আমাদের সর্ব ভারতীয় বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর দৃঢ় করে সারা ভাবতব্যাপী বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করে তুলতে হবে।

এই আদর্শ ও নীতিকে কার্যকরী করতে হলে বিভিন্ন বন্দী শিবির, জেলখানা ও অন্তরীণ স্থান থেকে বিশিষ্ট সভ্যদেবপালিয়ে যেতে হবে। তদনুযায়ী কয়েকজন বাছাই করা সভ্যের কাছে নির্দেশ পাঠানো হোল।

অনুশীলন দলের একজন বিশিষ্ট কর্মী প্রভাত চক্রবর্তী বধনানের গ্রামাঞ্চলে অন্তরীণ ছিলেন। দলের নির্দেশ মত তিনি পলায়ন করে কলকাতায় এসে দলের সংগঠনের ভার নেন। অন্তরীণের আদেশ পেয়ে শ্রীপরেশ গুহ যথ। নির্দিষ্ট স্থানে যাচ্ছিলেন, মাঝ পথে তিনিও সরে পড়ে কলকাতায় দলের কর্মরত সভ্যগণের সংগে যোগদান করে পলাতক জীবন শুরু করলেন। এই সময় দলের পলাতক কর্মীর সংখ্যাও কম ছিল না। এঁরা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে দলের সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখছিলেন।

ছয়

বক্সা শিবিরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কালে অন্তর্শীলন দলের যে সভ্যরা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলো শ্রীরবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, শ্রীগিরেন্দ্রচন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), শ্রীপ্রভুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বরিশালের শ্রীযতীন রায় (ফেগা রায়), শ্রীধীরেশ রায়, শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, শ্রীজিতেন গুপ্ত, শ্রীযশোদা চক্রবর্তী, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জি, শ্রীরাধিকা কর, শ্রীনরেন দাস, বর্তমান লেখক এবং দলের বিশিষ্ট সভ্যদের আরও অনেকে। প্রসিডেন্সী জেলে আলোচনা কালে দলের অন্যতম নেতা শ্রীরমেশ আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ চাপ সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে বক্সায় পাঠাতে পারেনি।

পরিকল্পিত ক্রমপন্থাকে কাগাদগী করার জন্য বিশেষ করে আমাদের যে কয়জনকে উপর দিয়াই অর্পণ করা হলো, তাদের মধ্যে ছিল ধীরেশ রায়, যশোদা চক্রবর্তী, ক্ষিতীশ ব্যানার্জি, রাধিকা কর, জিতেন গুপ্ত, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও বর্তমান লেখক। এই সময় বিপ্লবী শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতার দিক দিয়ে যারা দলের সংগঠনকে পেছন থেকে সাহায্য করে আসছিলেন,

বিপ্লবের পথে

তাঁদের মধ্যে অমূল্য মুখাজি, মণীন্দ্র ল হিড়ী ও দেবেন ঘোষ
অন্ততম।

আমাদের কাজটি কি! কাজ হোল ক'একজন বিশিষ্ট কর্মীকে
জেল বা ক্যাম্পে বাইরে পাঠানো,—যাঁরা যোগ্যতাব সংগে
আমাদের পরিকল্পনাকে কাগ্যকবী করতে পারবেন। অন্তরীণ
থেকে পালিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বন্দী শিবির বা জেল থেকে
পলায়ন দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ, বজ্রা দুর্গেব পানিপাশ্বিক দুর্গমত, ও
প্রাকৃতিক বাধা মানুষ্যেব নাধার চেয়েও অনেক দলংঘ্য। শিবির-
টিকে উচু কাঁটা তারেব ডবল বেষ্টনী দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।
স্থানে স্থানে প্রাচীরও রয়েছে। এই যুগা বেষ্টনীর বাইরে সশস্ত্র
পাহাড়ার ব্যবস্থা। শিবিরের অভ্যন্তরে উচু Watch Tower বা
পর্যবেক্ষণ গম্বুজ। সেখান থেকে সব দিকেব দুরেব ও কাছের
সব কিছুই দেখা যায়। এই শিবির থেকে বাইরে যাবাব তিনটি
ফটক ছিল। দুটি সর্বদা বন্ধ থাকতো,—শুধু কতপক্ষের প্রয়ো-
জন মতো খোলা হোত। প্রতিদিনের জন্ত খোলা থাকতো একটি
মাত্র ফটক। যেখানে সশস্ত্র শাহী দিবারাত্র মোতায়েন থাকতো
সতর্ক প্রহরায়। ভুটান পাহাড়ব গায়ট বন্দী-শিবির। পর্বত-
মালার লহরীর পর লহরী মিশেছে—গিয়ে দুরাস্তরে নেঘের গায়ে।
এই পথে একমাত্র ভুটানেব অভ্যন্তর দেশেই যাওয়া যায়। তার-
পর তিব্বত ও চীনের দুর্দগিম্য পথ। ক্যাম্পের দক্ষিণ দিক বেয়ে
কোন রাস্তা নেই। সেদিকে পাহাড় সোজা নীচে কোন অতলে

বিপ্লবের পথে

নেমে গেছে। বহু নীচে পাহাড়ের গহ্বরে ঘন জংগলের রাশি রাশি বৃহদাকার গাছগুলো দেখাচ্ছে তৃণ ও গুল্মের মতো। এক এক দিন কুয়াসায় ঢেকে যায় দক্ষিণ দিগন্ত। মনে হয় কুহেলী ঢাকা। এই দক্ষিণ দিগন্তে যেন সাগর ছড়িয়ে রয়েছে।

মোটের উপর দেখা গেল উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে কোন স্থান হতেই পলায়নের পথ বার করা সম্ভব নয়। পশ্চিমের যে ফটকটি সদাসর্বদা বন্ধ থাকতো এটি তো বার হবার একটি মাত্র পথ এবং এর উপরেই সশস্ত্র শাস্ত্রী দিবারাত্র সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত। অথচ, এই একটা মাত্র পথ ছাড়া আর সব দিকেই পাহাড় গভীর খাদে নেমে গেছে। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সব জায়গা পর্যবেক্ষণ করে নিরাশ হয়ে আমরা পূর্বের দিকটায় মনোনিবেশ করলাম।

পূর্বদিকে দুর্বল স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। বন্ধুর ধীরেশ রায় একটি বিশিষ্ট স্থান দেখে এসে আমাদের খবর দিলেন। উঁচু ডবল তারের বেঠিনী এক জায়গায় নদ্রমার কাছে এসে শিথিল হয়েছে। সেখান দিয়ে গলে বেরিয়ে যাওয়া যায়—কিন্তু অদূরেই উত্তর দিকে সশস্ত্র শাস্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। তারই সামনে হাবিলদারের অফিস ও রিজার্ভ বাহিনী মুখোমুখি রয়েছে। হাবিলদারের অফিসের সামনে একদিকে ক্যাম্প অফিস একদিকে দোকান, দক্ষিণ দিকে সিপাহীদের ব্যারাক। মনে হয় সব কিছুই যেন

বিপ্লবের পথে

বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের উপর নজর রেখে বসে আছে। উত্তর দিকে প্রধান ফটকের সিপাহী আর দক্ষিণ দিকে সিপাহী ব্যারাকের গাষে ঘে পালাবার যে পথের সন্ধান পাওয়া গেছে, তারই অনতিদূরে পনেরো ফুট উঁচু আর একটি বহিঃপ্রাচীর রয়েছে। সেই প্রাচীরের গায়ে একটি দ্বার, দ্বারটি চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ থাকে। এই দ্বার ও সংলগ্ন প্রাচীরের উপর কাঁটা-তার এলোমেলো ভাবে জড়ান আছে। প্রথমকার কাঁটা তারের বেড়া অতি সতর্কতার সহিত পার হয়ে গেলেও পুনরায় এই প্রাচীর ডিঙাতে হবে,—তবেই ক্যাম্পের বাইরের রাস্তায় পৌছান যাবে। এদিকে ব্যারাকের গা-ঘেঁষে ছ'চারটি কুকুরও রাখা হয়েছে, যারা নৈশ প্রহরীর কাজ করে। শুধু শীতের প্রদোষ একটু বেশী হলেই এদের সাড়া শব্দ একটু কম পাওয়া যায়। দূরে—বাইরের তমসাস্ফর প্রাকৃতিক বাধার মতো ভিতরের আলোক সমাবাহও কম বাধা নয়। সুপ্রচুর বিজলী আলোকিত বক্সা ক্যাম্প। শীতের রাতে গাঢ় কুয়াসার আলোগুলোকে ফলেরা রোগীর চোখের মতো ঘোলাটে দেখা যায়। গাছের ছায়া মায়া জড়িয়েছে, ডবল বেষ্টনীর দুর্বল স্থানটায় সিপাহীর দৃষ্টিপথকে কোরেছে অস্পষ্ট। বহু অনিশ্চয়তার মধ্যেও শেষ পর্যন্ত আমরা এই স্থানটিকেই বেছে নিলাম।

এই অনিশ্চিত পথযাত্রায় নিশ্চিত বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার জন্য হুজনের নাম নির্দিষ্ট হোল,—জিতেন গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী। জিতেন গুপ্ত দলের পুরাতন সভ্য। অতি নিরিবিলি জীবন যাপনে

বিপ্লবের গথে

অভ্যন্তর বলে ক্যাম্পের অধিকাংশ লোকই তাঁর উপস্থিতি বুঝতে পারতো না। প্রকৃতিতে কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ছিলেন ঠিক বিপরীত। একেবারে মজলিশী লোক। অভিনয়ে হাসিগল্লে, খেলা ধুলায় কৃষ্ণপদ সর্বাগ্রগণ্য। তাঁকে ছাড়া আমাদের আসর জমে না। তাঁর চলনে ছিল অপূর্ব রসের মিশ্রণ। দেহবর্ণ তাঁর কৃষ্ণ নামের সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেছে। নিখুঁত মিশকালো দেহজীর কৌলীন্তে কৃষ্ণপদ ক্যাম্পে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ও আমাদের এই ধারণা চকিতে বদলাতে হয়েছিল সত্তা আগত মতিবাবুর শুভাগমনে। কৃষ্ণের রং শুধু কৃষ্ণই ছিল। মতিবাবুর গাত্রবর্ণ ঘণকৃষ্ণ। সবাই কৃষ্ণপদকে সাস্তুনা দি'য় বলত,—“হুঃখ কোরনা ভাই, জীবন সংগ্রামে হারজিত তো আছেই।” চারিদিক থেকে উঠতো হাসির উল্লাস-ধ্বনি, কৃষ্ণপদের হাসির শব্দ গগন বিদারী।

সাত

বন্দীশিবিরের আবহাওয়াকে একেবারে নিষ্করণ মরুভূমি মনে করলে ভুল হবে। এখানে মাঝে মাঝে ছ'চারটি পাখি পাদপের সন্ধানু মিলবে। ভূপতিদাকে (শ্রীভূপতি মজুমদার) এই প্রসঙ্গে স্মরণ কোরতে হয়। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসব্যঞ্জনা ও সাহিত্যিক ক্ষমতায় ক্যাম্পে একটি রসচক্রে স্থাপন করেছিলেন। ক্যাম্পজীবনের একঘেয়ে পরিবেশে ভূপতিদা কত বিচিত্রভাবে সজীবতা সৃষ্টি কোরতেন। ক্যাম্পের অভ্যন্তরে মাঝে মাঝে অভিনয়ে ব্যবস্থা হোত। বন্দীদের মধ্যে গুণী ব্যক্তির অভাব ছিল না। চমৎকার অভিনয় করত কেউ কেউ। কৃষ্ণপদর ভূতোর অভিনয় ছিল অনবদ্য। শিল্প ও সাহিত্যের মাধ্যমে স্মরণপতি চক্রবর্তীর আনন্দ পরিবেশন উপভোগ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর নামও স্মরণ যোগ্য। সন্তোষ গাঙ্গুলী দেউলী বন্দী শিবিরে আত্মহত্যা করেন।

শীতের একরাতে এক মনোজ্ঞ জলসার আয়োজন হচ্ছে। আমরা সেই রাত্তিকে পলায়নের প্রকৃষ্ট সময় বলে সাব্যস্ত কোরলাম। কেন না প্রধান ফটকের সামনে উত্তর দিকে রাজবন্দীদের জগু নির্দিষ্ট ব্যারাকে আমোদ প্রমোদ বা কোন হাসির অভিনয়

বিপ্লবের পথে

চলতে থাকলে সিপাহীরাও সেদিকে আকৃষ্ট হবে,—তাদের সতর্কতা হবে শিথিল। সেই সময় দক্ষিণ দিকের দুর্বল স্থানের সুযোগ নিয়ে বন্ধুরা পলায়নের চেষ্টাকে সফল করতে পারবে।

অভিনয়ের দিন ও সময় ঠিক হয়ে গেছে। কয়দিন আগে থেকেই কৃষ্ণপদ অনুষ্ঠতার ভান করে দৃবে সরে আছে। জিতেন গুপ্ত সম্বন্ধে কাবো কোন ঔৎসুক্য থাকার কথা নয়। কৃষ্ণপদ অনুষ্ঠ একথা সবাই জানে। নির্দিষ্ট দিনে একদিকে অভিনয়ের আনন্দ-আয়োজন চলছে—অন্যদিকে সঙ্ক্যা থেকে চলছে আমাদের প্রস্তুতি। বস্ত্রার শীত প্রচণ্ড, ক্যাম্পের ভিতর খবের মধ্যেও হাড়ে কাপুনি ধবে,—ওদেব কাটাতে হবে সারারাত বাইরে। প্রয়োজন-মতো শীতবস্ত্র সাথে কবে নিয়ে কাটা তাবের বেড়া ডিঙানো সম্ভব নয়। অতি হালকা পোষাক পরিচ্ছদে দেহকে আটসাঁট আবৃত কবে বেড়া ডিঙাতে হবে। একটুখানি শব্দ হইলেই গুর্থী শাস্ত্রীর গুলীও হাত থেকে বেরাও নেই। সাপায় পাগলী গরমটপী, হাতে দস্তানা, গায়ে পাতলা গবমজামা, পবণে জাগিয়ার উপর ধুতি, পায়ে রবারের জুতা মাত্র সঞ্চল করে বন্ধুদয় তৈয়ারী হয়ে আমাদের কামরায় এলেন। নির্দিষ্ট স্থান থেকে ধীরেশ রায় ও যশোদা চক্রবর্তী ইংগিত করা মাত্র বন্ধুরা রওনা হয়ে গেল সবার অলক্ষ্যে। তিনচান মিনিট পবে ধীরেশ রায় এসে উভয়েব নিরাপদে প্রাচার পার হবার সংবাদ জানালো। আমরা যারা পলায়নের ব্যবস্থায় রত ছিলাম—মুখে নীরব হাসি হেসে আপন আপন স্থানে চলে

বিপ্লবের পথে

গেলাম। আমাদের আচরণে কোন চাঞ্চল্যের আভাস মাত্র ছিল না,—কিছু বৃকের ভিতর ছিল ঝড়ের দোলা। দুঃসাহসী অভিযাত্রী বন্ধুদ্বয়ের যাত্রাপথ নিষ্কটক হোক এই বামনাই বৃকের প্রতিটি স্পন্দনে নীরবে উৎসারিত হচ্ছে। রাত্রে প্রহর গুণছি ভোরের জগৎ ক্লান্ত প্রতীক্ষায়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জলসার স্থান থেকে হাল্কা হাসির ছল্লোড় ভেসে আসছিল। বন্ধুদের কেউই এখন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি তাদের দুজন সহযাত্রী আজ বেড়িয়েছে বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে।

ভোরের আলো পূর্বের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে। কত অজানা আশঙ্কায় বৃকের ভিতরটি মথিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গেলাম পলায়নের সেই বিশিষ্ট স্থানটি পর্যবেক্ষণ করতে। বন্ধুরা নিদর্শন রেখে গেছে একজোড়া দস্তানা কাঁটা তাদের বেড়ার মধ্যে। শার্লক হোমস এর মত গোয়েন্দার পাশ্চাত্য পড়লে এই দস্তানার সূত্র ধরে পলাতকদের আণিষ্কার হয়তো সহজ হতো।

বন্ধুদের সংগে আবার আমার যখন সাক্ষাৎ হয়, তাঁদের কাছে এই দিনের ঘটনার যে বিবরণ পেয়েছি, এখানে পাঠকদের কোতু-হল নিবারণের জন্য তার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি। পলায়নের রাতে প্রচণ্ড শীত ও গভীর অন্ধকারে প্রাচীর ভিড়িয়ে বন্ধুদ্বয় যে পথ পেয়েছিলেন, সেটি নীচের দিকে নেমে আর একটি পাহাড়ের গা-বেয়ে উপরে উঠেছে। পাহাড়ে উঠে তাঁরা দিশেহারা হয়ে একটি

বিপ্লবের পথে

গাছের উপর চড়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা কোরলেন। গাছের ডালে বসে নীচে হিংস্র বন্য জন্তুর গতি বিধি লক্ষ্য করছিলেন। এদিকে পাহাড়ের দুর্দান্ত শীতে তাঁদের সর্বাংগ শিথিল হয়ে নীচে পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। অগত্যা পরণের কাপড়ের একাংশ দিয়ে তাঁরা গাছের ডালের সংগে নিজেকে দেহকে বেঁধে কোনমতে প্রভাতের অপেক্ষায় প্রহর গুণছিলেন। প্রভাতের সূচনায় তাঁরা গাছ থেকে নেমে ক্যাম্পের বাইরের উত্তর পাশের বন্যা দুয়ার ফেঁশনের দিকে রওনা হন। পথের মাঝে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটিও তাঁরা শাস্ত্রীদের অলক্ষ্যে পেরিয়ে যান। ক্রমাগত হেঁটে পৌঁছে যথাসময়ে তাঁরা গাড়ী ধরতে সক্ষম হ'লেন।

পলায়নের পরদিন সকাল ৯টা ১০টার সময় অনেক ক্যাম্প বন্ধু কৃষ্ণপদর খোঁজ নিতে এসে তাকে পেলো না। মাদারীপুরের সন্তোষ দত্ত মহাশয় এলেন জিতেন গুপ্তের খোঁজ নিতে, না পেয়ে ফিরে গেলেন। এই অবস্থায় কে কি আন্দাজ কোরলেন বলা মুশ্কিল। কোন অসংগত কোঁতুহল প্রকাশ করা বা আন্দাজ কোরে এ নিয়ে গাল গল্প করা বিপ্লবী চরিত্রের বিরোধী। দল নির্বিশেষে যে কোন বিপ্লবী বন্ধুর চরিত্রেই এই নৈশিফ্যের সন্ধান মিলে। তাই কৃষ্ণপদ বা জিতেন গুপ্তকে ক্যাম্পের মধ্যে খুঁজে না পেয়েও কেউ কোন প্রকার কাণাঘুষো পর্য্যন্ত সেদিন করেন নি। এমন কি মনের সংশয়টুকু নিবারণের জগুও সংশ্লিষ্ট দলকে জিজ্ঞেস করেন নি।

বিপ্লবের পথে

পলায়নের দ্বিতীয় দিন বিকাল বেলা, কমুনিষ্ট দলের সদস্য অ'কুর রেজ্জাক এসে একান্তে আমায় বলেন,—ক্যাম্পের নাপিতের সাংগে কৃষ্ণপদ ও জিতন গুপ্তর দেখা হয়েছে—ষ্টেশনের পথে। সে তো মহাখুসী। রেজ্জাক সাহেবই ক্যাম্পের নাপিতকে বারণ করে দিয়েছেন একথা ঘৃণাকরে আর কারো কাছে প্রকাশ করতে। এমনি করেই নিরপেক্ষভাবে বিপ্লবী কমীরা একে অন্যকে সহায়তা দান করেছে। এই সহায়তার পরিমাণ হয়তো সামান্য,—কিন্তু অমূল্য।

বন্ধুদয়ের পলায়নের পর তিনদিন কেটে গেল। শিবির কত পক্ষ কিছুই টেন পায় নি। কিন্তু ক্যাম্পের বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছে। নিশেধ সশংক চিত্রে এর প্রতিক্রিয়া প্রতীক্ষা কোরছে সবাই। তখন ক্যাম্পের কমান্ডান্ট ছিল—কোটাঁম। বিপ্লবী আন্দোলন দমন করে ঢাকার নাগরিকদের উপর বেপরোয়া অত্যাচার চালিয়ে ইতিপূর্বে সে যথেষ্ট শুনান অর্জন করেছে। আম'ব অগ্রজ ৮বিঃলানন্দ কনিষ্ঠ মাতা অজিতানন্দের গ্রেপ্তারকালে খানাতারাসীর পবেয়ানা দেগতে চাওয়ার ঔদ্ধত্যের অপরাধে এই স্বনামধন্য কোটাঁমের হাতেই প্রহৃত হন। আমাদের বৃদ্ধা মাতাও লাঞ্ছনা থেকে রেহাই পান নি। কংগ্রেস নেতা ও অনুশীলন সর্মিতির ভূতপূর্ব সদস্য ঢাকার লক্ষপ্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবীন বয়সেও এই কোটাঁমের যথেষ্ট লাঞ্ছনার হাত হ'তে অব্যাহতি পান নি। এহেন কোটাঁম-

বিপ্লবের পথে

কেই বজ্র ক্যাম্পে পাঠান হয় সম্মানবাদীদের শায়েস্তা করবার জন্য। আর তারই আমলে দুইজন বন্দী পাহাড় জংগলে পরিবেষ্টিত এমনি সুবক্ষিত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে গেল।

চাবদিন পরে। বেল। ১০টায় ক্যাম্প কমাণ্ডে কোটান সাহেব সদল বলে ক্যাম্পেব অভ্যন্তরে প্রবেশ করে জিতেন ও কৃষ্ণপদর থাকবাব ব্যাবাকে এবং রান্নাঘরে এসে মানেজার ক্ষিতীশ বানার্জীকে এই দুইজনের অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করল। উত্তরে ক্ষিতীশ বাব বললেন, —“কাল রাত্রে তাদের দেখেছি, এখন কোথায় জানিনা।” ক্ষিতীশ বাবর ডাবাব শুনে কোটাস সদল বলে পলাতকদের ব্যাবাকে ঢুকে নাম মাত্র তল্লাসী করে ক্ষিতীশ বাবকে জানাল, কিছুক্ষণ আগে এই মর্মে কলকাতা থেকে তার এসেছে যে, বন্দী কৃষ্ণপদ ও জিতেন গুপ্ত ক্যাম্প থেকে পালিয়ে কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তিন চার দিন আগেই তারা ক্যাম্প থেকে অন্তর্ধান করেছে। এই কথা বলে কমাণ্ডে পলায়নের সত্বেব সন্ধানে প্রাচীর ও তারের বেড়ার চাবিদিক ঘূবে বেড়াতে লাগল, কিন্তু সে দস্তানা জোড়া কাঁটাতারে আটকে হাওয়ায় উড়ছিল তা তার নজরে পড়ল না। অফিসে ফিরে গিয়েই সে প্রধান ফটকের শাস্ত্রীদের তলব করে পাঠালে। তাদের কেউই সন্তোষজনক কিছু বলতে পারলো না। জনৈক অল্পবয়স্ক গুর্খা সিপাহীকে দায়ী করাতে সে ভাবাব দিয়েছিল —“যব পাকড়া যায়েগা তব্‌ মালুম হোগ। বাব লোক জরুর সচ

বিপ্লবের পথে

বোলগা, হামাবা সামনেসে ভাগ গিয়। হোগ। হো। উম্ ওয়াকত বহ
লোগ স'চ বোলগা।' এমন জবাবেব পর শাস্তিমূলক ব্যবস্থাব
সংকল্প শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ভাগ করেন নহে শোনা যায়।

কুখ্যাত কোটাম সাহেব এমন চরম আখ্যাত নাববে সহ্য কববে
না এটা এক প্রকাব স্থিতি নিশ্চিত। দু'তিনদিন এমনি কেটে
গেল। হযাতা সে মনে মনে মন্দ আটছিলো। কি কবে বন্দীদেব
শায়েস্তা করা যায়। দিন তিনেক বাদেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থাব
প্রকাশ পোনে লাগলো। প্রথমেই খাবাবেব এবাদ টাকা অধিক
করা হলো। ক্যাম্পেব অভ্যন্তরব কোমি অভিযোগই শুনেতে সে
প্রস্তুত নয। ক্যাম্পেব ভিতরে সামরিক ক'দদায় নিয়ম শংখণা
বজায় রাখবাব ব্যাপ চেষ্টা করণ। নতুন বিষয় খণা দেখ দিন।
কোন অভিযোগেব জবাব দায়াস্ত পোতান ন। উপকরণাট লিউ-
লিন, আর্ট, 'স এ'। সবেমাত্র বিলুপ্ত গেলে মনে এখন কমাণ্ডাট
কেটামেব অধীনে শিক্ষানবিশী করাছিলো। তাব কোন ক্ষমতাই
ছিল না। দিনেব পর দিন ক্যাম্পে অভিযোগ জমেই উঠেতে লাগল,
অথচ প্রতিকাবেব কোন ব্যবস্থাটি হোল না। ক্যাম্পেব ভিতরে না
এসে কোটাম সাহেব তাব অফিস থেকেই শুণ্ড তুফান চালাছিলো।
পুনঃ পুনঃ তাগিদ দিয়েও বন্দীরা কোন কথব জবাব পাচ্ছিলেন
না। লিউলিন পয়ান্ত কোটামেব এই ব্যবস্থায় খুশী ছিল না।
তাব সংগে দেখা কবে আনবা কোটাম সাহেবেব সহিত সাক্ষাৎ-
কাবেব দাবী জানালাম। সে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন জানতে চাইলো।

বিপ্লবের গথে

জবাবে বললাম, বন্দীদের রাশিকৃত অভিযোগের সুশীমাংসার সদৃচ্ছা নিয়েই আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই, বিশেষ করে তার নিজের যখন কিছুই করার ক্ষমতা নেই। কোটাম সাহেব সাক্ষাৎ না করায় লিউলিনের কাছে তার উদ্দেশ্যে ভীক, কাপুরুষ ইংরাজ, শাসনের একান্ত অযোগ্য অফিসর ইত্যাদি গালিবাণ্ড প্রয়োগ করতে কসুর করলাম না। আমাদের আভ্যন্তরীণ আলাপ আলোচনায় স্থির হয়েছিল যে, ক্যাম্পের এই অত্যাচার অবিচাব এখন ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং স্বাভাবিকভাবে অভিযোগ পেশ করে তার প্রতিকার আর সম্ভব হবে না। শিবিরের ভিতরের খবর বাইরে পৌঁছায় না। বাইরে থেকে সেখানে কারুর আসাও সম্ভব নয়। একমাত্র ক্যাম্পের অভ্যন্তরে কমাণ্ডাণ্টকে কেন্দ্র করে কোন বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হলেই হয়ত বিচারালয়ের মারফৎ তা বাইরের জগতে পৌঁছাতে পারে। আলাপ আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, কোটাম সাহেবকে আঘাত করতে পারলেই ঐক্য সম্ভাবনা দেওয়া দেব। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা কোটাম সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হলাম। সে সাক্ষাৎ করতে রাজী হল। সাক্ষাতেই জায়গা অফিস ঘর। প্রধান কটক থেকে বার হয়ে সোজা উত্তর দিকে সামান্য দূরেই অফিস। একজন সিপাহী দর্শনপ্রার্থীদের নাম অনুযায়ী একজন করে কমাণ্ডাণ্টের অফিস গৃহে যেতে দিল। এইভাবে আমাদের চার পাঁচজন ব্যর্থকাম হয়ে ফিরে এল। এবার আমার পালা। প্রণে ধূতি, সাট, পায়ে চটী জুতা। এভাবেই অফিস ঘরে প্রবেশ করলাম। ঢুকতেই কমাণ্ডাণ্ট অভি-

বিপ্লবের গথে

বাদন কবল। আমিও প্রত্যাভিবাদন করে চেয়ারে বসে পড়লাম। আমার সানেশনটাই দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে। মুখোমুখী একটি বড় টেবিলের অপর পাশে কোটাম হেলান দেওয়া একটি চেয়ারে বসে আছে। শুভচ্ছা জানিয়েই সে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। ফলে তার মুখখানি প্রায় দেখাई যাচ্ছিল না। আমার ডান পাশের কোণে লিউলিনের টেবিল। সে একমনে হিসাব পত্র পরীক্ষা করছে বলে মনে হল। দু'চাবটা কড়া কথা বলে উত্তেজিত করতেই কোটাম সাহেব চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। সেই সুষোগে আমি চট করে পায়েব চটী তার গালে ছুঁতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গেই আমার গালে, মাথায়, পিঠে বেদন প্রহর পড়তে লাগলো। রক্তাক্ত হোঁশে মূর্ত-মধোটে আমি চেয়ারের উপর লটিয়ে পড়লাম, আমার মাথা ঝুঁক পড়লো নোবি লন মন। কে পাশ কিকপ আঘাত লাগল মস্তক বৃক্কে পাবলান না, তবে আমার বাক্শক্তি রহিত হয়ে গেল। ঈতিনধে পাগলাঘাটে বেড়ে উঠতেই সিপাহী-শাস্ত্রীরা প্রস্তুত হয়ে ছুটে আসছে সবতে লাগলাম। জুতো খেয়েও কোটাম টারাজ সুলভ চিত্রকর্মে কর্তব্যবোধ হাবায় নি। ক্যাম্প ডাক্তারকে ঔষধ-পত্র সহ অবিলম্বে চল আসতে নির্দেশ পাঠালো। ডাক্তার শ্রীমাখন লাগ চক্রবর্তী (বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজের কিজিওলজি বিভাগের অধ্যক্ষ) নির্দেশ পাওয়া মাত্র ঔষধ-পত্র ও যন্ত্রাদি সহ এসে অফিস ঘরে প্রবেশ করেই সমস্ত সেলাই ব্যাগেজাদি কবে আমাকে ট্রেনে উঠালেন। আমাদের কাব্যজীবনে যে সব সরকারী ডাক্তার ও জেল কর্মচারীদের কাছ থেকে সহ-

বিপ্লবের পথে

য়তা ও সহৃদয়তা পেয়েছি এই মাখন বাবু তাঁদের সাথে আমাদের স্মৃতিতে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। ডাক্তার সহ কোটাম্ ও তার সহকর্মী ষ্ট্রেচারে করে আমাকে ব্যারাকে পৌঁছে দেবার জন্য ক্যাম্প গেট পর্যন্ত এলো। গেটেই বন্ধুরা সব ভিড় কবে প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে আমাকে পৌঁছে দিয়েই ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ চলে গেল।

পবনর্তী কালে দগ্ধিত অবস্থায় সুদীর্ঘ কাবাজীবনে ভাবতীয় ও ইংবাজ কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের তুলনা কবে দেখেছি যে, শত্রুর প্রতিও ইংবাজদের কর্তব্যবোধ ও মানবীয় ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। সভ্যতার সাধারণ বীতিনীতি তাবা মেনে চলে। সেই সময় ভাবতীয় অফিসারদের বেলায় এ পরিচয় খুব কমই পাওয়া গেছে। কোটাম সাহেব আহত বন্দীরা চিকিৎসার আশ্রয়স্থানও এটি কবেনি। সহকর্মী সহ আমাকে গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিতে কসুব কবেনি।

ব্যাণ্ডেজ বাধা অবস্থায় নিজেদের ব্যারাকে শুয়ে পড়ে রইলাম। তার পরদিন বন্ধুদের ধীরেন মুখার্জী আব'র কোটাম সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী হলেন। পূর্বদিনের মত কোটাম তাঁকেও ডেকে পাঠালো। পৌছানাত্রই ধীবেনবাবু বাহাতে তাঁর জুতো কোটাম সাহেবের প্রতি ছুঁড়ে মাবলেন। বন্দীরা ডান হাতেব প্রতি লক্ষ্য রাখাব সম্বন্ধে হয়তো সিপাহীদের সতর্ক কবে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাহাতও সমান ক্ষিপ্ততা ও নিপুণতার সংগে চালাতে

বিপ্লবের গথে

পারে এমন কেউ এসে উপস্থিত হবেন এ ধারণা সিপাইরা করতে পারেনি বলে ধীরেন বাবু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হন নি। বাঁহাতে নিষ্কিপ্ত জুতা কোটাম সাহেবের গালেই সজোরে আঘাত করল। বলা বাহুল্য ধীরেন বাবুও সিপাইদের বেপয়োরা আঘাতের হাত থেকে অব্যাহতি পান নি। তবে তাঁর গা কেটে রক্ত বেরোয় নি এই যা তফাৎ। আহত ধীরেন বাবু ক্লান্ত দেহে বন্দী ব্যারাকে ফিরে এলেন।

শিবিরাধ্যক্ষের উপর পর পর দুইদিন আক্রমণ হলো। প্রতিটি আক্রমণের রিপোর্ট উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার যোগে প্রেরিত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া বাংলার অন্যান্য বন্দী-শিবিরগুলোতেও দেখা গেছে। বঙ্গার শিবিরাধ্যক্ষ ত বটেই অন্যান্য শিবিরের অধ্যক্ষরা ও অধিকতর সুরক্ষিত অবস্থায় শিবিরের মধ্যে আগমন নির্গমন কোরতে আরম্ভ করলো। বঙ্গা শিবিরে পীড়নের মাত্রা গেল চড়ে, এবং প্রতিশোধমূলক হয়ে রাজবন্দীদের উপর গুলী চালনা করা যায় কিনা কর্তৃপক্ষ তারই সুযোগ খুঁজছিল।

আট

সেবার মারের ধাক্কা সামলাতে সপ্তাহ তিনেক লেগেছিল। এ সময় আমাকে ও ধীরেন বাবুকে—শিবিরাধ্যক্ষকে প্রহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে আলিপুর ছুয়ারে বিচারের জ্ঞপ্তি পাঠানো হলো। বিচার কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে হোল না—সরকার জলপাইগুড়ি জেলের মধ্যেই বিচার ব্যবস্থা করলেন। এই সময় ১৮১৮ সালের ৩ আটনের বন্দী দেশপ্রিয় যতীন্দ্র-মোহন সেনগুপ্তকেও দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আমাদের মামলা পরিচালনা করবার জ্ঞপ্তি তিনি কলকাতার বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন ও জে, সি, গুপ্তকে অস্থরোধ করে পাঠালেন। এই সময় জলপাইগুড়ি জেলে কংগ্রেস নেতা খগেন দাশ গুপ্ত, প্রফুল্ল ত্রিপাঠী, শশধর কর, ও বীরেন সরকার, বর্দ্ধমানের কালাচাঁদ ব্যানার্জি এরা কয়েকজন রাজবন্দী হয়ে আটক ছিলেন।

প্রথম শুনানীর তারিখেই ব্যারিষ্টারদ্বয় উপস্থিত হয়ে মামলা পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন। মামলা চলতে লাগল। অনেক চমকপ্রদ বিষয়ের অবতারণা হোল। কোর্টাম সাহেবের দুর্ব্যবহারের ফিরিস্তি যা এতকাল সাধারণ্যে অপ্রকাশিত ছিল, এবার মামলার মারফৎ তা প্রকাশের পথ পেলো। ক্যাম্প-কিচেনের ম্যানেজার হিসাবে তাঁতাব সহিত আমার আচরণ, পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী ও জিতেন

বিপ্লবের গথে

গুপ্তের বজ্রা শিবির থেকে পলায়নের কি প্রতিক্রিয়া তার মনে হয়েছিল—কৌশলী ব্যারিষ্টারদ্বয়ের জেরার মুখেই বেরিয়ে পড়ল।

ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বিপ্লবী-আন্দোলন দমনের নামে কোটাম নাগরিকদের উপর বিরূপ অত্যাচার করতো—আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনা কারণে প্রহার ও কারাগারে নিক্ষেপ, বৃদ্ধা মাতার উপর নির্যাতন প্রভৃতি তার ম্যাজিস্ট্রেট জীবনের কুকার্তির দীর্ঘ ফিরিস্তি কোর্টে উত্থাপিত হোল।

জলপাইগুড়ি জেল থেকেও পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম। অম্মশীলনদলের জলপাইগুড়ি জেলা সংগঠনের সঙ্গে আমাদের গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হোল এবং সাঙ্কেতিক চিঠিতে কলকাতার ফেরারী বিপ্লবী বন্ধুদের কাছেও আমাদের পরিকল্পনার সংবাদ দেওয়া হোল। সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদের অভিপ্রায় অনুমান করে নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সাহায্য করতে চাইলেন। সবদিক চিন্তা করে, বিশেষ করে এতবড় একজন সম্মানিত নেতার সুনাম ও পারিপার্শ্বিক অশ্রান্ত বিষয় ভেবে, আমরা তাঁর আন্তরিক সাহায্য গ্রহণ করলাম না। বৈপ্লবিক কাজ খুব নিখুঁত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলেও গোয়েন্দা বিভাগের হাত থেকে রক্ষা পায় না। বহু সংখ্যক গুপ্তচরের সাহায্যে গোপন খবর পাওয়ার ব্যবস্থা তাদের আছে। বিশেষ করে যারা শেষের দিকে বিপ্লবীদের কঠোর শিক্ষানবিশীর

বিপ্লবের পথে

সুযোগ পান নি, তাঁরা অনেক সময় অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃই কথা গোপন করতে পারতেন না। ইতিমধ্যে এক দিন দুপুরবেলা একজন জেল-কর্মচারীর মারফৎ কলকাতার চিঠি ও প্রার্থিত করাত এলো। সাক্ষেতিক চিঠির সাক্ষেতিক জবাব জলপাইগুড়ির স্থানীয় সংগঠন মারফৎ পেলাম।

আমি ও ধীরেনবাবু করাতটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম। বেশভাল লোহা-কাটা করাতটি, হাতল আছে, আমাদের ঘরের লোহার শিক কাটতে সুবিধা হবে। এবার শুরু হোল জেলের দুর্বল-স্থানের সন্ধান ও পলায়নের অত্যাশ্রয় পরীক্ষা কার্য। জেলার জেলগুলোতে প্রাচীর-প্রহরীর ব্যবস্থা থাকলেও সরকারী ব্যবস্থা একেবারে ক্রটিমুক্ত নয়। জলপাইগুড়ি জেলের ভিতরে এক কোণ ঘেঁষে বহিঃপ্রাচীর থেকে বেশী দূর নয় এমন স্থানে রয়েছে সাতটি নির্জন ঘর সারি বেধে। তারই পেছনের স্থানটি আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে উপযোগী হবে বলে স্থির হোল। খুব শীগগীরই কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে প্রাচীর ডিঙিয়ে পালাবো। বাইরের বন্ধুদের কাছে সংবাদ পাঠান হোল তারা যেন নির্দিষ্ট দিনে যথাযোগ্য সাহায্যের জন্ত প্রস্তুত থাকে। আমরা আস্তে আস্তে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের সংকল্প ও উদ্দেশ্যের সাকল্য কামনা করে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর শুভেচ্ছা ও মনের আনন্দ জ্ঞাপন করলেন।

আমরা সবদিক দিয়েই প্রস্তুত হচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে অকস্মাৎ একদিন দুপুর বেলা শুভার্ণো জ্ঞৈক' জেল-কর্মচারী

বিপ্লবের পথে

এসে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে গেলেন যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশের নির্দেশ ক্রমে কারাধ্যক্ষ এক্সুগি আমাদের দুজনের জিনিষপত্র তল্লাসী করতে আসছেন। গোয়েন্দা-পুলিশের খবর হোল কলকাতা থেকে একটা লোহা-কাটা করাত পাঠান হয়েছে এবং তা আমাদের কাছেই রয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেল কর্তৃপক্ষ সিপাহী শাস্ত্রীসহ সদলবলে এসে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করেই জোর খানাতল্লাসী শুরু করে দিলো। কিন্তু তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেও কিছুই আবিষ্কৃত হলো না। কর্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। এই সংবাদের সংগে সংগে সরকারী মামলা পরিচালনাও স্থগিত করা হোল, খুব তাড়াছড়ো করে মামলা শেষ হোল। আমাদের উপর ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হোল।

এবার শুরু হোল আমাদের সায়েস্তা করার পালা। রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে আমরা প্রেরিত হলাম কারাদণ্ড ভোগের জন্য। এই জেলে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলাম দণ্ডপ্রাপ্ত বিপ্লবী বন্দীদের উপর অমানুষিক গীড়ন চলছে। আমাকে ও ধীরেন বাবুকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হোল। এই (ক) নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা বেশ নিখুঁত ভাবে করা হোল। আমাদের দুজনের মধ্যে দেখা শুনা বা পত্র বিনিময়ের কোন সুযোগই রইলো না।

(ক) নিঃসঙ্গ সেল (Solitary Cell) সাধারণতঃ শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট। নিঃসঙ্গ সেল-বন্দীর পক্ষে ডিগ্রির অস্ত্র কোন সেল-বন্দীর সংগেও দ্বিবারাত্তির কোন সবয়েই কোন কারণে বা অবস্থায় যোগাযোগ নিষিদ্ধ।

বিপ্লবের পথে

১০নং ডিগ্রি (ক) নিঃসঙ্গ সেল (খ) বলে পরিচিত হলেও সারা রাজসাহী জেলকে কতকটা সরগরম করে রেখেছিল। দণ্ডিও বিপ্লবী বন্দীদের মধ্যে চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত সুরেন্দ্র কর ও বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গোপাল গুপ্ত এই ডিগ্রির দুটি সেলে ছিল। চরমুগুরিয়া ডাকাতি মামলায় মনোরঞ্জন ফাঁসী হয়। আর সাধারণ দণ্ডিত বন্দীর মধ্যে এক পাঠান ছিল এই ডিগ্রীতে। যৌবনে নরহত্যার অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পনেরো বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছে। বারো বছর কারাদণ্ড ভোগ করেও সে মুক্তি পায় নি।

তার কারণ হল সে জেলখানায় কারাবই নিকট কখনও মাথা নোয়ায় নি, এবং নানা শাস্তি ভোগ স্বীকার করে, এমন কি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে বহুবার বীর পাঠানের মতোই জেল খানায় জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ করেছে। আমি ছিলাম এক নম্বর সেলে এবং গোপাল গুপ্ত সাত নম্বরে, পাঠান যুবক পাঁচ নম্বর এবং সুরেন কর আট নম্বর সেলে থাকত। এই দশ নম্বর ডিগ্রির জন্ম বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। যে ডিগ্রীতে ত্বরন্ত বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দীদের রাখা হত সেখানে জেলের বাছাই করা পেটোয়া জেল-প্রহরী ও কয়েদী-প্রহরীর দ্বিবিধ কড়া ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

(ক) ডিগ্রি (জেলের চলতি নামে) উপশ্রাচীরে ঘেরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সেল সমূহের সারি।

(খ) সেল (Cell) নিরাপত্তা বা শাস্তির ব্যবস্থা হিসাবে উদ্দিষ্ট একজন মাত্র বন্দীর বাসের উপযোগী নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ।

বিপ্লবের পথে

রাজসাহী জেলে জাল ডিগ্রিতে তখন বহু বিপ্লবী বন্দী ছিল। তাদের ওপর সেসময়ে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল।

একটু বর্ণনা না দিলে জাল ডিগ্রি (Cubicle) সম্বন্ধে পাঠকের সুস্পষ্ট ধারণা হবে না। সাধারণতঃ একটি লম্বা ব্যারাকের মধ্যে লোহার তারের জাল দিয়ে দেয়াল, ছাদ সবই ঘেরা। পাঁচ ফুট উঁচু, ছয় ফুট লম্বা, সারে চার ফুট চওড়া পাশাপাশি সন্নিবিষ্ট একজন মাত্র কয়েদী থাকতে পারে এমন ছোট ছোট বহু কোঠা বা সেলের ছুঁটি সারি। ছরস্তু অথবা দাগী স্বভাব কয়েদীদের (Habitual Prisoners) জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাত্রে এখানে সাধারণত ঐ জাতীয় কয়েদীদের রাখা হয়। কখনও কখনও শাস্তি বা নিরাপত্তা হিসাবে দিনরাতও কাউকে কাউকে থাকতে হয়। জালের বেড়া ছাড়া আর কোন আকুর ব্যবস্থা নেই। প্রত্যেকটি কোঠায় পৃথক পৃথক দরজা আছে। দরজায় তালা লাগান থাকে। প্রত্যেকটি কোঠায় মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা হিসাবে আল্কাতরা লেপা একটি করে টুকুরী থাকে। এক কোঠার মল-মূত্র পাশের কোঠায় অনায়াসেই গড়িয়ে যেতে পারে। এই পরিবেশে অনেককে হয় তো রাতদিন কাটাতে হয়। কারুর ভাগ্যে কখনও কখনও দীর্ঘ ভোগের ব্যবস্থাও হয়। কখন কখন সেলের মধ্যে বসে নির্দিষ্ট খাটুনীও খাটতে হয়। কোঠার স্বাভাবিক উচ্চতা নেই। দেহ-সঞ্চালনের জায়গা অতি অল্পই। জাল ডিগ্রির ছুঁর্ভাগাদের অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ই কাল কাটাতে হয়। জেলের সেল সম্বন্ধে

বিপ্লবের পথে

একটা স্বাভাবিক বিভীষিকা আছে—একান্ত নিঃসঙ্গতার কারণে সেল জীবনও ক্রমে সয়ে যায়, কিন্তু জাল ডিগ্রি বাসে প্রাণ ওঠে হাঁপিয়ে।

দশ নম্বর ডিগ্রিতে আমরা অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থাতেই ছিলাম। অবশ্য নির্যাতনের পাল্লা সেখানেও কম ছিল না? বাছাই করা যে সব সিপাই ও কয়েদী-প্রহরী মোতায়েন হত, তারা কখনও দুর্ব্যবহারের সুযোগ নষ্ট করত না।

রাজসাহী জেলে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেলাইয়ের কাজ দেওয়া হোল। দৈনিক চব্বিশটি কয়েদী জাক্জিয়ার বড় সেলাই অথবা আঠারটি কুর্তার (জামা) বড় সেলাই নির্দিষ্ট কাজ হিসাবে সমাপ্ত করে দিতে হবে। অনভ্যস্ত হাতে এতটা কাজ করে ওঠা সম্ভব হ'ত না। বিশেষ করে জাক্জিয়ার কাজ শক্ত তো ছিলই, সময়ের হিসাবে কাজের পরিমাণও বেশী ছিল। পুরা খাটুনী দিতে না পারলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

তা ছাড়া অতি তুচ্ছ অজুহাতে ও তুচ্ছ ক্রটির জ্ঞাও শাস্তির বিধান ছিল। একদিন কারাসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল ফ্লাওয়ারডিউ সাহেব জেল পর্যবেক্ষণ কালে ডিগ্রির পাশে এসে আমাদের সাধারণ কয়েদীর মত তার সামনে দাঁড়াতে বললে আমি অস্বীকার করি। ক্রুদ্ধ হয়ে সে আমায় সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে সিপাই শাস্ত্রী দিয়ে তার পছন্দ মার্কিন কায়দায় সবলে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো। অনেক ধস্তাধস্তি করেও সিপাইরা অকৃতকার্য হলে আমার ওপর এক মাসের জ্ঞা নিঃসঙ্গ সেল বাস ও ডাণ্ডাবেড়ির শাস্তি বিধান

বিপ্লবের পথে

করা হয়। স্থানীয় কারাধ্যক্ষ লিউক অবশ্য এক্ষেত্রে আমার কোন দোষ পায় নি। বিভাগীয় কর্তাব আদেশ তাকে মেনে চলতেই হবে।

একমাসের জন্তু পায়ে ডাঙাবেড়ি পরে আমরা নিঃসঙ্গ সেলবাস করতে হল। কারাবিধান অনুযায়ী নিঃসঙ্গ সেল-বন্দীর জন্তু সকালে বিকালে দুবার মোট একঘণ্টা করে বেড়াবার ব্যবস্থা আছে। আমার সেলের ঠিক সামনেই সম-আয়তনের ছাদবিহীন উপ-সেল ছিল। এই উপ-সেলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আঙ্গিনাটুকুই আমার নিদিষ্ট পাদচারণের স্থান। নিঃসঙ্গ সেলবাসের ব্যবস্থা অনুসারে আমার সেলটি প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তালাবদ্ধ থাকত,—নির্দিষ্ট প্রয়োজন ছাড়া তালা খোলা হ'ত না। সেল থেকে ও উপসেলে পা বাড়ান মাত্রই উপ-সেলের বাইরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হত, যাতে আমি ডিগ্রির অজ্ঞাত বন্দীদের সাথে মেলামেশা বা কথাবার্তা কইতে না পারি। দশ নম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালীন আমি, পাঠান যুবকটি ও অপর দু'জন বন্ধুর সঙ্গে সকাল বিকাল পায়চারি করতাম। নিঃসঙ্গ বন্দীত্বের কালে সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেল।

দশনম্বর ডিগ্রিতে থাকাকালে একদিন বেলা পাচটার সময় আমাব ডিগ্রি খুলতে দেরী হওয়ায় পাঠান যুবকটি সিপাইকে তিরস্কার করতে থাকে। সেলের ভিতর থেকেই আমি তার তিরস্কার শুনতে পাই। তালা খুলতে সিপাই অস্বীকার করলে সে সিপাইর হাত থেকে জোর করে

বিপ্লবের গথে

চাবীর তোড়া কেড়ে নিয়ে মূর্ত্তের মধ্যে আমার সেল নিজেই খুলে দিয়ে চাবি সিপাইর হাতে ফেরৎ দিয়ে দেয়। সিপাই বিপদ-সূচক বাঁশী বাজাতে উদ্ভত হলে পাঠানটি তাকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, সে বাঁশী বাজালে তার বিপদ হতে পারে কিন্তু তার আগেই সে সিপাইকে মেরে নিজেও মৃত্যুবরণ করবে। পাঠান যুবকটিকে চিনতো না পুরানো সিপাইদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না। তার কথায় ভয় পেয়ে এবং আমাদের হস্তক্ষেপের ফলে সিপাই বাঁশী বাজান থেকে নিরস্ত হল। ইতিমধ্যে দশনস্বর ডিগ্রি থেকে পলায়ন সম্পর্কে পাঠান যুবকের সহিত আলাপ করি। সে সম্মত হয়। হাতল-ছাড়া করাতে র্রেড ছু'খানা অস্ত্র লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলাম। সময় বুঝে অতি সঙ্কোপনে ও সতর্কতার সহিত সেহু'টো আমার সেলে আনিয়ে পরীক্ষা করলাম। অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় অযত্নে পড়ে ছিল বলে র্রেডে এত বেশী মরচে পড়ে গিয়েছিল যে, তা লোহা কাটার কাজে লাগলো না। এমতাবস্থায় শিক কেটে পলায়নের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হল।

কয়েদীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্ত জেল সুপার লিউকের সন্মান ছিল। বিপ্লবী-আন্দোলন রুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং গভর্মেণ্টের তরফ থেকে তাদের প্রতি খুব কড়া ব্যবহারের নির্দেশও আসে। কলে লিউক সাহেবের ব্যবহার ও আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। দমনদলন নীতি প্রয়োগের জন্ত রাজসাহী জেল তখন কুখ্যাতি

বিপ্লবের গথ

অর্জন কবেছে। বিপ্লবী বন্দীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। এই কঠিন অবস্থার অবমান ঘটাতে জন্ম তাঁদের অনেকেই লিউক সাহেবের উপর কোন আক্রমণের প্ররোচনার পক্ষপাতী হয়ে উঠলো। বাইরে থেকেই তখন সশস্ত্র আক্রমণ সম্ভবপর ছিল। সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্থায় আমাদের অবস্থা জানাবার জন্ম রাজসাহীর সংগঠনের নিকট একখানা গোপন চিঠি পাঠিয়ে দিতে সমর্থ হলাম।

একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় গবে মাত্র “লক্-আপ”, (Lock-up) হয়ে গেছে, আমাদেরও সেল গুলোতে বন্ধ করেছে, এমনি সময় চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রার প্রাচীরের দিকে পদ্মার ধার থেকে পর পর কয়েকটি গুলির শব্দ কানে এলো। আট নম্বর সেল থেকে বন্ধুবর স্মরেন কর মনেব উল্লাসে চৈতন্যে উঠল—“বেটা মরেছে” বলে। ইতিমধ্যে বিপদ-সূচক বাঁশী বাজতে লাগল, জেলের পাগলা ঘটি বেজে উঠল। আমরা যা ভাবছিলাম তাই। আশ ঘণ্টা পর সিপাহীদের পাহারার পরিবর্তন হলে জানতে পারলাম যে লিউক সাহেব গুলির আঘাতে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছে। সিপাহীরা যেন চোরের মত নিঃশব্দে পাহারা দিতে লাগল।

সন্ধ্যার সময় নদীর ধাবের রাস্তা দিয়ে লিউক সাহেব সস্ত্রীক মোটর চালিয়ে যাবার সময় অকস্মাৎ একজন তরুণ বিপ্লবী সাইকেল দিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দুইজন বন্ধু গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে আঘাত করে। গুলি তার মুখে লেগে চোয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে যায়—আঘাত গুরুতর।

বিপ্লবের পথে

আহত লিউক সাহেবকে অবিলম্বে স্পেশাল ট্রেন যোগে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

রাজসাহী জেলের দমন ও দলননীতি সাময়িক ভাবে বন্ধ হলো। মালিকহান অবস্থান মত রাজসাহী জেল স্থানীয় একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে চলতে লাগলো। জেলের প্রধানের উপর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া ক্ষুদে শাসকদের উপর স্পষ্ট দেখা গেল। নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান। তাদের মুখে বিভীষিকার কলো-ছায়া। অন্তর্দিকে মনের চাপা আনন্দ প্রকাশের সুযোগ না পাওয়ায় রাজনৈতিক ও অন্যান্য নিপীড়িত বন্দীদের চোখে মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের ভাব ফুটে উঠেছে। জেলের আবহাওয়া সাময়িক ভাবে শাস্ত হোল।

লিউক সাহেবের আততায়ী বলে ধৃত হলো, রাজসাহী সংগঠনের সভ্য ভোলানাথ রায়। বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারের জন্ত তাকে কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হলো। বিচারে ভোলানাথ রায়েব প্রতি সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও দীপান্তরেব আদেশ হলো।

নয়

ঘটনা ও দুর্ঘটনা সবেই প্রতিক্রিয়া আছে। লিউক সাহেবের প্রাণ হনন প্রচেষ্টায় আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ না থাকলেও কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছিল আমরা এই কার্যের প্রেরণাদাতা। কাজেই রাজসাহী জেল থেকে শীঘ্রই আলীপুর জেলে স্থানান্তরিত হলাম। রাজসাহী জেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে একমাত্র সাপ্তাহিক সঞ্জীবনী ও ইংরাজী ষ্টেটসম্যান-এর সাপ্তাহিক ওভারসীজ সংস্করণ পেতাম। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরা তো কোন কাগজই পেত না। সংবাদপত্র সরবরাহের এই সীমাবদ্ধ বরাদ্দের উপর সরকারী সেন্সরের কাঁচি যদৃচ্ছ চলে বেড়াতো। ক্ষুদ্র-বৃহৎ কর্তৃনচিহ্ন নিয়ে এই সংবাদপত্র যখন আমাদের হাতে আসতো, তখন তাতে দু'চারটি নারী হরণের সংবাদ অথবা সরকারের কোন কার্যের সাফাই-গান ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকতো না। রাজনীতি বা কূটনীতির গন্ধযুক্ত বিদেশী সংবাদ যা রয়টার কর্তৃক কৃপণ হাতে পরিবেশিত হোত, সরকারী সেন্সরের কাঁচি থেকে তাও অব্যাহতি পেত না। এমনি করে সংবাদবঞ্চিত ও বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে যখন আলীপুর জেলে এলাম, তখন সবিস্ময়ে দেখলাম ভারতের, বিশেষ করে বাংলাদেশের অনেক চমকপ্রদ ঘটনার সঙ্গেই আমাদের আদৌ পরিচয় ঘটেনি। সেন্সরের কাঁচি সেখানেই সার্থক হয়েছে।

বিপ্লবের গথে

আলিপুর জেল তখন বিপ্লবীদের বাসভূমি। সারা জেলময় তারা নানা পরিবেশে ছড়িয়ে আছে। সত্ত্বধৃত হয়ে কেউ হাজতবাস কোরছে, কেউ বা সাজা পেয়ে দণ্ডভোগ করছে, কেউ বা আন্দামানগামী জাহাজের প্রতীক্ষায় বসে আছে। আবার কেউ আলিপুর জেল হাসপাতালে রোগের চিকিৎসা করছে। অনুশীলন দলের বন্ধুদের মধ্যে সত্ত্বধৃত প্রভাত চক্রবর্তী ও আগরতলা ডাকাতি মামলায় দণ্ডিত কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীর সাথে দেখা হোল। কলকাতায় ফেরারী বিপ্লবীদের আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশ সরকারের চোখে আপত্তিকর জিনিসপত্র এবং সহকর্মীদের সংশ্রব প্রমাণের উপযোগী কাগজপত্রাদি সহ প্রভাত চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে। প্রাপ্ত কাগজপত্রের দৌলতে বাংলায় ও অগ্ন্যাগ্ন প্রদেশে বাপক তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ অনুশীলন সমিতির বহুসংখ্যক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের (Inter-Provincial Conspiracy) সূচনা হয় এই থেকে।

তের নত্বর ডিগ্রির এক নিঃসঙ্গ সেলে আমায় সতর্ক প্রহরায় রাখা হয়েছে। সেখানে এক টুকরো কাগজে এলো গোপন নির্দেশ, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী হবার জ্ঞাত অপেক্ষমান হ্রবীকেশ গুপ্ত আমারই পাশের সেলে। তাকে প্রভাবিত করে তার সংকল্পের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে। হ্রবীকেশ দেখছিল মুক্তির স্বপ্ন। তার মত পরিবর্তন করানো সম্ভব হোল না। বরং সেলে বসে তাকে যে সব পরামর্শ দিয়েছিলাম মুক্তির আশায় তার কিছু কিছু সে পুলিশের কাজেই ব্যবহার করেছে।

বিপ্লবের পথে

হ্রদীকেশকে আমার আওতা থেকে দূরে রাখবার জন্য আমাকে ‘বম্’ ইয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হোল।

পলায়নের ঝোঁক তখনো মাথায়,—অসুস্থতার অজুহাতে ‘বম্’ ইয়ার্ড থেকে জেল হাসপাতালে ভর্তি হই। হাসপাতাল তখন বিপ্লবী বন্দীতে জমজমাট। বক্সার পলাতক বন্দী কৃষ্ণপদ চক্রবর্তীও সেখানে আছে। আগরতলার এক ডাকাতিতে ধরা পড়ে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে এসেছে। বর্ধমানের অন্তরীণ স্থান থেকে পলাতক ও পরে কলকাতায় ধৃত প্রভাত চক্রবর্তী মহাশয়ও হাসপাতালে। তাঁর কাছে দলের সংগঠনের বর্তমান অবস্থা জানা গেল,—তিনি কি অবস্থায় কি ভাবে ধরা পড়লেন তাও বললেন। লিউক-হত্যার বড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ভোলা রায় ও শশী দে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেই দণ্ডভোগ করছে।

জেল হাসপাতালে থাকাকালীন কৃষ্ণপদের সঙ্গে পলায়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলাপ করলাম। আমাদের দলের সভ্য সুনেন্দ্র সেন তখন হাসপাতালে। তাঁর কাছে শুনলাম যুগান্তর দলের বিশিষ্ট বিজ্ঞোহী সভ্য ফণী দাশগুপ্ত ও সুরেন দত্ত রায় পলায়নের পরিকল্পনা নিয়ে হাসপাতালে এসেছে। ফণী দাশগুপ্ত বন্দীশিবির থেকে পালিয়ে বাইরে ফেরারী অবস্থায় ধরা পড়ে। ছ’টি মামলায় বত্রিশ বছর কারাদণ্ড লাভ করেছেন। ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় পনোরো বছর সাজা নিয়ে সুরেন দত্ত রায় আলিপুর জেলে আছেন।

বিপ্লবের গথ্য

হাসপাতালে ঘুমিয়ে আছি। রাত্রি ছুঁটো, চারিদিক নিস্তব্ধ।
হঠাৎ হট্টগোলের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘন ঘন সিপাইর বাঁশী
বাজছে, পাগলা ঘটি বেজে চলেছে। সদলবলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট
হাসপাতালে এসে হাজির। সাথীসহ ফণী দাশগুপ্তকে নিঃসঙ্গ
সেলে বন্ধ করে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হোল। আমার সমস্ত
অস্ত্র বিধাদে ভরে গেল।

ফণীবাবুরা শিক কেটে হাসপাতালের দোতারা থেকে কাপড়
ঝুলিয়ে নীচে নেমে পড়েছিলেন। সেখান থেকে পাঁচীলের দিকে
যাবার পথে একটি ঘরে কয়েকটা পোষা রাজহাঁস ছিল। মানুষের
পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে তারা পঁয়াক পঁয়াক করে চীৎকার শুরু করে
দেয়। লণ্ঠনধারী প্রহরী ছুটে এসে তাঁদের দেখে ফেলে।—ফলে
এই বিপর্যয়। আমাদেরও হাসপাতাল থেকে পালাবার প্রচেষ্টা
অনিদিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখতে হোল।

—*—

দশ

কোটাম মামলার সাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হোল। বছর চারেক পর আবার সেই পুরাণে প্রেসিডেন্সী জেলে এলাম। সেখানে তখন বিপ্লবী বন্দীর সংখ্যা তিন চার'শো হবে। তা'ছাড়া দণ্ডিত সত্যাগ্রহী বন্দীরা তো ছিলই।

প্রত্যেক বিপ্লবী দলেরই কেউ না কেউ সেখানে আছেন। অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য তখন প্রেসিডেন্সী জেলে ছিলেন। তাঁদের সাথে সংবাদ বিনিময় হল। বিভিন্ন ক্যাম্পেরও খবর পেলাম। বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেলে তখন দলের দণ্ডিত, বিচারাধীন যে সব বন্দী রয়েছে তাদের কাছ থেকে খবর যা সংগ্রহ করলাম এবং বাইরের দলের খবরও যতটা জানতে পারলাম সে সব মিলিয়ে দলের তখনকার অবস্থা মোটামুটি বোঝা গেল। পার্টি তখন নিজ কার্যক্রম অনুসারে অগ্রসর হতে প্রস্তুত ও সক্ষম। আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়ায় আশা ভরসা ও উৎসাহ কিছুটা বেড়ে গেল ; কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে আমি সমধিক পরিচিত।

প্রভাত চক্রবর্তীর নিকট প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী বাইরে তখনও অনুশীলন দলের যে সব ফেরারী বন্ধুরা ছিলেন তাঁদের সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়েছিল। কলকাতার সদর কেন্দ্রে তখন ফেরারীদের মধ্যে হরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির এবং মেয়েদের মধ্যে মায়া

বিপ্লবের গথে

নাগের নাম উল্লেখযোগ্য। জিতেন নাহা নামক জনৈক নতুন যুবকের নামও শুনলাম। নোয়াখালীর কিশোরী দাশগুপ্ত, এম্.-এ পড়ার সময়েই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কলকাতার বাইরে প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবপ্রসাদ রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বক্সা ক্যাম্প হতে আগত বন্ধুদের নিকট প্রাপ্ত সংবাদাদি হতে বুঝতে পারলাম যে, বহু বিশিষ্ট সভ্যের গ্রেপ্তারের ফলে শক্তিশূন্য সংগঠনকে বাঁচিয়ে আবার শক্তিশালী করে তুলবার জন্য জেল-ক্যাম্প থেকে অচিরেই বিশিষ্ট বিশিষ্ট বন্দী বন্ধুদের পালিয়ে বাইরে যাবার পক্ষে বক্সার দলীয় বন্ধু মহলে দৃঢ় মত গড়ে উঠেছে এবং তাঁদের মত ও আগ্রহকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তাঁরা স্থানান্তরিত কোন বন্ধুর মারফৎ এক হাজার টাকার একখানা নোট আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আটক বন্দীদের নিয়ম অনুসারে প্রাপ্ত জিনিষপত্রের একটা অংশ বাঁচিয়ে এবং তা গোপনে বিক্রী করে আগে থেকেই যে অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল, তা থেকেই ঐ টাকা তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন। আমরা সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতিমধ্যে খ্রীসত্বেন্দ্র মজুমদারের উপর অন্তরীণের আদেশ এল। যশোহরের কোন গ্রামে তাঁকে নজরবন্দী হিসাবে আটক থাকতে হবে। সত্যেনবাবু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র। রাজসাহী কলেজে পড়তেন। কৃতী ছাত্র বলে সেখানে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর বিপ্লবী আগ্রহ ও আন্তরিকতায় আমাদের কারো কোন সন্দেহ ছিল না, তাঁকে বাইরে পাঠাবার প্রস্তাব করা হলে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। স্থির হল অন্তরায়ণ স্থান থেকে

বিপ্লবের গথে

তিনি পলায়ন করবেন। ‘কালজানা’র একটি খালি কৌটোর মোড়ক খুলে তার গায়ে নোটখানি জড়িয়ে দিয়ে মোড়কটি আবার ভাল করে লাগিয়ে দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য কতগুলি টুকিটাকি জিনিষ ভর্তি করা হোল। অন্তরায়ণ স্থানে যাবার দিনে ছোটখাট নানা প্রয়োজনীয় জিনিসে ভর্তি আরও কয়েকটি কৌটোর সঙ্গে এই কৌটাটিও ট্রাঙ্কে ভরে দেওয়া হোল। তাঁর সঙ্গে যে টাকা দেওয়া হল এবং কি ভাবে দেওয়া হল তা আমি, চারুবিকাশ দত্ত ও প্রতাপ রক্ষিত ছাড়া আর কেউ জানতেন না। যে বন্ধুটি বঙ্গা থেকে গোপনে টাকা বয়ে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি দলের নিয়মানুযায়ী টাকা পৌঁছে দিয়েই কর্তব্য কায সম্পাদন করেছেন। এ বিষয়ে তিনিও বিন্দু বিসর্গ জানতেন না, জানবার চেষ্টাও করেন নি। সত্যেনবাবু তাঁর বই, বাস্তব, বিছানাপত্র সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন। তল্লাসীর সময় জেলফাটকে কিছুই ধরা পড়েনি। নিরাপদে জেল গেট পার হয়ে গেলেন। আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পুলিশের হেফাজতে সত্যেনবাবু যশোহরের পুলিশ সাহেবের কাছে উপস্থিত হলে তাঁর বাস্তব তল্লাসী শুরু হয়। পুলিশসাহেব সামনে থেকেই তল্লাসী করায়। জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুলিশসাহেব নিজেই কৌটাটি বার করে মোড়ক খুলে ফেলে নোটখানি বার করে ফেললো। সত্যেন বাবুর বুকে বাকী রইলো না যে, জেলের বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক আছে, যে ভিতর থেকেই পুলিশকে অতি গোপনে সংবাদ সরবরাহ করছে। প্রতাপ রক্ষিত ‘কালজানা’র কৌটাটি সত্যেন বাবুর হাতে দেবার সময় চটের পর্দাঘেরা দেয়াল-এর অপর দিক থেকে হয়ত

বিপ্লবের পথে

কোন বিশ্বাসঘাতক এটা দেখে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিয়েছিল।

সত্যেন মজুমদারকে তক্ষুণি গ্রেপ্তার করে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে আলিপুর জেলে পাঠানো হলো। তাঁর পলায়ন চেষ্টা ব্যর্থ হলেও প্রেসিডেন্সী জেল হতে আমরা চেষ্টা করতে থাকি। বাইরের ফেরারী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। রোজই সাক্ষেতিক লিপির আদানপ্রদান চলছে। সাক্ষেতিক লিপি লিখতে এবং মর্মোদ্ধার করতে অনেক সময় লেগে যেত। নিরাপত্তার খাতিরে তা করতে হ'ত। আমাদের সাক্ষেতিক লিপির প্রয়োগ সহজসাধ্য কিন্তু চাবি জানা না থাকলে মর্মোদ্ধার অত্যন্ত কঠিন। কোন একটি অক্ষরের জন্য একটিমাত্র বিশিষ্ট সাক্ষেতিক সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। যে কোনো অক্ষর যে ভাবে যতবারই ব্যবহৃত হোক প্রতিবারেই নতুন নতুন সাক্ষেতিক সংখ্যা ব্যবহৃত হ'ত। কোন সাক্ষেতিক সংখ্যা একাধিকবার ব্যবহৃত হতো না। এই সাক্ষেতিক ধারার মধ্যে বাহ্যতঃ কোন বিশিষ্ট ধারা বার করা ছরহ। মনে হোত কোন ধারাই যেন নেই। সঙ্কেত লিপির পারদর্শীর পক্ষেও সঙ্কেত উদ্ধার প্রায় অসম্ভব ছিল। সঙ্কেত লিপিতে সংখ্যা হিসাবে শুধু ভগ্নাংশই ব্যবহৃত হ'ত এবং একটি ভগ্নাংশ একবারের বেশী ব্যবহৃত হ'ত না। 'a'র সাক্ষেতিক সংখ্যা $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{8}$, $\frac{7}{50}$, $\frac{9}{100}$ বা অন্য যে কোন ভগ্নাংশ হতে পারে, b, c, d, প্রভৃতি যে কোন অক্ষর সহস্কেও অনুরূপ ব্যবস্থা। কোন অক্ষরের কোন স্থানে একরূপ কোন ভগ্নাংশের প্রয়োগ হবে 'চাবি' বা 'key' জানা

বিপ্লবের গথ

না থাকলে কোন উপায়েই বলা যেত না। সাক্ষেতিক চিঠি লেখা বা বাইরে থেকে প্রাপ্ত সন্ধেত লিপির উদ্ধারের ভার আমার ওপরই ছিল। চিঠি বাইরে পাঠাবার এবং বাইরে থেকে চিঠি এলে তা গ্রহণ করার ব্যবস্থার ভার ছিল ত্রীশচীন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর। অশ্রু ছ'একজন বিশিষ্ট সভ্য শচীনবাবুকে সহায়তা করতেন। শচীন চক্রবর্তী দলের পুরাণো সভ্য। দলের অর্থ ভাণ্ডার বাড়ানোর জন্ত ৮প্রবোধ দাশগুপ্তের সাথে নোট জাল করার সময় তিনি ১৯২৫ সালে ঢাকা জেলার কোন গ্রামে গ্রেপ্তার হন এবং সাত বছরের জন্ত সাজা পান। দণ্ডভোগের শেষের দিকে জেলে তিনি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। দণ্ডকাল শেষ হলে এই ক্ষয়রোগ নিয়েই তিনি বাইরে আসেন অসহায় অবস্থায়। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। সুভাষচন্দ্রের সাহায্য না পেলে তাঁর চিকিৎসাই সম্ভবপর হতো না।

সন্ধেত-লিপি মারফৎ জেল হ'তে পলায়নের পরিকল্পনা বাইরে ফেরারী আড্ডায় জানানো হয়। কাঁকুড়গাছি ফেরারী আড্ডায় তখন পরেশ গুহ, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, সুশীল চক্রবর্তী, সুধীর ভট্টাচার্য, হান্সবালা দেবী, মায়্যা নাগ প্রভৃতি ছিলেন। এবিষয়ে দু'টি পরিকল্পনা তাঁদের কাছে পাঠানো হয়। প্রথমটি ডিনামাইট দিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের প্রাচীরের একটি বিশিষ্ট অংশ উড়িয়ে দেওয়া, ঠিক ঐ সময় ঐ ভাবে ইহা কার্যে পরিণত করতে পারলে পলায়নের সাকল্য সমধিক নিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয়টি—বিশিষ্ট রকমের একটি রসি-সিঁড়ি (Ropeladder)

বিপ্লবের পথে

তৈরী করে মোটরে করে জেলের পার্শ্বে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট রাজিতে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে আসতে হবে। বাইরে বন্ধুদের গাড়ী থেকে সবুজ আলো দেখাবার উত্তরে ভিতর থেকে লাল আলোর সঙ্কেত পেলেই প্রাচীর-সংলগ্ন রাস্তা থেকে প্রাচীরের উপর দিয়ে সিঁড়ি জেলের ভিতর এমন ভাবে ফেলতে হবে, যাতে সিঁড়ির শেষাংশ প্রাচীর থেকে ভিতরের দিকে আট ফুট দূরে অবস্থিত একতলা দালানের ছাদের ওপর পড়ে। হয় শিক্ কেটে নয় গুণতি ফাঁকি দিয়ে পলায়নের উদ্যোগে বন্দী বন্ধুরা সেই নির্দিষ্ট সময়ে একতলার ছাদে উঠে প্রতীক্ষায় থাকবে এবং সেই নিষ্কিণ্ত সিঁড়ির সাহায্যে জেল থেকে পালিয়ে যাবে। বাইরের বন্ধুরা দ্বিতীয় পরিকল্পনাটি অনুমোদন করে আমাদের চিঠি দিলেন। ডিনামাইট ব্যবহার করে পলায়ন অধিকতর সহজসাধ্য হোত—এবং ডিনামাইট আমাদের সংগৃহীত থাকা সত্ত্বেও এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ এই কার্যে বহুলোক হতাহত হবার আশঙ্কা ছিল। কাঁকুড়গাছির ফেরারী বন্ধুরা এ কাজের ভার নিলেন। আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে বাইরে সঙ্কেতবার্তা পাঠান হল। জেলে আসার আগে ক্ষীরোদ দত্ত মেদিনীপুর জেলায় অনুশীলন দলের কর্মক্ষেত্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ছিলেন, তিনি মেদিনীপুর কলেজেই বি, এ, পড়তেন।

এর কিছুদিন আগে একদিন রাজবন্দীদের ব্যারাকগুলিতে খুব কড়া তল্লাসী হয়ে গেল। তল্লাসীর দল শুধু মোটা দড়ির সন্ধানই বিশেষ করে করেছিল। আমাদের ব্যারাকের

বিপ্লবের পথে

ওপরই তল্লাসীর প্রকোপটা হোল বেশী। সে সময়ে প্রেসিডেন্সী জেলে তিনশোর মতন রাজবন্দী ছিলেন। এর মধ্যে দশবারোজন বিভীষণ ছিল বলে আমরা বিশেষভাবে সন্দেহ করতাম, যারা নিয়মিত ভাবে বা সুযোগ মত গোয়েন্দা বিভাগের সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব রেখে ভিতরের গোপন সংবাদ সরবরাহ করতো। বলা বাহুল্য দৃশ্যতঃ এরা কোন না কোন বিপ্লবী দলের সভ্য ছিলো। দলের লোকের সাধারণতঃ কোন বিশেষ সংবাদ তাদের জানাতেন না। দল নির্বিশেষে বন্দীরা তাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। মনে হয় এই সব বিভীষণদের মধ্যে কারুর মনে কোন কারণে সন্দেহ জেগেছিল যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার পালাবার চেষ্টা করবে। কি কবে কোন জায়গা থেকে পালাবার পরিকল্পনা করছি তার বিস্তারিত সংবাদ তাদের জানা ছিল না। সম্ভবতঃ দড়ির সাহায্যে পালাবার চেষ্টার কথা অনুমান করেই গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিয়েছিল। এক সময়ে এই উদ্দেশ্যে কিছু দড়ি ভিতরে আনাও হয়েছিল, পরে যে কোন কারণে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

এগার

নির্দিষ্ট দিনে আমি ও ক্ষীরোদ দত্ত অগ্রাগ্র বন্ধুদের সাহায্যে সন্ধ্যার লক্ষ-আপের সময় সিপাইর দৃষ্টি ও গুণ্টি এড়িয়ে ব্যারাকের বাইরে এসে অতি সাবধানে উপরে উঠে উপর হয়ে শুয়ে রাত্রির প্রতীক্ষায় রইলাম।

আমরা ছাদের উপর শুয়ে সামনের দোতারা ব্যারাকের ছাদের ওপর প্রহরারত বাইফেলধারী শাস্ত্রীদের দেখতে পেলাম। সেখান থেকে তারা জেলপ্রাচীরের সবটাই পর্যবেক্ষণ করছে। প্রেসিডেন্সী জেলের পর্যবেক্ষণ-কেল (Watch tower) তখন রাজবন্দীদের ব্যারাকের ওপরই করা হয়েছিল। আমরা একতলার সেই ছাদের গায়ে লেগে শুয়ে পড়েছিলাম। রাত্রির প্রথমার্শ অন্ধকার থাকায় এবং একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়েছিলাম বলে পর্যবেক্ষণ প্রহরী আমাদের অবস্থান জানতে পারবে না বলে আমাদের বিশ্বাস ছিল। ছাদের ওপর কান রেখে আমরা সতর্ক দৃষ্টিতে শাস্ত্রীর গতিবিধি দেখতে লাগলাম। নীচের সিপাইদের কথাবার্তাও আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। ছাদের ওপর উপর হয়ে বুকে হেঁটে শব্দ গতিতে প্রতি পদক্ষেপে দু'তিন আঙ্গুল করে প্রাচীরের নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এ ভাবে প্রায় দেড়শ ফুট যেতে হবে। এ গতিতে অগ্রসর হলে সেখানে পৌঁছাতে রাত প্রায় এগারোটো

বিপ্লবের গথে

বেজে যাবে। এর মধ্যে আঁধার কেটে জ্যোৎস্নার আলোক দেখা যাবে। আমাদের উদ্দিষ্ট কার্যে ব্যাঘাত হবে। এই অবস্থায় তাড়াহুড়া করে বুকে ভর দিয়ে চলতে গেলেও পর্যবেক্ষণ প্রহরীর দৃষ্টি এড়ান কঠিন হয়ে পড়বে। চলন্ত বস্তুর ওপর তাদের নজর পড়ার আশঙ্কা বেশী থাকবে। কাজেই আমরা বুকে হাঁটার গতিবেগ বাড়াতে পারিনি। যাই হোক, এ ভাবে চলে আমরা অল্পমান ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। সে দিকে বাইরের ফেরারী বন্ধুদের মোটর গাড়ী হতে সবুজ রঙের আলো আকাশের গায় পড়ামাত্র ব্যারাকের বন্ধুরাও লাল আলোর সংকেত ক'রে উভয় পক্ষকেই প্রস্তুতির নির্দেশ দেবে। কিন্তু অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করা সত্ত্বেও আকাশের গায়ে সবুজ আলোর কোন সংকেত আমাদের নজরে পড়ল না। অনেকক্ষণ পরে একবার শুধু সবুজ রঙের এক ঝলক আলো দেখলাম বলে মনে হলো, কিন্তু তারপর আর পুনরাবৃত্তি হল না। উত্তরে লাল আলোর সংকেতও দেখা গেল না। এ ভাবে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় রাত দু'টো পর্যন্ত ছাদের ওপর সেই অবস্থায় পড়ে রইলাম। উপর হয়ে ছাদের ওপর কান রেখে নিশ্চল অবস্থায় একই ভাবে নিঃশব্দে ছুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়েছিলাম। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে শুধু ইসারায় ইংগীতে ভাব বিনিময় হচ্ছিল; রাত দুটোর পর আর প্রতীক্ষা না করে ফিরে যাওয়াই সমীচীন বলে মনে করলাম এবং ক্লান্ত দেহে ফিরে যেতে চেষ্টা করলাম।

বিপ্লবের পথে

যাবার সময় যেভাবে চলেছিলাম ফিরতি পথে কিন্তু সেরকম খীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে বৃকে ভর করে চলা দায় হল। অবসন্ন দেহ যেন আর টেনে বয়ে নেওয়া যাক্ছিল না। মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে দেহটা টেনে টেনে চলতে চেষ্টা করছিলাম। তখন আর যেন শরীরটাকে ছাদের ওপর স্থির রাখতে পারছিলাম না। মাঝে মাঝে একটু আধটু শব্দও হচ্ছিল। তবু এভাবেই ফিরে চললাম। কিছুদূর চলার পরই সামনে পড়ল একতলার ছাদের ওপর দিকে মাঝখানে টিনের একটি বায়ু-নিকাশী (ventilator)। বায়ু-নিকাশীর নীচের জায়গাটুকুতেই শুধু শিক লাগান ছিল, তার নীচে দিয়ে দেহটিকে টেনে নিতে হবে। যাবার পথে অতি সহজেই মাথা গলিয়ে শিকে ভর করে চলে গিয়েছিলাম, কোন কষ্ট হয়নি, ফিরতি পথে দেখা গেল মাথা গলিয়ে শিকের উপর ভর করে হাতের জোরে আর দেহকে টানতে পারছি না, তাই খানিকটা জোর পায়ের উপর পড়ল। ফলে দেহ একটু উচুতে উঠে যাওয়ায় উপরের টিনের গায়ে একটা ধাক্কা লেগে গেল। নিশার নিস্তরতা ভেদ করে প্রচণ্ড শব্দ হোল। নিরাপত্তার খাতিরে আমরা উভয়েই টিনের নীচে সেই অবস্থায়ই চূপ করে রইলাম, শব্দ শুনেই নীচের লণ্ঠনধারী সিপাই 'ক্যা হ্যায়? ক্যা হ্যায়?' বলতে বলতে শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে এল। আরও দু'তিন জন সিপাইও তাকে অনুসরণ করল, ছাদের শাস্ত্রীদের মধ্যেও চাকল্য আসতে পারে মনে হোল। নিশ্চল হয়ে চূপটি করে ভাবছি এই বুঝি বাঁশী বাজে। ইত্যবসরে একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটলো। বায়ু-নিকাশীর নীচে চৌচামেচি শুনে এবং আলোর শোভাযাত্রা

বিপ্লবের গথে

দেখে ভয় পেয়ে মিউমিউ করতে করতে একটি বিড়াল হঠাৎ ছাদ থেকে লাফিয়ে সিপাইদের সামনে পড়ল। শব্দের সঙ্গে বিড়ালের কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করে সিপাইরা তাদের অভ্যাসসুলভ চোস্ত ভাষায় বিড়ালটার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানী গালি দিতে দিতে চলে গেল।

আমরা তখন গম্ভব্যস্থানে পৌছানোর জন্ত আবার বুকে হাঁটা শুরু করলাম। রাত চারটে, সাড়ে চারটের সময় আমাদের গম্ভব্যস্থানে, অর্থাৎ ছাদের এক কোণে ফিরে এলাম। কিন্তু তখনও ছাদ থেকে নামলাম না। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে লক্-আপ, খোলার সময় নীচে নামবো বলে ঠিক করলাম। কারণ ব্যারাকের বন্ধুরা তখন আমাদের সাহায্যার্থে ছুটে আসবে এবং হট্টগোলের ভেতর সিপাইরাও আমাদের আলাদা করে দেখবার সুযোগ পাবে না।

ছাদের কোণে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেই কখন যে আমি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম তা টেরও পেলাম না। আমার অবস্থা বুঝতে পেরে বন্ধুবর ক্ষারোদ দত্ত সজোরে ধাক্কা দিয়ে আমায় জাগিয়ে দিল। ঘুম ভাঙলে আকাশের দিকে চাইতেই বুঝতে পারলাম, নামবার সময় হয়ে গেছে। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আমরা উভয়েই ছাদের কোণের দিক দিয়ে নীচে নেমে পড়লাম। ব্যারাক খুলতে তখন হয়ত দশ পনেরো মিনিট দেরী আছে। এই সময়টুকুতে সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার স্থান আছে পায়খানার সারিগুলি। আমরা দুজনে পাশাপাশি ছুটে পায়খানায় ঢুকে পড়লাম, হিন্দুস্থানী সিপাইর দল ভোরে

বিপ্লবের পথে

ব্যারাক খোলার আগেই পায়খানায় যায়। তারা আমাদের আগেই আশেপাশের পায়খানায় ঢুকে নিত্যকার্য্য সেরে বার হয়ে গেল। ইত্যবসরে ব্যারাক খোলার আওয়াজ কানে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুর দল ছুটে নীচে নেমে এসে আমাদের হুজুমকে ঘিরে দাঁড়াল, তাদের সাথে আমরাও তখনই উপরের ব্যারাকে চলে গেলাম। আমাদের দেহ ক্লান্ত, সর্বাঙ্গে ও ধুতি জামায় শ্যাওলা ও কাদামাটি মেখে আমরা ভূত সেজেছি। মুখের ওপর পুরু দাগ পড়েছে, হাত পা মলিন হয়েছে। এসব চিহ্ন সিপাইদের দৃষ্টি এড়াবার নয়। কিন্তু তাদের নজরে পড়বার আগেই বন্ধুরা আমাদের ঘিবে উপরে নিয়ে চলে গেল। যাক্ ব্যারাকে সোজা স্নানের ঘরে ঢুকে জামা কাপড় ভাল করে ধুয়ে পরিস্কার হয়ে বাব হয়ে এলাম। এমনি করেই সেই নৈশ অভিযানের অবসান হোল। পরিকল্পনা-অমুখ্যায়ী বাইরের ফেরারী বন্ধুরা নির্দিষ্ট রাত্রে ও নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হতে না পারার কারণ সন্ধানের জন্য বাইরে সঙ্কেতলিপি পাঠিলাম। জবাব আর পেলাম না। কাঁকুড়গাছির ফেবারী বাসায় পুলিশের নজর পড়তে শুরু করেছে। ছুঁচর দিনের মধ্যেই তারা সেখানে হানা দিয়ে মায়ী নাগ ও আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সময় খানাতল্লাসীতে মোটর গাড়ী, রসি-সিঁড়ি (Rope ladder) আলোর সঙ্কেত ব্যবস্থাদিসহ কিছু মালমশলা পুলিশের হাতে পড়ে।

পরবর্তী কালে হরিপদ দে গ্রেপ্তার হয়ে যখন জেলে এলো, তখন তার কাছে জানা গেল প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার

বিপ্লবের পথে

যে তারিখ নির্দিষ্ট করা ছিল—সেই তারিখের দু'তিন দিন পূর্বেই জিতেন নাহা ধরা পড়ে। এবং তার পরেই তার পরিচিত পল্টার বাসার ছুইজন ফেরারী কর্মী খগেন ব্যানার্জি ও নরেন সরকার ধৃত হয়। এতে হরিপদ দে প্রভৃতির জিতেন নাহা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে সন্দেহ হয়। সেজষ্ঠ তারা নির্দিষ্ট দিনের আগের দিন জেল প্রহরার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যায়। স্পষ্টই তাদের মনে হয়েছে সরকার পূর্বাপেক্ষা অধিক প্রহরীর ব্যবস্থা করেছে এবং সশস্ত্র প্রহরীও মোতায়ন করেছে। এই পরিকল্পনা ত্যাগ করাব জন্ত তারা একদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কাছে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। কিছুদিন হল জিতেন নাহা ধরা পড়ে প্রেসিডেন্সী জেলে এসে আমাদের সঙ্গে বাস করেছে। দলের সভ্য হলেও এর তেমন কোন বৈপ্লবিক পরিচিতি ছিল না। প্রেসিডেন্সী জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থার কিছুটা দারিদ্ৰ বাইরের বন্ধুরা জিতেন নাহার উপরই দিয়েছিল। বাইরের উদ্যোগ-পর্বের প্রধান অংশের ভারই ছিল হরিপদ দে'র উপর। জেলের ভেতরে এসেই জিতেন নাহা জানায় যে, হরিপদ দে, পরেশ গুহ, নিরঞ্জন ঘোষাল প্রভৃতির সঙ্গে তার বিপ্লবী কার্য-কলাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রেসিডেন্সী জেলের কোন্ স্থান হতে কি ভাবে পালাবার পরিকল্পনা হয়েছে,—সে বিষয়ে জিতেন আমায় প্রশ্ন করতে থাকে। অধিকাংশ বিষয়েই আমি মৌনাবলম্বন করে থাকি। সে নির্দিষ্ট স্থান সম্বন্ধে জানতে চাইলে আমাদের ব্যারাক থেকে বহুদূরে এমন একটি স্থানের কথা বলি, যা কার্যে

বিপ্লবের গথ

পরিণত করা আদৌ সম্ভবপর নয়। তাতে সে সংশয় দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বিষয়াস্তুরে আলাপ শুরু করে দেয়। ফেরারী আসামী হলেও গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই জিতেন নাহাকে সরাসরি ব্যারাকে রাজবন্দীদের সঙ্গেই রাখা হয়। এই কারণে আমাদের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে যে, এতে হয়তো পুলিশের কোন গোপন হস্ত রয়েছে। সাধারণতঃ কোন ফেরারী বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে জেলে এলে তাকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অন্তদের সম্পর্ক থেকে আলাদা করে দূরে সরিয়ে রাখা হতো—তার উপর কোন মামলা দায়ের করা যায় কিনা তারই অপেক্ষায়। বিশেষতঃ যে সময়ে আন্তঃপ্রাদেশিক বড়যন্ত্র মামলা পাকাবার জন্য গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিল সে সময়েই জিতেন নাহাকে সরাসরি রাজবন্দীদের ব্যারাকে এক সঙ্গে রাখা তাৎপর্যপূর্ণ।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দলীয় বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। আমাদের সঙ্কেত লিপির আদান প্রদানও চলত। ইঠাৎ কখনো কর্তৃপক্ষের হাতে পড়লেও যাতে সন্দেহের উদ্বেক না হয়, অথবা সন্দেহের অবকাশ কমই থাকে এবং সঙ্কেত উদ্ধার কঠিনতর হয় সেই জন্য মাঝে মাঝে সঙ্কেত-লিপি লিখে দিতাম অদৃশ্য কালিতে। বন্ধুরা অদৃশ্য কালিতে লেখা পাঠোদ্ধারের সঙ্কেত জানতেন। জিতেন নাহার গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক বড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন আসামী প্রভাত চক্রবর্তীর একখানা সঙ্কেতলিপি আমাদের নিকট পৌঁছলে আমরা জানতে পারি যে,

বিপ্লবের পথে

জিতেন নাহার পক্ষে ঐ ষড়যন্ত্র মামলার দ্বিতীয় রাজসাক্ষী হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং দলেব ভিতরকার খবর সংগ্রহ করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গোয়েন্দা বিভাগ তাকে প্রেসিডেন্সী জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে একত্রে রেখেছে। তাব সম্বন্ধে উপযুক্ত “ব্যবস্থা” করার বিষয়, লিপিতে লেখা ছিল। চিঠিখানা মাদারীপুরের অক্সাম্পদ বন্ধু যুগান্তর দলেব শ্রী সন্তোষ দত্তের মারফত পেয়েছিলাম। অদৃশ্য কালিতে লেখা আরও একখানা চিঠি চট্টগ্রামের শ্রীনগেন সেন (জুলুসেন নামেই তিনি রাজনৈতিক বন্ধুদের নিকট পরিচিত ছিলেন) এর মারফত এসে পৌঁছাল।

প্রেসিডেন্সী জেল থেকে তখন আন কাবো পক্ষেই পালানো সম্ভব নয় কারণ সেখান থেকে আমাদের দেউলী বন্দা নিবাসে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। দেউলীতে পাঁচশো বন্দীকে রাখবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এবং শ’ খানেক বন্দীকে সেখানে পাঠানোও হয়েছে।

বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে দেশীয় রাজ্য মণ্ডলীর অন্তর্গত চীফ-কমিশনার শাসিত প্রদেশ রাজস্থানের থর মরুভূমি পার হয়ে রাজপুতানার এক প্রান্তে, আজমীর হয়ে দেউলী বন্দীনিবাস যেতে হয়। দেউলী ছিলো, পূর্বে ব্রিটিশ সেনা নিবাসের একটি অগ্ন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

বাংলাদেশ বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় ও পরিবেশে সরগরম। বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ থেকেই বাংলা দেশ ইংরেজের সঙ্গে নানা-ভাবে সংগ্রামে লিপ্ত। বঙ্গভঙ্গ ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিটি ধাপের সহিত

বিপ্লবের পথে

বাংলা সুপরিচিত। যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও বিপ্লব আন্দোলন বাংলার মত দানা বেঁধে উঠতে পারেনি।

মাঝে মাঝে আন্দোলনের ঝড় বয়ে গেলেও রাজস্থানের মরুভূমিতে বিপ্লব আন্দোলনের স্রোত তখনও পৌঁছাতে পারেনি। ছ'চারটি যুবক বিপ্লবে পথে পা বাড়ালেও সেখানে এমন পরিবেশ গড়ে ওঠেনি যার ফলে সে অঞ্চলে কোথাও কোন বন্দীনিবাস স্থাপন করলে রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কোনও পরিবর্তন ঘটতে পারেন। বঙ্গোপসাগর মধ্যবর্তী দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের জন্ম যেমন আন্দামান বন্দীশালা বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী হয়েছিল, তেমন একই উদ্দেশ্যে দেউলী বন্দীনিবাসও তৈরী হলো। বক্সা হিজলী ও বহুবমপুর বন্দানবাসগুলি বাংলার অভ্যন্তরে—বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশের মতো এবং সেখান থেকে বিপ্লবীরা গোপন পথে সংগঠনের সঙ্গে যোগ সূত্র বেখে বৈপ্লবিক কাজ করতে সমর্থ বলে শাসক বর্গ মনে করতো—তাই বিপ্লব আন্দোলনকে রাজবন্দীদের সহযোগিতা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করার জন্মই শাসকবর্গের এই প্রয়াস।

বার

দেউলী যাত্রীদের অর্ডার এসে গেছে। সন্ধ্যার সময় সাবেকী আমলের অনুকূল দা (অনুকূল মুখার্জি) অর্ডার পত্রখানা উন্টিয়ে ধরে রহস্য করে আন্ডায় বললেন, “দেখো, আন্ডি দেউলী যাব কিনা সে বিষয়ে কতৃপক্ষ মতামত জিঙ্ক্স করেছে। অনুকূল মুখার্জির মত না হলে তাকে পাঠায় কার সাধ্য?” “অনুকূলদার অভিমত না নিয়ে তো আমাদেবও পাঠাতে পারবে না” পান্টা পরিহাস ছলে তাঁকে এ জবাব দেই। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাবতে লাগলাম—দেউলীর পথে পালাবার কোন পরিকল্পনা ঠিক করা যায় কিনা। আমরা থাকব রিজার্ভ গাড়ীতে, সশস্ত্র শাস্ত্রী-পরিবেষ্টিত। মধ্যবর্তী কোন ষ্টেশনে নামা-ওঠাও চলবে না। একমাত্র গাড়ী বদল হবে আগ্রায়। আগ্রা বাংলা থেকে বহুদূরে। এরূপ যখন অবস্থা—তখন পালাবার কোনো সার্থক পরিকল্পনা করতে হলে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সাথে লড়বার সামর্থ্য নিজেই করতে হয়। আমরা তখন বেপরোয়া, বাইরে গিয়ে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আঘাত হানবার জন্য পাগল। অবস্থা যতই বিপদজনক হোক না কেন, তার সম্মুখীন হতে সব সময়ই প্রস্তুত। বাইরে ফেরারী বন্ধুদের

বিপ্লবের পাথ

কাছে এক পরিকল্পনা পাঠালাম। তাদের অনুমোদন ও সমর্থন পেলে পথে ঝগুঝু কবে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করব।

আমরা এইভাবে পালাবাব পদবিপ্লব তৈরী করে বন্ধুদের জানিয়ে দিলাম। রাত্রিতে পথের মাঝে শিকল টেনে গাড়ী থামিয়ে আমরা লাফিয়ে বাইরে পড়ব। তাবপর রক্ষী পুলিশ-দলকে অত্যন্ত আক্রমণে অভিভূত ও পঙ্গু করে ধুম্রজালের আড়ালে অপেক্ষমান মোটরে সরে পড়ব। একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবশ্যকমত অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি সহ মোটর গাড়ী নিয়ে বন্ধুরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই উপস্থিত থাকবে। বাইরের আলোর নিশানার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী থেকেও অনুরূপ আলে দেখানো হবে। এভাবে আলোর সংকেতের মাধ্যমে উভয় পক্ষের প্রস্তুতি পরস্পরকে জানানাব ব্যবস্থা ছিল। যাত্রার দিন পূর্বাহ্নেই জেল থেকে বাইরের বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। হাওড়া ষ্টেশনে সেই একই গাড়ীতে ভিন্ন কামরায় অনুসরণকারী সহায়ক বন্ধুদের যাবার জ্ঞও পিখে জানিয়েছিলাম।

বাইরের বন্ধুদের কাছে পালাবার পরিকল্পনা পাঠাবার কিছুদিন পরেই দেউলী যাত্রার নির্দেশ এলো। ইতিমধ্যে জনৈক বন্ধুর মাধ্যমে সংবাদ পেলাম যে, কলকাতার গোয়েন্দা পুলিশ একটি ফেরারী বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করার জন্য কলকাতার এক বাসায় ছই এক দিনের মধ্যেই হানা দেবে। ফেরারী বিপ্লবীর নাম ও বাসার ঠিকানাসহ খবরটি জরুরী সংকেতলিপির মাধ্যমে অবিলম্বে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। তিন দিন পর ফেরারী বন্ধু অমল্য সেন উক্ত ঠিকানায় এই সংকেতলিপিসহ ধরা পড়ে।

বিপ্লবের পথে

কাবণ সংকেতলিপি উদ্ধারকারী কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তার তখন পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নি। সংকেত উদ্ধারকারীরা হয় ধরা পড়েছে, নয় অন্যত্র চলে গেছে।

দেউলী যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হলাম। চট্টগ্রামের ত্রীপ্রতাপ রক্ষিত এতকাল দলের গোপন বিষয়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সংকেতলিপির সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। যাবার সময়ে আমার সঙ্গে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা আপত্তিকর চিঠিপত্র যাতে না থাকে, সেজন্য আমার ট্রান্স ও স্মটকেশ তল্লাসী করে দেখার ভার তিনি নিজেই নিলেন। কিছুদিন আগেই একখানা গুরুত্বপূর্ণ সংকেতলিপি বাইরে পাঠাবার সময় ধরা পড়ে যায়। চিঠিখানা নানা খবরে ভর্তি ছিল। স্মৃতির বিষয় এই যে, গোয়েন্দাবিভাগ সংকেতলিপির পাঠোদ্ধার করতে পারে নি। অনেক সময় সংকেতলিপি লেখা হয়ে গেলেও স্মৃতির অভাবে বাইরে পাঠানো সম্ভব হোত না। নিরাপত্তার জন্ম স্মটকেশ বা বাস্তব মধ্যে এমন সংগোপনে রাখতে হত যে, কয়েকদিন পরে নিজেরাই খুঁজে পেতাম না, অথবা সে কথা মনে থাকতো না। এভাবে ছ'এক খানা আপত্তিকর লিপি বাস্তব তলায় বা কোনে পড়ে থাকা অসম্ভব নয়। এরকম অঘটন অনেকের কপালেই ঘটেছে, তাই এই সতর্কতা।

দেউলী যাত্রার দিন হাওড়া ষ্টেশনে এসে উৎসুক দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক দেখতে লাগলাম—নির্দিষ্ট চিহ্ন ও লক্ষণযুক্ত কাউকে দেখা যায় কিনা। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মূহর্ত পর্য্যন্ত কাউকে দেখতে পেলাম না। বাংলার এলাকার প্রতিটি

বিপ্লবের পথে

ষ্টেশনে সজাগ দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও আশাজনক কিছু নজরে পড়ল না। বাংলার বাইরে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে আশার আলো একেবারেই নিভে গেল। অনুসন্ধানী দৃষ্টির আব কোন কারণ বা অর্থই রহিল না। আগ্রায় গাড়ী বদল করতে হল। শেষ ষ্টেশনে নেমে মরুপথে শুদৌর্ঘ আশি মাইল মোটবে যেতে হল, পথে একটি ছোট্ট পাহাড়ী নদী। চাবিদিকে দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল মরু-প্রান্তর! তারি মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই পথ। মাঝে মাঝে মরুতান ও প্রাচীর-ঘেরা ছোট ছোট পল্লী, আর তার চারপাশে সামান্য চাষের জমিতে চাষবাস হচ্ছে দেখা যায়। আবার সেই সীমাহীন মরুভূমি। মরুপথের ছধারে মাঝে মাঝে ভেড়ার পাল স্বচ্ছন্দে চড়ে বেড়াচ্ছে,—সঙ্গে ছ'চার জন মেষপালও আছে। ঐ মরুপথের মাঝে মাঝে কলকাতার শ্রেষ্ঠীদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে,—জনগণের রক্তশোষক মালিকদের ভূয়া জমক ও দেমাকের প্রাণহীন উদ্ধত পরিচয়স্বরূপ। কলকাতা ও ভারতের দনিক কুলোত্তম শ্রেষ্ঠীদের পিতৃভূমি এই রাজস্থান। কিন্তু এদের দৌলতে এতটুকু লাভবান হয়ে ওঠেনি এই মরুরাজ্য। স্কুল, কলেজ, রুগ্ন-সদন, পল্লী-সমবায় সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এবং আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, পশু-সদন ইত্যাদি নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে মরুভূমির বুকে প্রাণ সঞ্চার করে দেবার, তাকে শস্য-সম্পদে সমৃদ্ধ করে তোলাবার কোনো প্রচেষ্টারই পরিচয় চোখে পড়েনি; মাড়োয়ারী ধনী বণিক তার শোষণলব্ধ অর্থের ভগ্নাংশ বিশেষ ছ'চারটে মন্দির, ধর্মশালা খুলে ধর্মের ঘরে ঝাঁকি দিয়ে ইহলোকে দৈহিক সুখ-বিলাস ও পবলোকে

বিপ্লবের পথে

স্বর্গবাসের সহজ ব্যবস্থা করে রেখেছে মাত্র, এবং একেই মনে করেছে যথেষ্ট।

প্রেসিডেন্সী জেল ছাড়ার দু'দিন পর বিকাল চারটার সময় দেউলী শিবিরে এসে পৌঁছোলাম। শিবিরে ঢুকতেই সুক হল তল্লাসীর পালা—একদিকে ডাক্তারবন তল্লাসী চলছে, দুইজন বিশিষ্ট ডাক্তার—কেউই এম-বি, বি এস-এব নীচে নয়, পরীক্ষা করছেন বন্দীদের উলঙ্গ কবে। উলঙ্গ করে পরীক্ষা কবাব অধিকার নাকি একমাত্র এম্ বি, বি-এস ডিগ্গধারী ডাক্তার-দেরই আছে। লজ্জা সংকোচের বালাই তাঁদের নেই। অতীতকালে বাঙ্গা বিজ্ঞান প্রভৃতি জোর তল্লাসী শুরু কবে দিয়েছে কমাগান্ট বা শিবিরাদ্যক্ষ মিঃ ফিনি।—এই আমাদের পূর্ব পরিচিত বঙ্গা শিবিরের প্রথম অধ্যক্ষ। সরকারের কাছে এর যথেষ্ট কদর। তাই দেউলী শিবির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ফিনি সাহেবকে অধ্যক্ষ করে সেখানে পাঠানো হয়েছে। সে নজেই আমার বাঙ্গা তল্লাসী শুরু করলো। শুরু করেই একটুকরো লেখা কাগজ খুঁজে পেয়ে পড়তে শুরু করে দিল। ছোটো চোগ তার হিঙ্গ্র আগ্রহে চক্চক করছে। চোখে তখন আমার চশমা ছিলনা, তবুও বেশ বুঝতে পারলাম, টুকরো কাগজটুকুতে ছিল সংকেতলিপিতে রূপান্তরিত করার পূর্বে সরল ইংরাজীতে লেখা দলের সংবাদের খসড়া; কি করে যে এই চিরকূট বাঙ্গা রয়ে গেল এবং কি করেই যে বাঙ্গা খোলাব সঙ্গে সঙ্গেই সেটা পাওয়া গেল তা বুঝতেই পারলাম না। তবে সম্ভবতঃ কোন সময়ে কোন বিশেষ সংবাদ

বিপ্লবের পথে

বাইরে পাঠাবার জরুরী তাগিদে তাড়াছড়া কবে খসড়া রচনা ও সংকেতলিপি শেষ করে তখনই বাইরে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে যাওয়ায় চিরকুটটি নষ্ট করা হয়ত সম্ভবপর হয় নি। তাই নিরাপত্তার খাতিরে ও যাতে সহজে কারো চোখে পড়তে না পারে একপ সংগোপনে বাস্তবের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল—পরে নষ্ট কবে ফেলে দেওয়া হবে বলে। নানা ঝঞ্জাটে ও ঝামেলায় পড়ে আর নষ্ট করার কথা মনেই ছিল না। এমনি করেই হয়তো কোন কানাচে বা কোনও কিছুর ফাঁকে বা ভাঁজে পড়ে ছিল। খলা বাজল্য এ জাতীয় আপত্তিকর কাগজপত্র সাধারণতঃ টুকরো টুকরো করে যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া নিরাপদ নয়, একেবারে নিশ্চিহ্ন করেই ফেলে দিতে হয়, যাতে পরে কখনও কোনও সন্দানী চক্ষুর গোচরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে। কারণ টুকরো টুকরো কাগজ জোড়া দিয়ে এমনকি পোড়া কাগজ থেকেও লিপি-বিশারদরা অনেক ক্ষেত্রে লিপির মর্ম উদ্ধার করেছে। যাই হোক, ফিনি সাহেবের হাতে আপত্তিকর কাগজের টুকরো দেখামাত্র তার হাত থেকে চিঠিখানা ফস্ করে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতেই চতুর ফিনি সাহেব মুচ্‌কী হেসে নিঃশব্দে চিঠিখানা নিয়ে দ্রুত অফিস ঘরে চলে গেলেন। তিনি সম্ভবতঃ পরবর্তী ডাকেই কলকাতার সদর গোয়েন্দা অফিসে কাগজটুকু পাঠিয়ে দিলেন।

দেউলী পৌছোবাব পরদিনই আমার পেটে ভীষণ যন্ত্রণা আরম্ভ হয়, ডাক্তারেরা সেটাকে এপেন্ডিসাইটস্ বলে সিদ্ধান্ত

বিপ্লবের গাথে

করেন এবং অবিলম্বে অপাবেশনের প্রয়োজন মনে কবায় সেইদিনই আমাকে মোটবে কবে আজমীড় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। হাসপাতালে পৌঁছানমাত্র অপাবেশন কবা হয়। পবেব দিন বোগ শয্যায় শুয়ে, তখনো ভাল কবে জ্ঞান হয়নি এ অবস্থায় শ্রদ্ধেয় জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশযেব মৃত্যু। সংবাদ পেলাম। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হ'তে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হাসপাতালেব এক সহদয় হিন্দুস্থানী ডাক্তার সংবাদটি গোপনে জানিয়ে গেলেন।

বাংলাব ও ভাবতেব এক বিশিষ্ট জননেতা চলে গেলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও সংগ্রামেব সঙ্গে সেনগুপ্তেব নাম অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ছিল। তার অভাব যেন সমগ্র সম্ভাব মধো অহু ভব কবলাম। অস্ত্রোপচাবেব বেদনা মর্মেব বেদনায় কপাণ্ডবিত হলো।

ভাবতেব জাতীয় আন্দোলন সেনগুপ্তেব কাছে বহু বিষয়ে ঋণী। ১৯২১ সালে সত্যগ্রহ আন্দোলনেব যুগে দেশবন্ধু চিত্তবজ্ঞনেব সুযোগ, সহকাৰী হিসাবেও আসান বেঙ্গল বেলঙয়েতে দীর্ঘ ধর্মঘট চালিয়ে বেল চলাচল ব্যাহত করে দিয়ে যোগা নেতৃত্বেব পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশবন্ধুেব মৃত্যুর পর বাংলাব ব্রি-নেতৃত্ব, বাংলা কংগ্রেসেব সভাপতি, কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলেব নেতা এবং কলকাতা করপোরেশনেব মেয়বেব দায়িত্ব ভাব তাঁব উপব পড়ে এবং যোগ্যতাব সঙ্গে তিনি সে সব ভার বহুদিন বহন কবেন। বাংলাব বিপ্লবী সংগঠনও তার কাছে অনেক বিষয় ঋণী ছিলো। কৌশলী হিসাবে চট্টগ্রাম বেলঙয়ে ডাকাতি ও চট্টগ্রামেব গোয়েন্দা অফিসার প্রফুল্ল রায়কে হত্যাব দায়ে অভিযুক্ত বিপ্লবী আসামীদেব

বিপ্লবের পথে

পক্ষ সাহসেব সশ্রুত সমর্থন কবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন কবেছিলেন।

১৯৩০ সালের পর থেকে বিপ্লবী আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে দেখে তদানীন্তন বাংলার গবর্নর ষ্টানলি জ্যাকসন বিপ্লবী আন্দোলনকে শাখ কববার উদ্দেশ্য নিয়ে জে, এম, সেনগুপ্তেব মাধ্যমে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়াব চেষ্টা কবেছিলেন। সেনগুপ্ত হঠাৎ গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানেব জ্ঞাত লঙনে চলে যাওয়াতে তাহাব পরিসমাপ্ত ঘটে। লৌহ কঠিন I.C.S. বর্গ সেনগুপ্তেব অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাংলার গভর্নরকে বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে আপোষ আলোচনা চালাতে বাবা দেব। বঙ্গো-ভূর্গ বন্দীনিবাসেব কমাণ্ডাট কটামেব মামলা চলবাব সময় জলপাইগুড়ি জেলে সেনগুপ্তেব সাথে আমাদের দেখা সে কথা আগেই বলেছি। আমাদের সাথে তাঁব মেলামেশা নিষিদ্ধ হ'লও গোপনে এত্রিত হ'বে একসঙ্গে বসে গাম খেলা এবং নানাবিধ রাজনৈতিক আলোচনা চলত। সহজ বসালাপও হ'তো প্রায়ই। মি.সস সেনগুপ্তা একদিন জেলে দেখা কবতে এসে জানালেন এ বেনারস হতে জ্যোতিষ নাকি ভৃগু গণনা করে তাঁকে জানিয়েছে যে সেনগুপ্তেব পঞ্চাশ বৎসব বয়সে জীবনেব আশঙ্কা আছে। একথা শুনে তিনি উচ্চ হাস্য স বরণ কবতে পাবেন নি।

বিশ্বকবি ববীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তেব মৃত্যুতে বলেছিলেন—
অদেধেব মঙ্গলেব তত্ত্ব যে সব সাক্ষী যোদ্ধা স গ্রাম কবে গেছেন
বাবীন্দ্রমোহন তাঁদেব অগুতম। মাতৃভূমি'ব মঙ্গলেব জ্ঞাত কোনও

বিপ্লবের গথে

প্রকার ত্যাগ স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। অপরিসীম দুঃখের জীবনই তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন। আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজনীন যতীন্দ্রমোহন সমগ্র ভারতের একজন রাষ্ট্রনৈতিক নেতা...যে জীবন মহৎভাবে উদ্‌যাপিত এবং অকুণ্ঠ-চিত্তে উৎসর্গীকৃত তার স্মৃতি গৌরবের ও বেদনার।

অস্ত্রোপচারের ঘা সারতে একুশ দিন লাগল। ক্যাম্পের কমাণ্ডাণ্ট ফিনি সাহেব নিজে এসে আমার ক্যাম্পে ফিরতে আর ক'দিন লাগতে পারে জানতে চাইলেন। বুঝতে দেবী হল না চতুর ইংরাজ অফিসার কোনও অভিপ্রায় নিয়ে নিশ্চয়ই এসেছেন এবং অতি শীঘ্রই তা বাস্তবে রূপায়িত হবে। দেউলী ক্যাম্পে অচিরে ফিবে ষাবার ব্যবস্থা করে ফিনি সাহেব চলে গেলেন।

হাসপাতালে থাকার সময় রক্ষী-সিপাহীরা হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও বিভিন্ন রোগী মহলে বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবী বলে আমার পরিচয় জানিয়েছিল। তাই যাবার সময়ে সাধারণ রোগীরা বাংলার পিস্তলধারী বিপ্লবীকে দেখার জন্য সারি বেঁধে দাঁড়ালো। মহিলারা আমায় তাদের নিজের ভাষায় আশীর্বাদ করলেন—জানালেন অন্তরের গুণ্ডেছা।

ভের

দেউলী বন্দীনিবাসে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সরকারের নির্দেশনামা পেলাম—আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটকের নির্দেশ। ইতিমধ্যে কলকাতায় আলিপুরের বিশেষ আদালতে আন্তঃপ্রাদেশিক যড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে। মামলায় প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, পরেশ গুহ, প্রভাত মিত্র, ভোলানাথ দাস, সত্যেন মজুমদার, অজিত বসু, প্রভৃতি অনেকেই আসামী হয়ে এসেছেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যড়যন্ত্র ছিল মামলার মূল অভিযোগ। আর তারই আত্মসজ্জিক হিসাবে ছিল,—উক্ত যড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্রাদি সংগ্রহ, বিক্ষোভক দ্রব্যাদি প্রস্তুতি ও যোগাড়, হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা প্রভৃতি। সরকার পক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর জীনগেন ব্যানার্জি উক্ত যড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংশ্লেষের এবং দেউলী বন্দী নিবাসে আমার স্টুকেসে পাওয়া চিরকুটের কথা তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাতে উল্লেখ করলে ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত আমাকে আসামীভুক্ত করে আদালতে উপস্থিতির দাবী করে। যড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে আমার নামোল্লেখ করলেও, জেলের বাইরে যড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লেষের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায় পাবলিক প্রসিকিউটর আমাকে

বিপ্লবের পথে

আসামী শ্রেণীভুক্ত করার কোনও প্রার্থনা জানাননি। ট্রাইব্যুনাল কিন্তু নাছোড়বান্দা। তাঁরা সুস্পষ্ট অভিমত দিলেন, আমাকে ষড়যন্ত্রের একজন প্রধান নায়ক বলে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে—ক্যাম্প অথবা জেল হতে এই ষড়যন্ত্র পরিচালনা করার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

দেউলী হতে আলিপুর জেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারার্থে প্রতিষ্ঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের সামনে আমায় হাজির করা হোল। একদিকে সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার নগেন বানার্জি ও তার সাক্ষপাৎ বি, সি, নাগ ও গুনেন্দ্র সেন প্রভৃতি। অন্যদিকে আসামীদের পক্ষে ব্যারিষ্টার শ্রী জে, সি, গুপ্ত ও তাঁর সহকারীরূপে শেখর বোস, (এখন স্বর্গত) এ্যাডভোকেট সুকুমার দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী মামলা পরিচালনা করতে লাগলেন। আমাদের পক্ষে মামলা চালানো অতি কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। ব্যারিষ্টার জে. সি, গুপ্ত নামমাত্র দক্ষিণাতেই তার সহকর্মীদের সাথে মামলা পরিচালনা করতে রাজী হলেন। শেষের দিকে এই নামমাত্র দক্ষিণাও তাঁদের দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কলকাতা হাইকোর্টের অথবা আলিপুর জজ কোর্টের কোনও উকীল বা ব্যারিষ্টারকে এত কম দক্ষিণায় দীর্ঘকাল স্বদেশী মামলা পরিচালনায় পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার এবং কংগ্রেস নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও হাইকোর্টের উকিল হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়রা চেয়েছিলেন দৈনিক তিনশো হতে দুশো টাকা পর্য্যন্ত, যা আমাদের পক্ষে সে সময় সাধ্যাতীত ছিল। মেদিনীপুরের

বিপ্লবের পথে

খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা ও উকীল মন্থ দাস মহাশয় বিপ্লবী দলকে পরামর্শ ও সাহায্য দানের সন্দেহে মেদিনীপুর হতে বহিস্কৃত হয়ে কলকাতায় ওকালতি করতে বাধ্য হয়েছিলেন—মাঝে মাঝে আমরা তাঁর সাহায্যও অতি সামান্য দক্ষিণায় পেয়েছি—সে সাহায্যের মূল্যও কম ছিলনা।

বঙ্কুর প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরারী আড্ডায় প্রাপ্ত সংকেত লিপিতে লেখা তালিকায় পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ ও বর্মার ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল। বর্মা তখন ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ মাত্র ছিল। সংকেতলিপি উদ্ধারের ফলে এই সব প্রদেশ থেকে দলের বহু সভ্য ধৃত হয়। বর্মা থেকে ডাঃ বিনয় সেন, সঞ্জীব মুখার্জী, পাঞ্জাব থেকে ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে, যুক্তপ্রদেশ থেকে শ্যামবিহারী শুক্লা, লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা (এরফে পণ্ডিতজী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এরা ছিল বিভিন্ন প্রদেশের পার্টি সংগঠক। পার্টির দরদী ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করানো হয়। সংকেত লিপিতে লেখা নামের তালিকায় পুলিশ বিভিন্ন স্থানের বিপ্লবীদের আড্ডার সন্ধান পায় এবং তৎপরতার সঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লাসী চালাবার ফলে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি হস্তগত কবে। রাজসাক্ষী হ্রদিকেশ গুপ্ত (বরিশাল), জিতেন নাহা (ঢাকা) প্রভৃতির সাক্ষ্য শেষ হলে বহু দলিল পত্র পেশ করা হয়। তারপর চলে বিভিন্ন প্রকার সাক্ষীর বহর। সাক্ষীর সংখ্যাও ছিল দু'শোর উপর। কখনো

বিপ্লবের পথে

পুলিশ, কখনো ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ, কখনো বিস্ফোরক-অভিজ্ঞ, কখনো বা আগ্নেয়াস্ত্র অভিজ্ঞ, সঙ্কেত লিপি অভিজ্ঞ বিশ্বাসঘাতক পার্টিসভা, সাধাবণ সাক্ষী, দেশ বিদেশের নানা ভাষাভাষী সাক্ষী, এমনি রকমারী সাক্ষীর এক বিপুল সমাবেশ হয়। আসামীদের কারো কারো ক্রন্দনরতা জননী ভগিনীদেবও সাক্ষীর কাঠগড়ায় খাড়া করা করা হয়। বাংলা ও অন্ধ্র প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত বোমা, পিস্তল, বোমার খোল, বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদির সমাবেশে ট্রাইব্যুনালটি একটি ছোটখাট প্রদর্শনীর আকাব ধারণ কবে।

মামলা চলবার সময় আমরা সবাই কাঠগড়াব মধ্যে একত্রে মিলবার সুযোগ পেতাম। সে সুযোগ জেলের আবদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যে ছিল না। সেখানে আমাদের দুই তিন ভাগে ভাগ করে রাখতো। কর্তৃপক্ষ ভাগ করতো তাদের খুসামত, আমাদের পছন্দমত নয়। যে-সব বিশিষ্ট বন্ধুদেব সাথে পরামর্শ দরকার, কর্তৃপক্ষের এই ব্লক বিলি ব্যবস্থায় তা ব্যাহত হোত। তাই কোর্টের কাঠগড়াই ছিল আলোচনা চালাবার ও পরামর্শ করার বিশিষ্ট স্থান। সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও বিভিন্ন প্রমাণাদির বিবরণ গুনবার সাথে সাথে আমরা রাজনৈতিক অবস্থা ও পার্টির কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতাম। বিপ্লবী সংগঠনকে যাতে আরও শক্তিশালী এবং দৃঢ় করে তোলা যায় তার জন্য বাইরে পালাবার পরিকল্পনা নিয়ে গোপন আলোচনা ছিল প্রধান বিষয়-বস্তু। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে

বিপ্লবের পাত

মুক্ত করবো—এই ছিলো আমাদের একমাত্র ধ্যান। আলিপুর জেল থেকে পালাবার দুর্লভ পরিকল্পনা তাই আমরা অতি সহজেই গ্রহণ কবেছিলাম—দুর্লভ বাধা বিঘ্ন আমাদের কাছে আর দুর্লভ বলে মোটেই মনে হয়নি।

পালাবার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবার পর শেষ পর্যন্ত আমরা একটি পরিকল্পনা বেছে নিলাম।

বিশেষ আদালতের বিচার দিনের মত শেষ হলেই আমাদের ছ'খানা কয়েদী গাড়ীতে (কয়েদী গাড়ীগুলো 'ব্ল্যাক মেরিয়া' নামে ইংরাজীতে পরিচিত) বোঝাই করে জেল ফটকে পৌঁছে দিত। সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী আগে ও পিছনে চলত। আমরা বন্ধ গাড়ীর ভিতর থেকে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করে দেশবাসীকে জানাতুম মাতৃভূমির প্রতি আমাদের আবেদন। সশস্ত্র গাড়ী ছ'খানা আমাদের জেল ফটকের সামনে অবতরণ লক্ষ্য করতো এবং আমরা জেল ফটকের অভ্যন্তরে পৌঁছলেই তারা জেল কর্তৃপক্ষ হতে আমাদের নিরাপদে ও হিসাবমত পাবার ছাড়পত্র নিয়ে গাড়ী বুরিয়া চলে যেতো তাদের ব্যারাকে।

সশস্ত্র রক্ষাদল আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলে বড় গেটের অভ্যন্তরে আমাদের ৩৪।৩৫ জনকে চার পাঁচজন সার্জেন্ট ও সিপাহী মিলে নাম লিখত ও তল্লাসী করতো। তারপর জেলে ঢুকবার ভিতরকার গেট খুলে সিপাহীদের সাথে ভিতর পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতো।

এই সুযোগে আমরা বড় গেটের সিপাহীদের কাছ থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে জেলের বাইরে যাবার প্রচেষ্টা করলে

বিপ্লবের গথ

হয়তো সফলকাম হতে পারি যদি গেটের বাইরের সশস্ত্র সিপাহীদের আমরা সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারি। বাইরের সংগঠনের সাহায্য ভিন্ন তা সম্ভব নয় এবং তাদের লিখে জানতে চাইলাম যে তারা বাইরে থেকে পালাবার সময়ে আচ্ছাদক গুলি বর্ষণ দ্বারা সাহায্য করতে পারবে কিনা। বাইরের গেট প্রহরায় মোতায়েন রাইফেলধারী সিপাহীদের কোনও ভাবে পঙ্কু না করতে পারলে এই প্ল্যান কার্যকরী হওয়া সম্ভব নয়। বহুদিন অপেক্ষা করেও শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়ায় আমরা এই প্ল্যান পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

ইতিমধ্যে নূতন এক পরিকল্পনা মাথায় এসে গেলো। আমরা যেন পথ খুঁজে পেলাম।

জেল বা ব্যারাকের গরাদ কেটে পালান নয়, তাতে মাত্র দু'এক জনের পালাবার ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু এতে ছিলো তখন অন্ততঃ ছয় সাত জনের যাবার সম্ভাবনা।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একাংশ কালীঘাট গঙ্গার দিকে পার ঘেঁসে রয়েছে। এদিকে জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে সাজা দেবার ডিগ্রীগুলি (১৩১৪ নং ডিগ্রী)। সেখানে আমাদের মামলার একদল বন্ধুকে রাখা হয়েছে আর একদলকে রাখা হয়েছে বম-ইয়ার্ডে—বম-ইয়ার্ড ছিলো জেলের মধ্যভাগে।

বম ইয়ার্ডের দলকে যদি পালাবার দিন ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্র করা যায় তবে আমরা ভিতরের ছোট নয় ফুট প্রাচীর পার হয়ে গঙ্গার ওপরকার বড় প্রাচীর—সতর আঠার ফুট—পার হতে

বিপ্লবের গণ্ডে

পারি এবং জেলের বাইরে একবার যেতে পারলে গঙ্গা সাঁতার দিয়ে অনায়াসে পার হয়ে যাব।

তাই প্রাথমিক সমস্যা হল, কি করে বম ইয়ার্ড থেকে ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্রিত হওয়া যায়।

স্বকৌশলে ট্রাইব্যুনালকে জানালাম যে মামলা পরিচালনার প্রয়োজনে ৭ আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আমাদের সবাইর জেলের ভিতরে পরামর্শের জন্য একত্রিত হওয়া দরকাব। ট্রাইব্যুনাল বিচার বিবেচনা করলেন—জেল কতৃপক্ষের ও পুলিশের পরামর্শ নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছুটির দিন দিনের বেলায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এক ঘণ্টার জন্য একত্রে মিলবার সুযোগ দিতে জেল কতৃপক্ষকে অন্তর্বোধ কবে পাঠালেন। জেল কতৃপক্ষ রাজী হলো। আলীপুর জেলের জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক পাটনী সাহেব, আই. এম. এস. ও জেলার অপ্সন্স সাহেব। ছুটির দিন আমাদের গতায়াত শুরু হোল।

কোর্ট ছুটির দিন অপবাহুর দিকে সিপাহী এসে আমাদের বম ইয়ার্ড থেকে ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে নিয়ে যেতো। এভাবে প্রাথমিক আয়োজন শেষ হলে আমরা দেয়াল ডিক্রোবার পরিকল্পনায় মন দিলাম। গঙ্গার পাবে বাইরের দেয়াল দূর থেকে দৈত্যের মত দেখায়। সতর আঠার ফুট উঁচু হলেও দেখায় যেন তার চেয়ে বেশী উঁচু, প্রতিটি ইট গুণে আমরা জানতে পেরেছি যে এর উচ্চতা আঠার ফুটের বেশী হবে না এবং আমরা সারি বেঁধে একের পর এক কাঁধে উঠলে তৃতীয়

বিপ্লবের গথ

ব্যক্তি অতি কষ্টে হলেও দেয়ালের শীর্ষস্থান নাগাল পাবে। কিন্তু বাইরের এই পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে গায়ে রয়েছে প্রহরী। সরকারী প্রহরীদের সাহায্য করবার জন্তু আবার রয়েছে একদল বাছাই করা কয়েদী প্রহরী।

সরকারী সিপাহীদের সাহায্য করবার জন্তু যেমন কয়েদী সিপাহীর ব্যবস্থা রয়েছে তেমন বাইরের দেয়ালকে রক্ষা করবার জন্তু জেলের অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যারাক ও ডিগ্রীগুলি ঘিরে ছোট ছোট ৮৯ ফুট উঁচু দেয়াল। সেখানে আবার দেয়ালের প্রতিটি ফটকের সাথে রয়েছে সরকারী প্রহরী ও নানাবিধ সতর্কতার ব্যবস্থা।

অদূরে রয়েছে সু-উচ্চ গম্বুজ ঘর ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীগুলির সামনে—সমস্ত জেলকে দেখবার জন্তু বিশেষ ব্যবস্থা। জেলের ভিতরে ও বাইরে প্রতিটি লোকের যাতায়াত সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

এতগুলি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে দেয়াল ডিক্জোবার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা ৭৮ জন বাইরে যাব, তাই ৭৮ জনকেই দেয়াল ডিক্জোবার কৌশল শিখে নিতে হবে। শেখার সময় সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে আরও বেশী লোকের প্রয়োজন। বম-ইয়ার্ডে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করবার ভার নিল জলপাইগুড়ির বিশ্বস্ত কর্মী অজিত বসু। ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীর ভার নিল ঢাকার অমূল্য সেন।

সেলগুলি মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রায় ১৫ ফুট

বিপ্লবের গাং

উঁচু হবে। একজনের কাঁধে আর একজন উঠবার পর তৃতীয় জনের পক্ষে মাথা সোজা কবে দাডানো শক্ত হলেও শেখার কাজ চলতে পাবে। শেখবার সময় দেখা গেলো প্রথম ব্যক্তির উপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এবং তার উপর তৃতীয় ব্যক্তি কাঁধের উপর চড়ে আনুমানিক ৩০ সেকেন্ড সময় লাগবে। দৌড়ের উপর ওঠবার অভ্যাস করে দেখা গেল প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রথম দেয়াল ধরে দাঁড়াবে সে অতি সহজেই দৌড়ে ওঠবার বেগের ধাক্কাও সামলে নিতে পারে এবং তাতে হয়তো ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড সময়ও বেঁচে যেতে পাবে। দিনের বেলায় আলিপুর জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে যেমনি দরকার হবে সতর্কতার ব্যবস্থা। তেমনি দরকার হবে পালাবার কৌশল বিশেষ ভাবে আয়ত্ত কবা। সব চেয়ে বেশী দরকার— সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করে মুহূর্তের মূল্যকে কাজে লাগান। পালাবার সময় সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পাবলে শত্রু পক্ষের সব রকম ছঁশিয়ারী ব্যবস্থাকে নিষ্ফল করে দিয়ে আমরা কলকাতা সহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব।

পূর্বেই বলেছি যে জেলে ছঁশিয়ারী ব্যবস্থার অন্ত নেই। প্রত্যেক সিপাহীর কাছে রয়েছে বাঁগ, একজন সিপাহী বাঁগী বাজালেই অগ্নাগ্ন সিপাহীরা জেলের নানা দিক থেকে বাঁগী বাজাতে থাকে। গম্বুজ প্রহরী বাঁগীর শব্দে বৃহৎ ঘন্টাটি বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে টানায়ে—বিপদ-জ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিগনের দিকনির্ণয়ক নম্বর প্লেট। বাঁগীর ও ঘন্টার শব্দ কানে পৌঁছামাত্র জেলের বাইরে থেকে ছুটে আসবে সিপাহীরদল যে যে অবস্থায়

বিপ্লবের গথে

থাকবে ঠিক সেই অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি হাতে নিয়ে, এবং তার পিছনে আসবে উর্দ্ধি পড়া বাহিনী বড় বড় লাঠি বা অস্ত্র নিয়ে। ইতিমধ্যে একদল জেলের সিপাহী বাইরের বড় প্রাচীর ঘিরে রাখবে। বাঁশী ও ঘণ্টার আওয়াজ পেলেই নিকটস্থ পুলিশের রিজার্ভ বাহিনী জেলখানার সাহায্যার্থে ছুটে আসবে তাদের দল বল নিয়ে। এই সতর্কতার নাম হোল “পাগলাঘন্টি।” লক্ষ্য করে দেখেছি, এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করতে তিন থেকে পাঁচ মিনিট সময় লেগে যায়।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জেলের ছোট নয় ফুট উঁচু দেওয়াল থেকে শুরু করে ছোট-বড় দেয়ালের মধ্যস্থ ২৫ হাত খালি জায়গা পার হয়ে ১৭।১৮ ফুট উঁচু দেওয়াল উপকাত্তে হবে এবং তারপর উঁচু দেয়ালের বাইরে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত খালি জায়গা থেকে—প্রায় ৫০।৬০ হাত—বর্ষার গঙ্গার ওপার পর্যন্ত সবগুলিই তিন মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে হবে, নতলে আমরা সমগ্র জেল ও পুলিশ বাহিনীর সম্মুখীন হব এবং আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে।

সমস্ত রকম চুল চেরা হিসাব করে আমরা দেখেছি, সবাইর পক্ষে তিন মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ওপারে পৌঁছানো সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ঝড় বাদলের সুযোগ নিয়ে পালানোর চেষ্টা করতেই আমরা মন স্থির করলাম।

সেলের ভিতর নিয়মিত অভ্যাস ও মহড়ার পরীক্ষা চলছে। ঘড়ি ধরে সময়ের হিসাব নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিচারাদীন আসামী অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম

বিপ্লবের গথ্য

ছিলনা তাই সময়ের হিসাব খাস-প্রখাসের নিরীখে নিয়েছি—
এক কথায় একে বলা চলে নাড়ীর জ্ঞানে সময়ের হিসাব।

ঝড় বাদলের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, আবহৃতথ্য থেকে। দৈনিক পত্রিকায় আবহৃতথ্য প্রকাশিত হয়। বিচারাধীন প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে আমরা একখানা ইংরাজী ট্রেটসম্যান কাগজ নিজ খরচে পেতাম। আমাদের সঙ্গে মামলার বিচারাধীন আসামী ছিলেন বঙ্কুর দ্বিজেন রায়। দ্বিজেন রায় ছিলেন বৈজ্ঞানিক। বিস্ফোরক পদার্থ থেকে শুরু করে বিপ্লবী দলের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা পেতাম। আমাদের নিজস্ব দল ছাড়াও অগ্ন্যস্ত্র দলও তাঁর সাহায্য নিতো। বিপ্লবী দলের পুরানো বিশ্বস্ত কর্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও সুনাম ছিলো। আবহৃতথ্য পড়ে মোটামুটি ধারণা দেওয়ার ভার ছিল তাঁর উপর। তিনি নিয়মিত ভাবে আবহৃতথ্যের আভাস দিয়ে যেতেন।

বক্সা দুর্গের কমাগান্ট কটাম সাহেবকে মারবার অভ্যিয়াগে জলপাইগুড়ি জেলে মামলা চলবার সময় ১৯৩১ সালে অজিত বসুর সঙ্গে সঙ্কেতলিপি মারফত আমার পরিচয় ঘটে—অজিত বসু তখন জেলার পার্টি সংগঠক। সেখান থেকে পালাবার প্রচেষ্টার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩২ সালে রাজসাহী জেলে বন্দীদের উপর অত্যাচারের জবাব দেবার জন্য একখানা চিঠি সংগোপনে উত্তরবঙ্গের স্থানীয় সংগঠন মারফত পাঠিয়েছিলাম। চিঠি পেয়ে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অজিত বসু তখন কেন্দ্রীয় সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। বঙ্কুর প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন

বিপ্লবের গথে

গুপ্ত তখন পালিয়ে এসে সংগঠনের ভার নিয়েছেন। প্রভাত চক্রবর্তী জিতেন গুপ্তের সঙ্গে পরামর্শ করে কুমিল্লার সুধীর ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে চলে আসেন এবং সেখানকার নেতৃস্থানীয় কর্মী ক্ষিতীশ দেব ও অম্মাশ্র বিশিষ্ট কর্মীদের—সত্য চক্রবর্তী, বাণী চক্রবর্তী, ভোলা সরকার প্রভৃতির সাথে দেখা করেন এবং সুপারিন্টেন্ডেন্ট লিউক সাহেবের ওপর আক্রমণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য প্রভাত দত্ত, ভোলা রায় ও সুধীর ভট্টাচার্য্যকে ভার দেওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় লিউক সাহেব নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ী নিয়ে যাবার সময় ভোলা রায় সাইকেল দিয়ে গাড়ীখানাকে থামিয়ে দিতে সমর্থ হয় এবং প্রভাত দত্ত পরপর গুলি চালিয়ে লিউক সাহেবকে ভীষণভাবে জখম করে। পুলিশ ভোলানাথ রায়কে আততায়ী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে এবং লিউক শ্বিটিং মামলায় তাকে সাত বৎসর সাজা দিতে সক্ষম হয় কিন্তু পুলিশ প্রভাত দত্তকে সন্ধান করেও তখন বের করতে পারেনি। পরে সে মৃত হ'লে প্রমাণাভাবে পুলিশ তাহাকে অন্তরীন করতে বাধ্য হয়েছিল। সুধীর ভট্টাচার্য্য আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়ে এসেছিল কিন্তু লিউক শ্বিটিং-এ যে তার সক্রিয় অংশ ছিল পুলিশ তা শেষ পর্যন্তও জানতে পারেনি যদিও তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজ তারা করে বেড়াচ্ছিল।

১৯৩৪ সালে অজিত বন্হু আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী। জেল থেকে পালাবার পরিকল্পনাকে সার্থক করে তোলবার জন্য তাঁর উপর শক্ত বৈপ্লবিক দায়িত্ব সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যেতে লাগল।

চৌক

এদিকে পালাবার প্রথম পর্যায়ের মহড়া নিয়মিত ভাবেই চলেছে। 'বম-ইয়ার্ডে' তিনজন—নিরঞ্জন ঘোষাল, হরিপদ দে ও লেখক মহড়ার শিক্ষা নিতো। মাঝে মাঝে অপরাপর বন্ধুরাও ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রি হতে এসে অতি সঙ্কোপনে একত্রে শিক্ষা নিতো। বম-ইয়ার্ডের ডিগ্রির বাইরের বারান্দায় একখানি সংবাদপত্র হাতে নিয়ে অজিত বসু অফিসার ও সিপাহীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতো।

বম-ইয়ার্ডের শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুটির দিন অপরাহ্নে আমরা আবার ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে একত্র হতাম- আত্মপক্ষ সমর্থনের অভিলায়। সেখানে আবার একদফা নূতন করে ডিগ্রীর অভ্যন্তরে সত্যেন্দ্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, সীতানাথ দে ও অমূল্য সেনের সঙ্গে মহড়ার শিক্ষা চলতো। দিনের পর দিন আমরা এইভাবে শিক্ষাকার্য্য চালিয়ে যেতাম।

আমরা দিন গুন্ছি—অনুকূল ঝড়ো, হাওয়ার সাগ্রহ প্রতীক্ষায়। কিন্তু হাওয়ার দেবতা মাঝে মাঝে আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও এপর্য্যন্ত পালাবার সময় সম্বন্ধে কোনও বিচার করেননি। একমাত্র ছুটির দিন অপরাহ্নে তার অনুকূল দর্শন না

বিপ্লবের পথে

পেলে আমরা যে তার সহযাত্রী হতে পারবোনা, সে ধারণা তার তখনও হয়নি। কখনও অপরাহ্ন বেলায় এপারে, কখনও রাত্রির অন্ধকারে, আবার কখনও বিচারালয়ের কাঠগড়ার অভ্যন্তরে ঝড়ের আত্মহান এসেছে কিন্তু আমরা তখন বন্দী-শালায় বদ্ধ কারাগারে পাহারাদারের সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যে অচল বা নিশ্চল হয়ে রয়েছি। এদিকে বর্ষার দিনগুলিতে প্রায় শেষ হতে চললো— আর তো সময় নেই! আমরা তাবছি—অনুকূল আবহাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে সোজামুজি এক নির্দিষ্ট দিনে ঝাঁপিয়ে পড়ব কিনা!

পালাবার প্ল্যান সম্বন্ধে অগাধ যাবতীয় খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ হয়েছে। হুঁসিগপূর্ণ আবহাওয়ার আনুকূল্যে অথবা দুপুরবেলাকার মাথা ভাঙ্গা রোদের মাঝে—যেভাবেই আমরা চেষ্টা করিনা কেন ঠিক হয়েছে যে ছোট দেয়াল ডিক্রিয়ে যুগপৎ ছুটি সারিতে আমরা বড় দেয়াল পার হব। এক সারিতে থাকবে—হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল ও লেখক; অল্প সারিতে থাকবে—ভোলানাথ দাস, সত্যেন্দ্র মজুমদার ও সীতানাথ দে। সারি দুটির সর্ব্ব নিম্নে থাকবে—হরিপদ দে ও ভোলানাথ দাস। তাঁদের আমরা সংক্ষেপে base man অথবা ভিতের মানুষ বলতাম। ভিতের লোক হতে হলে অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ হওয়া দরকার, তাই তাঁরা ভিতের ভার নিয়েছিল। ভিতের লোকের উপরে উঠবে এক সারিতে নিরঞ্জন দে ও অপর সারিতে সত্যেন্দ্র মজুমদার, আবার তাদের উপর উঠবে এক এক সারিতে লেখক ও অল্প সারিতে সীতানাথ দে। অপেক্ষাকৃত

বিপ্লবের পথে

লঘু দেহ বলে লেখকের ও সীতানাথ দেব ভাগ্যে জুটেছিল
শীর্ষস্থান—লঘু দেহের প্রতি তাক্ছিল্য বশতঃই হোক
অথবা সম্মান বশতঃই হোক বন্ধুরা তা স্বচ্ছন্দ মনে গ্রহণ
করেছিলেন।

সারি দুইটিকে বহিঃপ্রাচীরের প্রাচীর-রক্ষীদের আক্রমণ
থেকে বাঁচাবার জন্য ঠিক হোল, অমূল্য সেন প্রথমতঃ তার সমগ্র
শক্তি দিয়ে—প্রয়োজন হলে তার জীবনের বিনিময়ে—রক্ষীদের
প্রতিরোধ করবে যতক্ষণ না প্রাচীরের ভিতর দিক্ হতে বন্ধুরা
প্রাচীরের অপর পারে পৌঁছাতে পারে। অমূল্য সেন দৈহিক
বলিষ্ঠতাব জন্ম যেমন পরিচিত ছিলো, তেমনি সাহসের জন্ম ও তার
খ্যাতি ছিলো। বয়সে নবীন হলেও সহিষ্ণুতারও অভাব তার
ছিল না। সাগ্রহ চিন্তে ও হাসিমুখে সে তার ওপর শ্রুস্ত কাজের
ভার বুঝে নিল।

বড় প্রাচীরের গাঁ ঘেসে জেলের ভিতর দিক থেকে একটি
পায়ে হাঁটার রাস্তা সমস্ত জেলকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেছে—
সিপাহী ও অফিসারদের প্রাচীর পর্যবেক্ষণ করবার জন্যই রাস্তাটি
ব্যবহৃত হতো। রাস্তার মাঝে মাঝে বয়েছে দেয়াল প্রহরী।
আবার এই রাস্তাকে স্থানে স্থানে উঁচু লৌহ গরাদের বেড়া দিয়ে
খণ্ডিত করেছে। বেড়ার গায়ে রয়েছে লোহার দরজা—কোথাও
দরজা অর্গল বদ্ধ আবার কোথাও তাহা উন্মুক্ত। প্রাচীর প্রহরীদের
মধ্যে জেলের সাধারণ সিপাহী ছাড়াও কয়েদী হতে বাছাই করে
এক দলকে প্রহরীর কাজে লাগাবার ব্যবস্থা ছিলো। তাদের
অনতিদূরেই ছিল সরকারী সিপাহীর ব্যবস্থা। প্রাচীরকে রক্ষা

বিপ্লবেয় পথে

করবার ভার ছিলো উভয় শ্রেণীর কিন্তু সরকারী সিপাহীদের প্রাচীরের ওপর নজর রাখবার সাথে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীদের ওপরও নজর রাখার কাজ ছিলো। জেলের ভিতরকার এই রাস্তার সাহায্যে কয়েদী প্রাচীর-প্রহরীরা যাতে নিজেদের গুলীর বাইরে জেলের অগ্ন স্থানে না যেতে পারে তাব জগু সিপাহী প্রহরী কয়েদী প্রহরীর দিকের লোহার দরজাটি তাদের দিক হতে তালা দিয়ে বন্ধ করে দিত। প্রাচীর রক্ষার কাজে এতদিন তাতে কোনও বিঘ্ন হয়নি।

১৩।১৪ নম্বর ডিগ্রীর ছোট দেয়ালের অপর পারে বড় দেয়াল থেকে টেনে তুইটি লোহার বেড়া তুই দিক হতে এসে ছোট ও বড় দেয়ালের মাঝখানটায় যে একটি নিভৃত স্থান সৃষ্টি করেছিল ঠিক সেখানটায় কোনও প্রহরী ছিলনা। এই লম্বা-চওড়া ৪০।৫০ হাত মাঝখানটির খালি জায়গাই ছিলো আমাদের বড় দেয়ালে পৌঁছবার পথ। লোহার বেড়ার উভয় পারেই রয়েছে প্রহরী— একদিকে কয়েদী প্রহরী, অগ্নদিকে সিপাহী প্রহরী। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কয়েদী প্রহরী তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটিকে পাহাড়া দিত। বড় প্রাচীরের গাঁ ঘেসে তালপাতার তৈরী ছাতার নীচে ছিল তার বসবার জায়গা—সঙ্গে থাকত কয়েদীর সখল অর্থাৎ কদল, গামছা, বাটি ও পানীয় জলের ব্যবস্থা। মাথা-কাঁটা রোদই হোক অথবা বিরামহীন বৃষ্টিই হউক সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট স্থানটি ত্যাগ করবার জো ছিল না। দূর হতে প্রাচীরের সিপাহী-প্রহরীরা যেমন তার ওপর নজর রাখতো তেমনি জমাদার,

বিপ্লবের পথে

সার্জেন্টের দল যে কতবার তার ‘ডিউটি’ দেখতে আসতো তার ইয়ত্তা ছিল না। বিনিময়ে সে পেতো কারা আইনের নিয়মানুযায়ী তার কয়েদের দিনগুলির আংশিক হ্রাস—মুক্তির দিন এভাবে বৎসরে দুই তিন মাস পর্যন্ত তার এগিয়ে যেতো।

প্রাচীরের বজ্রবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রাচীরের কাছেই তাই তার আত্মসমর্পণ। নিঃসঙ্গ দেয়ালকে সঙ্গী করে কখনও দাঁড়িয়ে, কখনও বা বসে সে স্বপ্ন দেখতে বাইরের যেখানে সে ফেলে এসেছে তার জীবনপ্রবাহ। তাকে ফিরে পাবার জন্য জেল জীবনের মধ্যে আবরণহীন অর্ধ উলঙ্গ রূপ নিয়ে মানুষের যে স্পর্শ ছিলো তা থেকেও সে নিজেকে বঞ্চিত করে প্রাচীর প্রহরীর নিঃসঙ্গতা বরণ করে নিয়েছিলো যেন তার মুক্তির দিন সহজ হয়ে আসে। মেয়াদ হ্রাসের এই দিনগুলি তাই তার নিকট ছিলো অতি মূল্যবান—জীবনের চেয়েও মূল্যবান মনে হ’তো।

ডিগ্রীর ভিতর থেকে পালাবার সময় প্রথমেই আমরা বাধা পাব সেখানকার সিপাহী, জমাদার, সার্জেন্ট সুবাদারদের তরফ থেকে। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনকে কড়া নজরে ও সংযত রাখার উদ্দেশ্যে ইংরাজ শাসন কর্তৃপক্ষ বাংলার সেন্ট্রাল জেল-গুলোতে প্রথম মহাযুদ্ধের রণক্ষেত্রের ফেরত ও সরকারী পেন্সনভোগী একদল সুবাদার শ্রেণীর সামরিক পাঞ্জাবী অফিসারকে আমদানী করেছিল। তাদের অনেকেই ‘ক্লাণ্ডার্স’ যুদ্ধক্ষেত্রে অসম সাহসিকতার জন্য সম্মান-পদক ভূষিত। জেলের সিপাহীদের কড়াভাবে পাহাড়া দেবার দায়িত্বে সজাগ করে রাখার ভার ছিল তাদের

বিপ্লবের গথ

ওপর। সুবাদার শ্রেণীর মধ্য হ'তে একজনকে বাছাই করে সেদিন মোতামেন করেছিল ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে। এদের বাধা এড়াবার জন্য আমরা ঠিক করেছি যে যদি একই সঙ্গে আমরা সাত জন ছোট প্রাচীর অতি দ্রুত পার হয়ে যেতে পারি তবে এরা কেউই আমাদের রুখতে পারবে না। অত্যাণ্ড বিপ্লবী বন্ধুদের অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আমাদের অনুসরণ করাও এদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। উপরন্তু দেয়াল টপকানোও শিক্ষা সাপেক্ষ। একমাত্র ছুটাছুটি, চীৎকার, পাগলাঘণ্টা ও বাঁশি বাজিয়ে তারা সাহায্যের আবেদন জানাবে মাত্র।

পনের

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত দিবসের যেন ইজ্জত পেলাম। আগষ্ট মাসের শেষ তারিখে (৩১শে আগষ্ট, ১৯৩৪ সাল) প্রাতঃকালীন ইংরেজী স্টেটম্যান্স কাগজখানায় আবহুত্থোর পূর্বাভাসের রিপোর্টে অপরাহ্নের দিকে প্রবল ঝড় বাদলের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ ছিলো। সকাল বেলা থেকেই আকাশের গায় এলোমেলো ভাবে ছড়ান রাশি রাশি সাদা মেঘ দূর হতে দূর গগনে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের আছবানে দিক্চক্রবাল থেকে অনন্ত মেঘের পুঞ্জ মহাকাশের শূন্যতা ভরে দিতে লাগল। অসীমের নীল আকাশ ঢাকা পড়ল মেঘের আবরণে। সূর্যের স্তিমিত আভা নিঃশেষ হয়ে এলো।

আমরা কয়জন বম-ইয়ার্ড থেকে ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীতে যাবার অনুমতি নিয়ে সিপাহীর প্রতীক্ষায় বসেছিলাম। সিপাহী যখন এলো তখন অপরাহ্নের দিকে বেলা গড়িয়ে গেছে। ১৩১৪ নম্বর ডিগ্রীর গেট-পাহরী আমাদের নিয়ম মাফিক তল্লাসী করবার পর ডিগ্রীর আঙিনায় প্রবেশের অনুমতি দিল। ডিগ্রীর বন্ধুরা আমাদের অপেক্ষায় আঙিনাতেই দাড়িয়ে ছিল। সামান্য আকার ইতিতে কথাবার্তা বলে আমরা ডিগ্রীর ভিতর মহড়া দেবার জন্ত ঢুকে পড়লাম। মহড়া শেষ হলো। তারপর পরবার চারখানা ধৃতিকে দড়ির মত করে পাকিয়ে কয়েক হাত অন্তর

বিপ্লবের পথে

কয়েকটি শক্ত গাঁট বেঁধে দিলাম। ছুখানা ধুতি দিয়ে একটি করে দড়ি তৈয়ার হ'লো। আমরা আর দেরী না করে ডিগ্রীর ভিতর থেকে বাইরের আঙিনায় এলাম।

আসন্ন তুর্ঘ্যগের ছায়া পৃথিবীতে নেমে এসেছে। মেঘের ঘন আবরণ পৃথিবীকে ঢেকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানালো দিকে দিকে—ছুটে এলো পাগলা হাওয়া উন্মত্ত বেগে। গাছপালাগুলি তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন ছুটে বেড়াতে চায়। আকাশের গা চিড়ে মেঘের বুক থেকে বিছাৎ ঝলক্ মূহুমূহ রাঙিয়ে দিচ্ছে বিশ্বচরাচর—অনন্ত যাত্রাপথে আলোক বিচ্ছুরণ। ঠিক্ এমন সময়ে “আমিও যাব” “আমিও যাব” বলতে বলতে ছুটে এলো ডিগ্রীর ছোট প্রাচীরের দিকে আমাদেরই অপর একজন বন্ধু জ্যোতি মুকুল ঘোষ। পালাবার পরিকল্পনা নির্দিষ্ট লোক ছাড়া কেউ জানতো না। দশ বার জন বন্ধুই শুধু জানত কিন্তু না জেনেও জ্যোতির বিপ্লবী মন বুঝতে পেরেছিল যে আমরা পালাবার আয়োজন করেছি এবং আজই তা সম্পূর্ণ হতে যাচ্ছে—তাই সাময়িক উদ্ঘাদনায় তার মনের বাঁধন খুলে গেছে। যাবার জন্তু তার নাম নির্দিষ্ট ছিল না। তাঁকে বুঝিয়ে সৃজিয়ে সুবাদারের জিন্মায় অসুস্থতার অজুহাতে জেল হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। সুবাদার তাকে পৌঁছে দিয়েই অবিলম্বে ফিরে এলো।

সুবাদারের মনে সংশয় এসেছে—বাংলা দেশে বিপ্লবীদের অসম-সাহসের কত ঘটনা সে ঘটতে দেখেছে—কত বীর কাঁসীতে গেছে, আর কতই না গেছে, দীপান্তরে। জেলের ভিতর তাদের

বিপ্লবের গথে

শক্ত বাঁধুনি দিয়ে হবে বাখার কাজ হলো তার। বিপ্লবীবা
ছুর্যোগের প্রলাঙ্কবী আবহাওয়াব মধ্যে কি কববে কে জানে।
জেলের আনাচে কানাচে বিপ্লবের রক্ত-শক্ত-দল। দীনেশের
তাজা রক্ত এখনো শুকোয়নি! তাই সে ডিগ্রীর আঙিনায়
ত্রস্তপদে সিপাহীদের সতর্ক হবে দিয়ে সাবধান দৃষ্টি রেখে
পাহাড়া দিচ্ছে।

ঝঞ্ঝাব গতিবেগ বেড়েই চলেছে, পৃথিবা কেঁপে কেঁপে
উঠছে। এবাব মুঘলধাবে বৃষ্টি নেমে এলো। মেঘের গর্জন,
বিদ্রোহের ঝলকানি, উন্মত্ত পাগলা হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এসে
যেন একালে কালবৈশাখের আহ্বান জানালো—তারই সাথে
সাথী হয়ে দিগন্তে ছুটে বেড়াবাব জগৎ। গ্রহবীদের মনকে
সাময়িকভাবে ভোলাবাব জগৎ আমবা ডিগ্রীব ভিতর প্রবেশ
কবলাম। তাবা আশ্বস্ত হয়ে ডিগ্রী ও উপডিগ্রীর আঙিনার
দরজাগুলো নামমাত্র বন্ধ কবোদিয়ে বাইরের আঙিনায় পাহাড়া
দিতে শুরু করলো।

এবার পালাবার সিগন্যাল পড়ে গেলো—এক-দুই-তিন।
আমরা সবাই হবিপদ, নিবঞ্জন, সতোন, ভোলানাথ, সীতানাথ,
অমূল্য ও লেখক বাডেব বেগে ছুটে চলেছি ছোট প্রাচীরের
দিকে। প্রাচীর পার হতে যাচ্ছি এমনি সময়ে ডিগ্রীর ভিতর
থেকে এক কয়েদী পাহাড়াদারকে হঠাৎ সামনে দিয়ে বাহিরের
আঙিনার ভেজান দবজার দিকে ছুটে যেতে দেখে বন্ধুদের গদেহ
হল যে সে সুবাদার ও সিপাহীদের পা-গাবার খবর পৌছাতে
যাচ্ছে। মুহূর্ত দেবী না করে বন্ধুবা তাকে ক্ষিপ্রগতিতে ধরে

বিপ্লবের গাথ

সেলে ভিতর টেনে নিয়ে গেল এবং তাবপব মেঝেতে চাঁকবে ফেলে দিয়ে তাব মুখে কাপড় গুঁড়ে তাত পা বাঁধতে শুরু করে দিল। ঠিক এমনি সময়ে আমিও তাদের সামনে এসে পড়ি এবং ‘সময় নেই’ ‘সময়নেই’ বলে হুসিধার কবে দিতেই বন্ধুরা তৎক্ষণাৎ কয়েদীকে ছেড়ে দিয়ে আদেশ দিল যেন সে মেলেব দেয়ালের দিকে মুখ করে চোখ বুজে বসে থাকে। কয়েদীটি সেই ভাবেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। সঙ্গে সঙ্গে আমবা সবাই পরপর অতি সহজেই ছোট দেয়াল পাব হয়ে গেলাম। পাব হবাব সময় দেখতে পেলাম কয়েদীটি আঙিনাব দবজা গেলে যেন ছুটে বেব হয়ে গেল। কানে ভেসে এলো—প্রবল উৎকর্ষায় নিকপায় হাবিলদাব ও সিপাহীর দল সেলেব আঙিনা থেকে সমস্ববে আন্তনাদ করছে—“আসামী ভাগতা হায়” “আসামী ভাগতা হায়”। আশেপাশের অগ্ন্যান্ত সিপাইরাও বাঁশী বাজাতে শুরু কবেছে। পর্যাবেক্ষণ-গম্বুজের দৃষ্টি পড়েছে।

একাদিকে ঝড় বাদলেব কড় তাংবের সাথে ভয়ান্ত প্রহরীদের বাঁশীর শঙ্কা-ধ্বনি, অন্যদিকে শৃঙ্খল ভেঙ্গে জাতির মুক্তি সাধনে বিপ্লবেব অভিযাত্রীদের সাথে দেশী ও বিদেশী অত্যাচারী শাসক শ্রেণীব নগ্নশক্তি প্রয়োগেব ব্যাপক প্রস্তুতির ব্যবস্থা। উন্নত্ত প্রকৃতি তাব সমগ্র শক্তি দিয়ে যেন মুক্তির পথকে রক্ষা করছে। ঝড়, বাদল ও বজ্রের শক্তি আমাদের দেহে সঞ্চারিত। চকিতে পৌছে গেলাম বড় দেয়ালের গায়। দূর হতে দেখা যাচ্ছে, বন্ধুবর অমূল্য সেন তার সুদীর্ঘ, সুন্দর ও বলিষ্ট দেহ মন নিয়ে লোহার দরজা আগলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ওপারের

বিপ্লবের গাথ

সিপাহীরা সজে তাব ঝুটোপাটি ও লড়াই চলেছে। প্রথম সারিতে বন্ধুবর হরিপদ দেব গা বেয়ে নিরঞ্জন ঘোষাল ঝুটিতে উঠে যেতেই আমিও তৎক্ষণাৎ দড়ির এক কোন দাঁতে চেপে হবিপদদেব গা বেয়ে নিরঞ্জনের কাঁধে চড়ে গেলাম। হরিপদ দে পায়ে পাতার উপর ভর দিয়ে সামান্য একটু উঁচু হয়ে দাড়াতেই অতি সহজে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের শীর্ষে উঠে পড়লাম। ওপাশে দ্বিতীয় সারির দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপরের নিকে নজর দিতেই দেখতে পেলাম সু-উচ্চ গম্বুজ ঘবেব সিপাহীদের অস্বাভাবিক চঞ্চলতা। গম্বুজ শীর্ষে মোতায়েন সিপাহীরা ঝোলান বৃহৎ ঘণ্টাটি জোর হতে জোরে দ্রুততালে ঢং ঢং ঢং শব্দে বাজিয়ে চলেছে—গম্বুজ হতে গম্বুজের উদ্ভাদনায়। ঝড়ের কদ্র তাণ্ডবের কাছে তাদের প্রচেষ্টা মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসের গায়। বিপদজ্ঞাপক লাল নিশানা ও বিপদের দিক দেখাবার বোর্ডগুলি টানিয়ে দিয়েছে—জেলের সদর রাস্তার দিকে যেখান হতে ছুটে আসবে সাহায্য-বাহিনী।

দড়ির কোনটি হাতে নিয়ে প্রাচীর থেকে লাভ দিয়ে বাইরে পড়লাম, ঘাসে ভরা ভিজে মাঠেব ওপর। পড়ার সজে সজেই দ্রুতপদে দাঁড়িয়ে দড়ির কোনটী শক্ত করে ধরে রইলাম। মুহূর্তের মধ্যেই নিবঞ্জনও দড়ি বেয়ে এপারে নেমে এলো। নিবঞ্জনব হাতে দড়ির কোনটী দিয়ে গম্বুজ দিকে ছুটে গেলাম। প্রায় সজে সজেই হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ছুটে এলো গম্বুজ কিনাবায়। গম্বুজ ঝাপ দিতে যাচ্ছি এমন সময় সীতানাথ দেও ছুটে এসে হাজির হলো। জলে ঝাপ দেবার সময় সীতানাথ দে বলে গেলো সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাস দড়ি

বিপ্লবের গথ

বেয়ে দেয়ালে উঠতে না পারায় সে দড়ি ছেড়ে দিয়ে একাই
ছুটে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। বোধকরি অমূল্য সেনের
বাহু ভেদ করে সিপাহীর দল প্রাচীরের গায়ে এসে পড়েছে এবং
বন্ধুদ্বয় সত্যেন মজুমদার ও ভোলানাথ দাসের দেয়ালে
উঠবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ঘোল

সাগরের বাণী নিয়ে জোয়ার এসেছে, জোয়ারের বাণের সাথে ঝড় বাদলের অবিভ্রান্ত জলরাশি মিশে কালীঘাটের মরা গাঙ্গকে ভরা গাঙ্গে পরিণত করেছে। উচ্ছল জলরাশি গঙ্গার বক্ষে ঢেউ তুলে ঝড়ের সাথে ছুটে চলেছে। প্রৌঢ় সীতানাথ দে তাঁর লঘু দেহ নিয়ে তরতর করে সাঁতার দিয়ে নদী পার হয়ে গেলো। হরিপদ ও নিরঞ্জন একই সাথে ওপারে উঠে গেলো। আমিও তীরের দিকে এগোচ্ছি কিন্তু স্রোতের টানে আমার দুর্বল দেহ কালীঘাট পুলের দিকে ভেসে চলেছে। তীরে পৌঁছতে আমার খানিকটা দেরী হতে পারে ভেবে বন্ধুদের জল থেকেই চলে যেতে নির্দেশ দিলাম কিন্তু বন্ধুরা— হরিপদ দে ও নিরঞ্জন ঘোষাল—আমার কথা না মেনে আবার জলে নেমে পড়ল এবং তাঁরা তাদের হাত থেকে গামছার একটি কোন আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেই আমি তার সাহায্যে তীরে উঠে পড়লাম। তীরে উঠেই জেলের দিকে এক পলক দৃষ্টি হেনে বুঝতে পারলাম যে সশস্ত্রবাহিনী প্রাচীর রক্ষার্থে তখনও এসে পৌঁছায়নি। পালাবার পর থেকে চার মিনিটের মত সময় পার হয়ে গেছে—রক্ষীদের পৌঁছবার সময় আসন্ন প্রায়। ওপার হতে আমাদের দেখতে পেলোই ‘শিকার’ লক্ষ্য করে তাদের

বিপ্লবের গথ

বন্দুকগুলি গর্জে উঠবে তাই মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বিদ্রোহবোপে হিন্দু মিশনের গা বেয়ে ছোট্ট একটি রাস্তা ধরে হরিশ চাটাজী স্ট্রীটে ছুটে আমরা বের হয়ে পড়লাম।

কলকাতার জনমুখর ও যানবহন রাস্তা—প্রবল বর্ষার ধারার তলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জনপ্রাণীর বা যানবাহনের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখা যায় না। রাস্তার মোড়ের পুলিশ-পাহাড়াদাররা অন্তর্ধান হয়েছে। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রলয়ের দেবতা। ঝড় ও বৃষ্টি মাথায় নিয়ে একইটু জল ভেঙ্গে যুমন্তপুরীর মত সারি সারি অট্টালিকাগুলির পাশ কাটিয়ে আমরা শহর থেকে বিভিন্ন দিক দিয়ে বের হয়ে যাবার জন্তু এগোতে শুরু করেছি। সীতানাথ দে একাকী চলে গেল হাওড়ার দিকে; হরিপদ দে দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে কসবার দিকে। নিরঞ্জন ও আমি ছুটে চলেছি ভবানীপুরের দিকে। সেখানে থানার নিকটে পৌঁছেই অপেক্ষমান একখানা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে চড়ে বসলাম। থানার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারলাম যে থানার নীরবতা ভগ্ন হয়নি, পালাবার সংবাদ তাদের নিকট তখনও পৌঁছায়নি। ট্যাক্সিখানা আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে ছুটে চললো উল্টাডাঙ্গার দিকে। উল্টাডাঙ্গা স্টেশনের নিকট পৌঁছেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া চুকিয়ে বিদায় দিলাম। অতি সংগোপনে ও সযতনে অয়েল পেপার দিয়ে মুড়ে রাখা কয়েকখানি এক টাকার নোট সঙ্গেই ছিল। বর্ষার বা গজার জলে নোট কয়খানি নষ্ট হয়নি। নিকটেই এক পার্টি বন্ধুর বাসা ছিল। তাঁকে না পেয়ে দূর থেকে রাণাঘাটগামী একখানা লোকাল

বিপ্লবের গাথ

ট্রেন স্টেশনে আসছে দেখে ছুটে গিয়ে আমরা তাতেই উঠে বসলাম।

আমরা আগে থেকেই ঠিক করেছিলাম যে কলকাতা সহরের উপকণ্ঠে আশ্রয় নেব। কলকাতা সহর গোয়েন্দা বিভাগের কেন্দ্রস্থল। স্পেশাল-ব্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স-ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা বিভাগদ্বয় বিপ্লবীদের সকল রকম কেন্দ্র ও আড্ডাগুলিকে চষে বেড়াচ্ছে। যুগান্তর, অনুশীলন, বি, ভি প্রভৃতি বিপ্লবীদের চিহ্নিত ও সন্দেহভাজন কর্মীদের ওপর শ্রেন্দৃষ্টি রেখেছে। পালাবার অল্প সময়ের মধ্যেই—আনুমানিক আধ ঘণ্টার মধ্যে—কলকাতার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি, রেল স্টেশন ও দ্রুতগামী যানবাহন সবই পুলিশের ব্যাপক সন্ধান ও তল্লাসীর মধ্যে এসে যাবে। গোয়েন্দা পুলিশ ও সাধারণ পুলিশ তাদের যুক্ত সন্ধানী দল উপদল নিয়ে বিপ্লবীদের আড্ডা, মেস ও বোর্ডিং ছেয়ে ফেলবে এবং তাদের সাহায্য করবার জন্য রাইফেলধারী বাহিনী ছুটবে—পুলিশের গাড়ী নিয়ে রাস্তায় রাস্তায়।

পুলিশের অসংখ্য গুলুচর বাহিনী এবং দেশজোহীর দল সঠিক অথবা কাল্পনিক খবর দেবার জন্য অঙ্ককার গুহা থেকে প্রভুদের নিকট এসে হাজির হবে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন দানা বাঁধবার সাথে সাথে দেশজোহীর দল গজিয়ে উঠেছিল—আগাছারই মতন জাতির বুকের পাঁজরের মধ্যে। জাতির শক্তিমান অংশকে নির্জীব ও শক্তিহীন করে দিয়ে তারা নিজেদের ও পরিবারের উদরপূর্তি করতে সংশয় করতেন। সম্প্রতি এদের

বিপ্লবের গথ

ধরাছোঁয়ার বাইরে যাবার জন্য আমরা সহরের বাইরে ছুটে চলেছি।

ট্রেন খানায় তেমন ভিড় ছিলনা। ঝড়ের প্রচণ্ডতা খেমে গেছে কিন্তু বৃষ্টি তখনও মুষলধারায় পড়ছিল। আমাদের পরণে ধুতি ও ফতুয়া ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। সারা গাঁ বেয়ে অব্যোরে জল ঝরে পড়ছিল। এমন বেহুদ ভিজ জামা কাপড় নিয়ে কেউ যে গাড়ীতে সওয়ার হ'তে পারে যাত্রীরা অনেকেই হয়তো ভাবতেও পারেননি। গাড়ীর প্লাটফর্ম তো জলে ভরে গেল। অবাক হয়ে অনেকেই এমন করে ভিজ যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করলো। জড়িতকণ্ঠে অতি সংক্ষেপে জবাব দিলাম—শ্মশান থেকে ফিরছি। জবাব শুনেই সহানুভূতিতে অনেকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দূরে বসল। নিরঞ্জন মুখে মুচ্কি হাঁসি দেখে তাব গাঁ টিপে দিয়ে মুখ নত করে বসে রইলাম যেন আমরা শোকে জিয়মাণ হয়ে আছি কিন্তু আমাদের মনের ভিতর উভয়েরই অপ্রকাশে রয়েছে গভীর আশংকা।—যাত্রীদের মধ্যে অলক্ষিতে উপস্থিত কোনও গোয়েন্দা অফিসার আমাদের সুপরিচিত মুখ দেখলেই চিন্তে পারবে এবং শ্মশানের রহস্য বের হয়ে যাবে।

গাড়ী ছুটে চলেছে। পালাবার পর থেকে প্রায় এক ঘণ্টা হ'তে চললো—অদূরেই শ্রামনগর স্টেশন। শ্রামনগর পার হলেই ভাটপাড়ায় গাড়ী এসে যাবে। ভাটপাড়া স্টেশন মোটেই নিরাপদ নয়—ভাটপাড়া স্থানটি রাজনৈতিকগদী। গোয়েন্দাদের আনাগোনার সম্ভাবনা তো এমনিই সেখানে আছে। সেখানে গাড়ী তল্লাসী হতে পারে। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই কলকাতার ও

বিপ্লবের পথে

কলকাতার নিকটস্থ ষ্টেশনগুলিতে তল্লাসী শুরু হয়ে গিয়ে থাকবে। আমরা তাই আর বেশী দূর না এগিয়ে শ্রামনগর ষ্টেশনেই নেমে পড়লাম। ষ্টেশন গেটে ছাড়পত্রের জন্য এক টাকার দুইখানা নোট দিয়ে বাইরে এসেই জগদলের দিকে পায় হেঁটে রওনা হলাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে দ্রুত এগিয়ে চলেছি—অদূরেই পুলিশের থানা। দূর থেকে থানার ভিতর অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য, যানবাহনের সমাবেশ ও বহু লোকের ব্যস্ততাপূর্ণ গতায়ত দেখা যাচ্ছে। দিনের আলো স্নান হয়ে এসেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে। গোধুলির ছায়া নেমে এসেছে, পৃথিবীর ওপর। থানার রাস্তাটুকু সোজানুজি ছুটে পার হয়ে গেলাম। শ্রান্ত দেহকে সজোরে টেনে চলেছি কিন্তু কিছুটা পথ যেতেই হঠাৎ দূর থেকে বিপরীতমুখী একখানা পুলিশের সশস্ত্র গাড়ী বেগে ছুটে আসছে দেখে আমরা প্রমাদ গুলাম। স্পষ্টই দেখতে পেলাম যেন দূর থেকে সশস্ত্র গাড়ীখানা আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি হেনে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু তারা নিকটে এসে বিপ্লবীর মত অতর্কিত ভয়ঙ্কর আমাদের দেখতে তাদের মনে না হওয়ায় সোজানুজি শ্রামনগর থানার ভিতর গাড়ী নিয়ে ঢুকে গেলো। এরা ‘খুঁজে’ বেড়াচ্ছে। আমরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হেঁটে জগদল শ্রমিক বাস্তুর ভিতর সত্বরই পৌঁছে গেলাম। এখানে পৌঁছে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনে এগোতে শুরু করেছি। জগদল বাজারের ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে গঙ্গার পার ঘেষে, ভাইপাড়ার দিকে।

জগদল বাজার—মজুরদের আনা-গোনার অন্ত নাই। উজ্জল বিজলী আলোয় বাজার ও রাস্তা আলোকিত। দিনান্তে মজুরদের

বিপ্লবের পথে

পারম্পরিক আদর আপ্যায়ন তাদের গোষ্ঠী ছেড়েও পথচারীদের যেন সৌভ্রাত্তের আবেদন জানাচ্ছে। সোড়া পানী, লাল ও নীল পানীয় জল, পান ও সিগারেটের ছড়াছড়ি। মলিন দেহ ও মলিন পোষাক পরিচ্ছদকে উপেক্ষা করে মানুষের অন্তরের রূপ যেন তাঁর পরিচয় জানাচ্ছে। সস্তা মালের বিপনিগুলি ঘিরে রয়েছে, মজুর ও মজুর গৃহিণীর দল—সস্তা মালের কেনাবেচার অন্তবালে সস্তা শ্রম-মূল্যের বিনিময়। অনতিদূরে বাজার পাব হয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের একদিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট মিলসের প্রাসাদোপম অট্টালিকাশ্রেণী গঙ্গার পার ঘেঁষে, আর অন্য দিকে রয়েছে এংলো-ইণ্ডিয়া জুট মিলসের বাবুদের কোয়ার্টার নামে পরিচিত দ্বিতল গৃহশ্রেণী। এংলো-ইণ্ডিয়া জুট মিলস্ বাংলার পাটের ব্যবসাদার। পাট ও পাটজাত চট ও থলে তৈরী করে ছনিয়া জোড়া ব্যবসা গড়ে তুলেছে। মোটা মুনাফায় গড়ে তুলেছে বিদেশী ধনিকতন্ত্রের বিশাল ও দৃঢ় ভিত্তি। আন্তর্জাতিক ধনিকতন্ত্রের মধ্যে পাটের ব্যবসাদাররা বিশিষ্ট গণ্য ও মান্য বলে পরিচিত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তাঁরা শক্তিশালী ধারক ও বাহক। তারই আশ্রয়ে রয়েছে সহস্র সহস্র কুলি মজুর আর বাঙ্গালী বাবুর দল—বংশ পরম্পরায় কেরানীকুল নামে খ্যাত—বিদেশী ধনিকতন্ত্রের মুনাফার যোগানদার আর ভূখা মিছিলের ভবিষ্যৎ সহযাত্রী এঁরা।

বাজার ছেড়ে বাবুদের কোয়ার্টারের সামনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অঙ্ককারের এক কোনে দাড়িয়ে বাবু-কোয়ার্টারে পরেশ ব্যানার্জীর খোঁজ করতেই পরেশ এসে হাজির হলো।

বিপ্লবের গথে

পার্টি দরদী, স্বভাবে দিল্দরিয়া ও বেপরওয়া প্রকৃতির লোক বলে পরেশ পরিচিত ছিলো—নিঃশব্দের বিশেষ পরিচিত ও বিশ্বাসী বন্ধু। অন্ধকার কোনে এসে আমাদের দেখেই অবাক হয়ে জড়িয়ে ধরে তার শয়ন কক্ষে নিয়ে গেলো। পরেশের আনন্দ যেন ধরে না! জামা কাপড় বদলাবার জন্তু সে তার নিজের জামা কাপড় নিয়ে এলো। ভিজ্জে জামা কাপড় আমাদের গায়েতেই শুকিয়ে গেছে। স্নান সেবে জামা কাপড় পরে ঘরে ঢুকছি এমনি সময় পরেশের ছোট ভাই ভাটপাড়া থেকে এসে জানালো, যে ভাটপাডায় গাড়ী থামিয়ে অনেকক্ষণ তল্লাসী চলেছে। কলকাতার জেল ভেঙ্গে বিপ্লবীরা অনেকেই নাকি পালিয়েছে, তাদের ধরবার জন্তু সর্বত্রই তার বার্তা এসেছে। কথা শুনে মনে হোল, আমাদের গাড়ীখানা বা পরবর্তী গাড়ীখানা থেকেই তল্লাসী শুরু হয়েছে। আমাদের হিসাব নির্ভুল হয়েছিল। সময়মতই আমরা শ্যামনগর ষ্টেশনে নেমে পড়েছিলাম।

এবার মনে হোল, পিছে রেখে আসা বন্ধুদের কথা। সত্যেন্দ্র মজুমদার, ভোলানাথ দাস, অমূল্য সেন দেয়ালের গায় ধরা পড়েছে। তাঁদের জীবন রক্ষা হয়েছে কিনা সন্দেহ! সম্মুখ মৃত্যুর সাথে তাদের নিরস্ত্র লড়তে হবে। একমাত্র ভরসা তাঁদের মনোবল—“জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিন্তা ভাবনাহীন”—এই মনোবলই হয়তো তাঁদের সবাসরি শ্বনের হাত থেকে বাঁচাতে পারে।

সতের

হরিপদ ও সীতানাথ দে নিশ্চই ইতিমধ্যে তাদের আশ্রয়ে পৌঁছে থাকবে। তবুও তাদের সঠিক সংবাদেব জ্ঞান কলকাতায় লোক চলে গেল। গভীর বাতে সে ফিরে এসে জানালো,—কলকাতাব স্টেশনগুলি গোবেন্দা পুলিশের আমদানীতে গিজ্ গিজ্ করছে, চাবদিকেই পুলিশের সর্ক ও সন্ধানী দৃষ্টি যেন ওনা ওত পেতে বসে বয়েছে যেমন কবে বসে থাকে শিকাব ধরবাব জ্ঞান বনের বাঘগুলো। পাছে তাকে অহুসং ক'বে পুলিশ আস্তানাব সন্ধান পায় তাই সে কাবো কাছে বাত্রে সাহস করে যায় নি।

রাত কেটে গেল, প্রভাতী সংবাদেব আশায। সকাল বেলাকাব কাগজ এলো। দৈনিক বাং। ও ইংবাজী কাগজ-গুলো তাদের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হবফে “আলপুব সেন্ট্রাল জেল থেকে আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলাব আসামীদের চাকল্যকর ও ছুঃসাহসিক পলায়ন” শিবোনামা দিয়ে পলাতক বাজনৈতিক বন্দীদের নাম, ধাম ও বাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছে। প্রাথমিক সংবাদে জেলের অভ্যন্তরে যাবা ধবা পড়েছে তাদের নাম বয়েছে—সত্যেন মজুমদার, ভোলানাথ দাস ও অমূল্য সেন। পরবর্তী সংবাদে দেখতে পেলাম, পুলিশ অভিযানের ফল স্বরূপ বালিগঞ্জ স্টেশনের নিকট হরিপদ দে গ্রেপ্তার হয়েছে।

বিপ্লবের গাথ

বজ্রবহ হৰিপদ দা। গেপাবেব খবৰ আকস্মিক ও মৰ্মাস্তিক।
সময়ের সৃষ্টি-সৃষ্টি। বচাবেব মা।। দণ্ডযুক্ত কোশল আয়ত্ত
কবেই ছুৰ্জ্জ গান্ধি ম. দুৰ্জ্জ জল-প্রাচীর পাব হতে
আমবা সক্ষম হযোহা।। কলকাতা সৰু ছেড়ে বাবাব সময়ও
তেমনি সময়েব সৃষ্টি বিচাৰ আমবা ন'বহিমান। তথ্যও মনে হোল
যেন হৰিপদ দে. সখানেই মান।। ১৮৮০। পানাবাব তল্ল সময়েব
মধ্যেই কৰ্ত্তা।। মিকচ'ম এটা'জ লেখানব গাথ গোয়েন্দা
পুলিশ নিয়ন্ত্ৰণ সৰু সময় হযো.। এব' হৰিপদ দে. কসবা
যাবাব পথে প'ৰ্ত্তা।। গোয়েন্দা পুলিসে।। ১৮৮০।

ৱিটিশ শাসন খাড়াব বাতান ম.।। ১৮৮০। ব্যবস্থা।
সৰ্ব্বএই সময়ম' চা।। ১৮৮০। ১৮৮০, এনেই নেই।
পলাতকদেব প'বাব।। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
অভিযান পুলিশ সাবাব।। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
বিশদ বিবরণ আছে। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
কৰ্ম্মদেব গ্রেপ্তাবেব স'বাব সাথে। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
ট্রেনগুলিকে শ্রীবামপুৰ, চন্দননগৰ। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
খডগপুৰ ট্রেন। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
তাতে বয়েছে। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
মফঃস্বলেন মফঃস্বলেন, ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
ফরিদপুৰ বৰিশাল কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় এবং অতীতকে
সীতানাথ দে. ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।
পাঞ্জাব, ইউ-পি ও মাদ্রাজ অঞ্চলে ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।

ইংবেজ সামাজ্যেব বৃদ্ধিবাংদেব ডো. ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০। ১৮৮০।

বিপ্লবের পথে

সংরক্ষণ নীতির উপর নির্ভরশীল। বিপ্লব আন্দোলনকে স্বত্ব করবার জন্য চংনীতির অশেষ প্রয়াস ব্যবস্থার মধ্যেও যেন কোথায়ও দাগ্, দেনে, নে। আন্দোলনো সংগঠনের ধারা জন্মাব জন্য বিপ্লবী দলের সভ্যদের মধ্যে যাবা অমনও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হয়নি, তাদের হুঁচকানকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠার না করে বাইরে নেওয়া দিও, যেন তাদের অনুসরণ করে পার্টির ফেবারীদেব খোঁজ-খব পেতে অথবা নবাগতদের কপ ও পরিচয় সম্বন্ধে ভ্রমাবিবহাল হও পাবেন। বিপ্লব আন্দোলনের প্রতি ক্ষমাহীন নাতন অস্তুরালে, সামাজ্য রক্ষার পোষাজনে ছিল এই দ্বৈত নীতি—বর্তমান ইংরেজ প্রতিপত্তির দিকে সম্প্রসারণ।

কুমিল্লার মণি দাশ গুপ্ত হ নাতন বঙ্গন বায় তখন কলকাতার কলেজে পড়ত। পুলিশের বড়ো নজর এড়িয়েও সংগঠনের সাথে যোগসূত্র রাখতে যাবা সংগ্রহ করেছিল। আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে তারা সক্ষম হনো।

বিপ্লব-আন্দোলনকে বাচাবার পোষাজনে বেরালী হিসাবে আত্মগোপন করে যাবা মেম্বার কল্যাণ মূলে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল তাদের মধ্যে প্রফুল্ল সেন, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, দেবব্রত রায়, মাখন কর, পৃথ্বীশ চন্দ্র পুরকায়স্থ ও নাবাকর্মা পাকল মুখার্জী ছিল অন্যতম। আমাদের খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফেবারী প্রফুল্ল সেন ভগদলে পরেশের বাসায় এসে হাজির হলো। প্রফুল্ল সেন পার্টির পুরানো কর্মী। ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বৈপ্লবিক পার্টির সাথে সক্রিয় যোগাযোগ রেখেও কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলন ও কাজের সঙ্গে সে সাধ্যমত নিঃসেকে যুক্ত রেখেছিল।

বিপ্লবের পথে

ইতিমধ্যে সীতানাথ দে চন্দননগর থেকে নদী পার হয়ে এপারে এসে হাজির হলো। জগদলে পরেশের বাসা আনাগোনায়ে ভাবী হয়ে উঠল। সামান্য মাত্র সন্দেহের অবকাশ পেলেই পবেশ সমগ্র পবিবাসসহ ‘জবাই’ হবে ভেবে আমরা পরেশের বাসা ছেড়ে অন্ত্র যাবার সিদ্ধান্ত কবলাম।

জগদলে শ্রমিক বস্তুগুলো এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে আছে—বাঁশের মাচান ওপব ঢালি দিয়ে তৈরী ছাদ আর মাটির দেওয়াল - জানালা বা বায়ু প্রবেশের কোনও ব্যবস্থা তাতে নেই। বাইবে থেকে দেখলে মনে হবে যেন গোয়েন্দা পুলিশের নজর এড়াবাব জগুই তৈরী হয়েছে। শ্রমিক বস্তুর ভিতর তাদের অংশদান হয়ে একখানা কোঠা ভাড়া করে আস্তানা গেড়ে বসলাম। তারা কেউ সন্দেহ করলো না, এরা কারা? শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সন্দেহের অবকাশ কোথায়। তারা জানে, পেটেব তাড়নায় দুনিয়াব লোকগুলো ঘুরে মরছে এবং আমবাও তাদের মতই কলের চাকুরে অথবা চাকুরীর উমেদারি কবে বেড়াচ্ছি। আশে-পাশে চারদিকেই ছড়িয়ে আছে কল আন কল, বাঁও মজুবেব দল। কলেব বাঁশী বাজ্‌বার সাথে সাথে আমাদেরও তাদেরই মতম ছুটেতে হবে নিশ্চয়!

এখানে হতে প্রাথমিক কাজ আমবা শুরু করে দিলাম। পার্টির বিশ্বস্ত বন্ধুদের সাথে দেখা করবার জগু কতকগুলি সাক্ষাৎ-কেন্দ্র সবে মাত্র খুলেছি। সাক্ষাৎ-কেন্দ্রগুলি নামহীন নম্বর যুক্ত, কোথাও তা আমগাছের নীচে, কোথাও-বা রেলের ধারে, কোথাও বা নদীর পারে, আবার কোথাও-বা তা পুরানো পুকুর

বিপ্লবের পথে

ধারে—V¹, V², V³, V⁴, V⁵ প্রভৃতি নথ্য দেওয়া। একমাত্র সাক্ষাৎকারীরা ছাড়া আর কেউ এদেব সঠিক স্থানীয় অস্তিত্ব জানত না। ভাটপাড়া স্টেশন থেকে বেশী দূরে নয়, অথচ সন্দেহমুক্ত পাড়ার ভিতরে একখানি বাসা ভাড়া করে রেখে দিলাম, যেন বন্ধু বা কেউ তাশ্রয় অভাবে ধরা না পড়ে।

ইতিমধ্যে দমদম গ্রাস-ফ্যাক্টরীর অগ্রতম স্বত্বাধিকারী পাটিব পুবাণো বন্ধু অনাদি সেনগুপ্ত মহাশয়েব সঙ্গে দমদম গ্রাস ফ্যাক্টরীতে নিরঞ্জন ঘোষালকে নিয়ে অতি সাবধানে দিনের বলায় দেখা করতে সমর্থ হলাম। তিনি আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানলেন। সেন-মহাশয় ছিলেন ভাবপ্রবণ, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ, উদারচেতা লোক। তাঁর চারিত্রে ছিল আত্মরিক তার সঙ্গে সাহসিকতার সহজ সংমিশ্রণ। তাঁর বৈপ্লবিক কাজে ছিলেন তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। যুবোপ প্রবাসেব অভিজ্ঞতার ফলে পাশ্চাত্য আন্দোলনেব ধারার বিচার কবে তিনি ১৯২০ সালেব পব জাতীয় আন্দোলনেব কর্মধাবাব মবো জাম্বুজাতিক শমিক-কৃষক আন্দোলনেব সূত্র বেঁধে দেবাব প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুজাফ্‌ফর আহম্মদ, কালাী সেন, প্যারী দাস ও নীরোদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বন্ধুদের সাথে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর গোপন কক্ষে বসে অনেক বিষয়ে আলোচনা হবাব পর তিনি আমাদের হাতে একটি বিভলভার গুলি ভর্তি অবস্থায় উপহার তুলে দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, গ্রাস ফ্যাক্টরীর অনেক শ্রমিক, তাঁর সহোদররা এবং তখনকার ফ্যাক্টরী-ম্যানেজার আমাদের গতায়াত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, কিন্তু সেন মহাশয়ের চরিত্রগুণে

বিপ্লবের পথে

ঐ সময়ে কোনও সবাদই পুলিশ দ্বারা সমর্থ হয় নেই—এটা তখনকার দিনে কম গোববের কথা ছিল না। বাংলার প্রত্যেক জীবন-কষ্টে বিপ্লবাদের ব্যয়কর। বাঙালি সাথে সাথে পুলিশের গোপন চরদেরও উৎসাহ। বাকি পোষাক, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

ঢাকার বিশিষ্ট বিপ্লবী কাম্বী শ্রমেশ সত্যায় দেউলী বন্দী নিবাস হতে কৃষ্ণ বোগ সন্দেহে চাকরদের দ্বারা গুলি শেল নজরবন্দী হয়ে সিউডী কৃষ্ণ-হাসপাতা। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে প্রেরিত হয়েছিল। বাজনারিক পরিবারে গান জন্ম হয়। গান বড় ভাই দীনেশ ও ছোট ভাই হর্গেশ বিপ্লবী দ্বারা বিশিষ্ট সভ্য ছিলো। শ্রমেশ ছিল ব্যায়ামের ঢাকার বিখ্যাত ব্যায়ামবীর পবেশ নাথের শিষ্য। ১৯২০-২১ সালে যেহেতু অবসরমতে দাখল হয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বিপ্লবের কার্যক্রমে অংশ ন্যোগ দেয়। কৃষ্ণের কবাল থাকলেও সত্যায়ের বিপ্লবের পথ পেরে সময়ে নিতে চায়নি। আমাদের পালকদের পক্ষে পক্ষে অনেক কৃষ্ণাশ্রম থেকে পালিয়ে এসে ভাটস। যখন সন্দেহ প্রকাশিত ভাবে উপস্থিত হলো। চিকিৎসা করা গেল। তখন সত্যায় এসে—আমরা অস্বাভাবিক হয়ে তাকে ফিরাতে গেল। সত্যায় হাস মুখে উত্তর দিল, ‘আমরা বিপ্লবের পথে গিয়েছি। আমরা এসেছি, কৃষ্ণ বোগে ধুবে ধুবে মরবার জন্য আমি মোটেই পশু।’ শ্রমেশের প্রিয় শিষ্য শ্যামবিনোদ পাল, যিনি পূর্বেই অস্বাভাবিক থেকে পালিয়ে এসে আমাদের সাথে যোগদান করেছিল।

বিপ্লবের পথে

দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত খবর পেয়ে ভাটপাড়ায় চলে এসেছে। বহুদিন থেকেই ফেরারী জীবন সে বাপন করে এসেছে এবং পার্টির বহু গোপনায় ও জরুরী কাজের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। স্বভাবে অমারিক, ব্যবহারে মার্জিত, নিঃস্বার্থ, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ, তৎপর শিক্ষিত যুবক—অভিজ্ঞতা তার বৈপ্লবিক কাজের ভিতর শৃঙ্খলা এনেছে। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্তের সাথে তার ঘনিষ্ঠ ফেরারী বন্ধু দেবব্রত দায়ও সিলেট থেকে ভাটপাড়ায় এসে হাজির হলো।

ধনেশ ভট্টাচার্য্য সাংগঠনিক দুর্বলতা, বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রের এবং অর্থের স্বল্পতা অনুভব করে গিদ্ধান্দ করলো, যে, সে তার রাজনৈতিক কর্মস্থান ঢাকায় চলে যাবে এবং সেখান থেকে অর্থ ও অস্ত্রের আংশিক বাবস্থা করে আবার ফিরে আসবে। ব্যবস্থামত সে রাত্রির গুরুকারে গা ঢাকা দিয়ে ঢাকায় চলে গেলো এবং সেখানকার সংগঠনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হলো।

ঢাকার গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যেই খবর পেলো যে ধনেশ ঢাকায় এসেছে এবং সংগঠনের আশ্রয়ে রয়েছে। অতি তৎপরতার সঙ্গে পুলিশ তার জাল বিস্তার করতে শুরু করলো এবং পার্টি সভ্য ও গোয়েন্দা পুলিশের চর হীরালাল চক্রবর্তীর সাহায্যে ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদীর ওপারে সুবুড়া গ্রামে ধনেশকে অতর্কিতভাবে রিভলভার সহ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হ'লো। দুর্ঘটনার সংবাদ আমাদের নিকট শেলের মত এসে পৌঁছোলো।

ঢাকার কর্মীরা ক্ষেপে গেলো। বিশ্বাসঘাতককে চরম দণ্ড দেবার জন্ত তাঁরা প্রস্তুত হলো। হীরালাল জানতো না, যে তার

বিপ্লবের পথে

বিশ্বাসঘাতকতা পার্টির সভ্যবা জানতে পেরেছে। অনায়াসে তাবা তাকে ডেকে নিয়ে গেল, ঢাকা সহরের টীকাটুলী রেল-লাইনেব পাশে এবং সেখানে ছুবিব আধাতে বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দিল। পুলিশ এসে পেলো, মবণোন্মুখ হাবালালকে— মরবার আগে সে অমূল্য বায় ও পবেশ সেনের নাম বলে গেল। বিশেষ আদালতেব বিচারে উভয়েবই প্রাণদণ্ডেব আদেশ হলো। পবে হাইকোর্টে আপীলেব বিচাবে বয়স কম বলে তাদের ফাঁসীব আদেশ যাবজ্জীবন দণ্ডে পবিণত হলো।

রিভলভার বাখাব অশ্রিযোগে ধনেশেব সাত বৎসব সশ্রম কাবাদণ্ড হলো। আমবা হাবালাল পার্টিব নেতৃস্থানীয়দেব মধ্যে একজন বন্ধু ও সাহসী যোদ্ধা। ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের জবাব দেবাব মুখেই বিপথ্য ঘটে গেলো। দুইজন তরুণ বিপ্লবী যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে দেশ থেকে নির্বাসিত হ'লো।

১৯৪৬ সালে মুক্তিব পূব অমূল্য বায় ঢাকাতই বাস করছিল। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক মুসলমান গুণ্ডার দল তাঁকে হত্যা করাব চেষ্টা করলে সে একখানি বস্ত্রমাত্র সঞ্চল ক'রে অতি কষ্টে কলকাতায় চলে আসতে সক্ষম হয়। সহায় সঞ্চলহীন অবস্থায় কঠিন টিউমারোগে আক্রান্ত হয়ে একবকম বিনা চিকিৎসায় কলকাতাব লেক হাসপাতালে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবে। সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশকে স্বাধীন কববাণ কল্পনা নিয়ে ঘর ছেড়ে যে বাইরে এসেছিল, দেশকে স্বাধীন দেখেও অবহেলিত এবং উপেক্ষিত হয়ে চরম দুঃখের ভিতর দিয়ে সে চলে গেলো অমরলোকে।

আঠার

একদিন বিকালের দিকে বেলা গড়িয়ে যাবার একটু আগেই ভাটপাড়া রেল-স্টেশনের নিকটবর্তী একটি সরু পথ ধরে চলবার সময় সামান্য দূর হ'তে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাংলার গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশিষ্ট অফিসার পথের ওপর দাঁড়িয়ে পাটির বিশিষ্ট সভ্য চারু বিকাশ দত্তের সাথে আলাপ করছে। অফিসারটি ছিল আমাদের অত্যন্ত পারচিত। তাকে ঘিরে রয়েছে তার দুইজন সশস্ত্র দেহরক্ষী। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন দমনের কাজে অফিসারটির কুখ্যাতি বিপ্লবী মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল।—নিষ্ঠুর দলন ক্রিয়ার মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা ছিল তার বৈশিষ্ট্য এবং তার জন্ম সরকারী মহলে সে বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তার দেহরক্ষীর ব্যবস্থা। আর কয়েক পা এগোলেই তার সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টির মিলন হবে অনিবার্য। সাক্ষাৎ সময়ে আমরা কি করব ভাবছি—নিরঞ্জন অস্ত্র-সমেত তৈরী। এমন সময় মনে হলো, চারু বিকাশ আমাদের চিন্তে পেরে সজ্ঞীন অবস্থা উপলব্ধি করেছে—সে সমস্ত সত্তা তার টেলে দিল অফিসারটিকে সামনের দিকে ঠেলে নেবার জন্ম। অজস্র কথার জাল বুনে অফিসার ও তার দেহরক্ষীদের একটিবারও পিছন দিকে তাকাবার ফুরসৎ না দিয়ে অল্প এক পথে সে তাদের

বিপ্লবের পথে

নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপস্থিত বুদ্ধি ও চতুরতায় চারু বিকাশ দস্তের দোসর মিল। এক সময় কঠিন ছিল, তারই পরিচয় সে আবার নুতন কবে দিল। ভূজঙ্গের দংশন অথবা মরণ-আলিঙ্গন থেকে অব্যাহতি, কে বলতে পারে? কিছুক্ষণ পর চারু বিকাশ দস্ত আবার সেই পথে ফিবে এসে আমাদের সম্বন্ধনা জানালো। ভাটপাড়া সহবে তাকে সবেমাত্র অন্তরীণ কবা হয়েছে এবং অন্তরীণেব জায়গা ঘিবে পুলিশেব আনাগোনাও শুরু হয়েছে। আমরা সে খবর জানতাম না বলেই তোপেব মুখে হঠাৎ গিয়ে পড়েছি। অবস্থা বুঝে অবিলম্বে ভাটপাড়া কেন্দ্র ছেড়ে দিলাম।

গজ্ঞ-শস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টার সাথে বিক্ষোবক দ্রব্য প্রস্তুতির আয়োজন আমবা শুরু কবেছি। “টি, এন, টি” বোমা, বিষ-গ্যাসের বোমা এবং ধোঁয়া-বোমা বানাবার প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক দবকার। বৈজ্ঞানিক দ্বিভেন রায় তো ডেলে! পালাবাণ সময় তাঁর মৌখিক নির্দেশ ও ফরমূলা জেনে নিলেও তাকে কাষ্যকরা করতে অথবা তার ক্রটি সংশোধন করতে বৈজ্ঞানিকের সাহায্য প্রয়োজন। ঐ সময় আগ্নেয়াস্ত্র বা বিক্ষোবক দ্রব্য বাখ'বার, প্রস্তুত অথবা সংগ্রহ করবার জন্ত যাবজ্জীবন দণ্ড থেকে ফাঁসী পর্য্যন্ত দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই কঠিন সময়ে যাদের ওপর ভরসা করা হয়েছিল, তাঁরা কেউ এগোতে রাজী হল না। আমবা আবার নুতন করে বৈজ্ঞানিকের খোঁজে বের হ'লাম। এ ব্যাপাবেও অনাদি সেন মহাশয় পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং আশ্বাস দিলেন যে তিনি একাজের উপযুক্ত একজন বৈজ্ঞানিককে শীঘ্রই নিয়ে আসবেন।

বিপ্লবের পথে

সেন মহাশয় ছিলেন ভাবের উন্মাদ—বাস্তবিতা মানুষটিকে সত্যরই নিয়ে এলেন।

বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান সাধনা সমাপ্ত হয়েছে—ঝঞ্ঝাবিছুক রাজনৈতিক পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার নির্লিপ্ত স্তরে অন্তপ্রবেশ করেছে পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক কোলাহলের শব্দ,—বিদেশী দাস্তিক রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রের শাসকবর্গের গ্রানিকর অবিচ্ছিন্ন লুণ্ঠন, অবহেলা ও অধমাননার রাশি রাশি ঘটনার কল্লোল! বিজ্ঞান সাধনার ওপর ছড়িয়ে ছিল, তাঁর মনের ক্ষুদ্র হৃদয়। কলকাতার উপকণ্ঠে উন্টাডাঙ্গায় রাত্রির তমিশ্রার ভিতর উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থান মধ্যে সেন মহাশয়ের উপস্থিতিতে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ হ'লো। সক্রিয় সাহায্য করতে তিনি রাজী হলেন এবং তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের একজন মেধাবী ছাত্রের আবশ্যকতার কথা তিনি জানালেন।

রাসায়নিক প্রবাসস্তার ও প্রাথমিক অ'য়োজনের জন্য টিটাগড় রেল-স্টেশনের অনতিদূরে ভদ্রপল্লীর মাঝে ছোট্ট একখানা বাড়ী ভাড়া করা হ'লো। বৈপ্লবিক আন্দোলনের গাণ্বেগ বাড়বার সাথে সাথে দরদী পরিবারের নিহৃত আশ্রয়ের গণ্ডীর বাইরে অনেক কাজই সম্পন্ন করতে হতো ; কারণ বিপজ্জনক রাজত্বোহ বা বড়যন্ত্রমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট আশ্রয়-দাতাদের পরিচয় পেলে যেসব কঠিন সাজার ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণ পরিবারই 'জবাই' হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। এই অবস্থায়ও বাংলার পল্লীতে বা সহরে যাঁরা আশ্রয় দিতেন, তাঁদের সংখ্যা কম ছিলনা।—তাঁরা নিজেদের বিপদের কথা জেনেও পার্টির সভ্য বা সভ্যাদের নিরাপদ

বিপ্লবের পথে

আশ্রয় দিয়েছেন, সংগোপনে অস্ত্রশস্ত্র রেখেছেন, অর্থ সাহায্য করেছেন, এবং বিপ্লবী দলের জরুরী খবর পুলিশের নজর এড়িয়ে গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বা সহবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। ভক্ত পল্লীর মাঝে এই ঘরটিকে পল্লীস্থ লোকের চক্ষে সন্দেহমুক্ত করবার জন্য সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মুখোস পড়ান দরকার বিবেচনা করে পার্টি সভায় পলাতকা শ্রীমতী পারুল মুখার্জিকে খুলনা হতে টিটাগড়ের বাসায় আনবাব ব্যবস্থা হলো।

অনুশীলন দলের কুমিল্লা জেলার সংগঠক অমূল্য মুখার্জি ছিলেন পারুলের বড় ভাই। চট্টগ্রাম অজ্ঞাগার লুণ্ঠন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাথে সাথে অমূল্য মুখার্জি অর্ডিনাল্‌সে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে বক্সা প্রভৃতি ক্যাম্পে বন্দী অবস্থায় থাকেন। পারুল মুখার্জিও তখন হ'তে কুমিল্লা সহরে পুলিশের নজরবন্দী ছিল। ১৯৩৩ সালে নজরবন্দী অবস্থা এড়িয়ে পারুল ফেরারী জীবন যাপন করতে শুরু করে এবং উত্তর বাংলার রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলায় সংগঠনকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে পারুল টিটাগড়ের বাসায় এসে হাজির হলো। পারুলের উপস্থিতির ফলে টিটাগড় বাসাকে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের মতই দেখালো।

জনৈক প্রফেসার বঙ্গুর সাহায্যে এক বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মারফত বহুবিধ রাসায়নিক দ্রব্য ও উপকরণাদি জোগাড় করে এনে টিটাগড় বাসায় রাখা হলো। বিস্ফোরক বিজ্ঞানের পুস্তকাদিও এনে জড়ো করা হ'লো। আরও আনা হ'লো—বোমার খোল

বিপ্লবের পথে

বা মিলস্ বোমার ছাঁচ। বোমার খোল বা দেহটির গায় ৩২ খণ্ডে খাঁজ কাটা ছিল যাতে ফাটবার সাথে সাথে ৩২টি খণ্ড টুকরাই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ধ্বংসের কাজকে ত্রুটিহীনভাবে সম্পূর্ণ করতে পারে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে “টি, এন, টি” বোমাই ছিল ধ্বংসের কাজে অগ্রণী। এর পূর্বে বাংলাব বিপ্লবীরা “অ্যামন পাইক্রেট” জাতীয় বোমাই ব্যবহার করে এসেছে। ১৯১৩ সালে রাজাবাজারে প্রাপ্ত বোমা, (অমৃত বা শশাঙ্ক হাজরাই ছিলেন এই মামলার প্রধান নায়ক), ১৯১৩ সালে শ্রীহট্ট, মৌলবি বাজারে গর্ডনের ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, (ঘটনাস্থলে যোগেন্দ্র চক্রবর্তী মারা যান এবং অমৃত সরকারও তারাপ্রসন্ন বলকে গুরুতর আহত অবস্থায় লালমোহন দে মহাশয় ঢাকায় নিয়ে আসেন), ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এর ওপর নিক্ষিপ্ত বোমা, (বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসু এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন)—এসবই ছিল “অ্যামন পাইক্রেট” তৈয়ারী বোমা। একমাত্র কলকাতা ডালহৌসী স্কোয়ারে ১৯৩০ সালে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর নিক্ষিপ্ত বোমাই ছিল “টি, এন, টি” জাতীয়। কিন্তু বোমার খোল ছিল, এলুমিনিয়াম ধাতুতে তৈরী। শোনা যায়, ধাতুর এই অসম্পূর্ণতার জন্মই বোমা বিদীর্ণ হবার সময় একদিক দিয়ে বের হয়ে যায় এবং তার ফলে পুলিশ কমিশনার টেগার্টের প্রাণ রক্ষা হয় ও নিক্ষেপকারী বিপ্লবী অলুজা সেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে মারা যান এবং বোমার টুকরাতে আহত হয়ে দীনেশ মজুমদার ধৃত হন। বোমার রাসায়নিক মসলা তৈরী

বিপ্লবের পথে

হবার সময় মেকানিজম-এর জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন না হলেও তৈরী হয়ে যাবার পর বিস্ফোরক দ্রব্যের শক্তি অনুযায়ী বোমার খোল ও তার ধাতব গঠন এবং বোমাকে বিদীর্ণ করবার ফিউজ প্রভৃতির জ্ঞান দরকার হবে—একজন উপযুক্ত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এখানে হবিপদ দে'র অভাব আমরা মর্মে মর্মে অনুভব কবেছি।

বৈজ্ঞানিককে সাহায্য করবার জন্য বিজ্ঞান ক্লাসের উচ্চশ্রেণীর একজন ছাত্র দরকার হবে যিনি প্রফুল্ল সেন বরিশাল জেলা সংগঠনে ভিতর থেকে বিজ্ঞান ক্লাসের মেধাবী ছাত্র, সন্তোষ সেনকে কলকাতা সহরের উপকণ্ঠে কোনও একটি মিলন কেন্দ্রে (V কেন্দ্রে) আনবার নির্দেশ দিল এবং তদনুযায়ী অচিরেই সন্তোষ এসে হাজির হলো। সন্তোষের সঙ্গে পরিচয়ে মনে হলো, সন্তোষ হালকা মনের তৈবী মানুষ। তা'র মনের কাঠামোতে গুরু গম্ভীর ছন্দের অভাব। সমিতির প্রারম্ভিক কালে লাঠিখেলা, হসি ও ছোয়া চালনা, দৈহিক ব্যায়াম ও কায়িক পরিশ্রম করাব যে শূনিপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল, যার ফলে বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনে শূন্যস্থান নিয়মানুবর্তিতার ভিতর দিয়ে সামরিক নিয়মে অভ্যস্ত একদল সবল গোষ্ঠীগত মানুষ তৈরী হয়েছিল, পরবর্তীকালে তা'র অবসান ঘটেছিল নানা কারণে। জানবার ও বুঝবার প্রাথমিক উপাদান চলে যাবার পর “মানুষ” বাছাইএর কাজ মনের অসম্পূর্ণ পরিচয়ের ভিতর দিয়েই সম্ভবপর ছিল। দুর্বল ও সবল মানুষের ভেদাভেদ জানবার আর কোন সঠিক নির্দেশ ছিলনা।

বিপ্লবের গথে

ডুবুরী সংগঠক ভিন্ন মানুষ বাছাই শুরু হয়ে দাঁড়ালো। একমাত্র ভবিষ্যৎ ঘটনার অবলম্বনেই মানুষটির সঠিক পরিচয় মিলতে পারে। আমাদের তখন প্রয়োজনের তাগিদ রয়েছে, তাই ভাণ্ডারের তলানী থেকে সন্তোষকে বিজ্ঞানীর সাহায্য-কারী হিসাবে নেওয়াই স্থিতি হলো। তবুও ভবিষ্যতের আশঙ্কার কথা ভেবে বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে যাতে তাব চাক্ষুষ দেখা না হয় অথবা সে যাতে তাঁকে চিনতে না পারে তাব জ্ঞান ঠিক হলো যে আপাদ-মস্তক বহির্বাসে ঢেকে বৈজ্ঞানিক তাব নিঃস্বপ্ন ঘরে কাজ করবেন এবং অতি বিশ্বস্ত কাবও মাধ্যমে “কাউন্টারেব” একপাশ হতে সন্তোষ সেনেব সঙ্গে বাসায়ণিক দ্রব্য বিনিময় অথবা নির্দেশ বিনিময় করবেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতা সহরে কালীঘাটের নিকটে ঘর ভাড়া নেবাব ব্যবস্থাও প্রায় সম্পূর্ণ হলো।

বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি যাবা বাঁচিয়ে বেখেছিলেন বা বাংলার বাইরে যাবা বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি বাঁচাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা কবেছেন তাবা পবম্পবেব মধ্যে যোগাযোগ কববার জন্য খোঁজ করে বেড়াচ্ছিলেন। উক্তব ভারতে বিপ্লবী নেতা *চীন্দ্র নাথ সান্ন্যাল ও যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েব নেতৃত্বে যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল, সেই সংগঠন ফাঁসী বা দ্বীপাস্তবে বহুসংখ্যক সদস্য হারিয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং পববর্জী কালে ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সীতানাথ দে, জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ও সুশীল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তারই সূত্র ধরে তা পুনর্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র উদঘাটনের ফলে জিয়ান সংগঠন আবার ‘মার’ খেয়ে গেলো। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর

বিপ্লবের পথে

লাহোর ছুর্গে অকথ্য অত্যাচারের ফলে তার মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা গেলো এবং ষড়যন্ত্রের মূল আসামী হিসাবে তাকে এবং সীতানাথ দেকে দাঁড় করানো হলো। তবুও শক্ত মানুষগুলি বারবার মার খেয়েও হাল ছেড়ে দেয়নি। সেখান থেকে কেশব প্রসাদ শর্মা এলো সীতানাথ দেকে নিয়ে যাবার জন্তে, আবার যাতে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সফল করে তোলা যায়। উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের সংগঠনের ভার নিয়ে তার যাবার সিদ্ধান্ত হলো।

যুগান্তর দলেব নাম এ পবিচয় দিয়ে শান্তি সেন ফরিদপুর থেকে এসে দেখা করলো। তারা 'কাজ' চায়, কাজের তল্লাসে ব্যাকুল হয়ে যুবে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের সঙ্গে যুক্তভাবে কাজ কবতে তাবা ইচ্ছুক। দলের কৃত্রিম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে আমরাও তখন একাত্রে চলতে প্রস্তুত। শান্তি সেনের সঙ্গে ঠিক হলো, কাজ বা ঘটনাকে (নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে ইংরাজীতে action বলা হতো) সম্পূর্ণ করতে যে নিয়মানুবর্তিতা ও সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা দরকার হবে, তার শিক্ষা দেবার ভার সে নেবে। অস্ত্র চালনা শিক্ষার ভাবও সে নেবে।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষাল ও দেবব্রত রায় জামসেদপুর, রাঁচী প্রভৃতি জায়গায় অস্ত্রের সন্ধান ও সংগঠনের কাজে বের হয়ে গেলো। রাঁচীতে তখন পার্টির পুরাণো বিশিষ্ট সভ্য দক্ষিণ কল্কাতার সুশীল ব্যানার্জি অন্তরীণ ছিলেন। সুশীলের সঙ্গে অতি সংগোপনে নিরঞ্জন দেখা কবতে সক্ষম হ'লে সুশীল তাকে বৈপ্লবিক সৌহার্দ্য জানালো এবং অথ ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য

বিপ্লবের পথে

করলো। যুগান্তর দলের নায়ক শ্রদ্ধেয় বাহুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান উপদেশও সুশীল নিরঞ্জনকে জানিয়ে দিল।

কলকাতার নিকটে বেলঘেরিয়া কেন্দ্রে অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা ও শিক্ষাকার্যের জন্ম সবেমাত্র একটি আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সিলেটের ফেরারী শ্রীতিরঞ্জন পুরকায়স্থ ভাটপাড়া কেন্দ্র থেকে এখানে এসেছে, শাস্ত্র সেনও এখানে রয়েছে। একদিন গভীর রাত্রে শাস্ত্রের সাথে একটি রিভলভারের পরীক্ষা চলেছে। রিভলভারটির ভিতর হতে টোটাগুলি বের করে “টুংগার” টেনে পরীক্ষা করবার সময় পল্লীর নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রচণ্ড শব্দে শাস্ত্রের কপাল ঘেঁসে একটি গুলি বের হয়ে গেল। রিভলভারটির ভিতর যে একটি টোটা রয়ে গিয়েছিল, তা লক্ষ্য করা হয়নি বলেই এই অনর্থের সৃষ্টি হল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় পল্লীর ভিতর গুলির প্রচণ্ড আওয়াজ সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এবং এই ঘটনার অবলম্বনে পুলিশ অচিরেই যে এসে যাবে তাও নিঃসন্দেহ। আমরা তখনই বাসা ছেড়ে যেতে মনস্থ করলাম; কিন্তু ফেরারী বন্ধু মাখন লাল কর সেখানে অতি প্রত্যাষে মাল সমেত আসবে বলে আমরা শ্রীতিরঞ্জনকে রেখে অত্যাণ্ড কেন্দ্রগুলিতে ছড়িয়ে পড়লাম। মাখন লাল করকে বাঁচাবার প্রচেষ্টায় শ্রীতিরঞ্জনকে বলি দিতে হলো। শ্রীতিরঞ্জন তাঁর বৈপ্লবিক কর্তব্য পালন করবার জন্ম একাকী রইল। আমরা শ্রীতিরঞ্জনকে হারালাম।

রাত্রির অন্ধকার মিলিয়ে যাবার আগেই শ্রামবিনোদ, দেবপ্রসাদ সেন ও আমি সাইকেল চালিয়ে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড

বিপ্লবের গাথ

ধরে বেলঘরিয়ার বাস্তায় ঢুকে পড়লাম। চারদিকেই লক্ষ্য করে চলোছ—শীতের কৃয়াশায় দবের দৃষ্টিপথকে খানিকটা অপরিচ্ছন্ন করেছে—সন্দেহজনক কিছুই পথে দেখা গেলনা। অনতিদূরেই বেলঘরিয়াব বাসা। অতি সাবধানে এগোচ্ছি। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছিল, বাসাখানা ভিতর হতে অস্বাভাবিকভাবে অর্গল-বন্ধ—বাইরে কোথাও পুলিশের চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছেনা। কিন্তু সংলগ্ন প্রতিবেশী-গৃহের জানালার ধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটি কূলবধু—উৎকণ্ঠিত তাঁর মুখমণ্ডল। আমাদের দেখে ভিতর দিকে এক পা পিছে হেঁটে হাত নেড়ে বারবাব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে—সামনে এগোতে বারণ করার ইঙ্গিত। বুঝতে দেবী হলো না, যে পুলিশ রাত্রিতেই এসে বাসা ঘেরাও করে শ্রীতিকে ধরেছে এবং তারপর দবজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে ভিতরেই ওত পেতে বসে রয়েছে, আরও শিকার ধরবার আশায়। যদিই কেউবা অজ্ঞান পাব হয়ে দবজা ধাক্কা দেয় বা শ্রীতিকে ডাক দেয় তবে সজ্ঞান চড়িয়ে ও গুলি ভর্তি রাইফেল নিয়ে ভিতরে যারা অপেক্ষা করছিল—বাজালা, গুখা, পাঠান বা হিন্দুস্থানীর দল—তারা সবাই ছুটে এসে তাকে “সামরক” অভ্যর্থনা জানাবে।

অভ্যর্থনার পূর্বেই আমরা সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছি। কূলবধুর ইঙ্গিত বার্থ হলো না। তাড়াতাড়ি পল্লীর ছোট্ট একটি বাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই মাখন করকে পথের ধারে ক্লান্ত দেহ ও মন নিয়ে বসে আছে, দেখতে পেলাম। মাখন করের নিকটও একই অভিজ্ঞতাব বর্ণনা পেলাম—সংলগ্ন গৃহেব জানালা

বিপ্লবের পথে

ধবে দাঁড়িয়ে কুলবধূর ইজিত। প্রায় এক বৎসর পর পুলিশ গুপ্তচরের মুখে জানতে পেরেছিলাম যে বেলঘরিয়া-বারাকপুৰ ট্রাঙ্ক রোডের সংযোগ স্থলে সশস্ত্র এক পুলিশেব দল আমাদের জ্ঞাত আড়ালে অপেক্ষা করছিল কিন্তু ধান্মিক মুসলমানের মত গোঁফ ও দাড়ি বেখে এবং মাথায় পট্টি বেঁধে দ্রুত বের হয়ে যাবার জ্ঞাত তারা চিনতে পারে নি এবং সাথের অপর বন্ধুদের—শ্যাম বিনোদ ও দেবপ্রসাদ সেনগুপ্তকে চিনবার লোক নাকি সেখানে ছিল না। ঘটনার পর বাইশ বছর কেটে গেছে, কিন্তু সেই বাংলা মায়ের কুলবধূর গৃহের জানালা ধবে দাঁড়িয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করার ছবিখানি আজও মন থেকে মুছে যায়নি।

বোমা তৈরীর ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমরা অস্ত্রের জ্ঞাতও জোর সন্ধান করে বেড়াচ্ছি। যে-সব পরিকল্পনা করা হয়েছে, পর্যাপ্ত অস্ত্রের সংস্থান ভিন্ন তা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। একটি বিশেষ পরিকল্পনায় তখন আমরা মন দিয়েছি।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বাংলা ও ভারতের সর্বত্র প্রতিহত হয়েছে, অধিকাংশ সময়ই বিশ্বাসঘাতকতার বালুচরে। বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগ নিখুঁত নিপুণতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকের দল সৃষ্টি করেছে। পার্টির ভিতরকার এই বিভীষণদের খোঁজ রাখত—বাংলার গোয়েন্দা-বিভাগের সর্বময় কর্তব্য। এদের গোপন খাতায় অথবা এদের মনের চোরা-কুঠুরিতে বিশ্বাসঘাতক দেশজোহীদের নামের ফাঁরিস্ত থাকত। এই সময় বিপ্লব আন্দোলনের শায়েস্তাকারী নায়েব ছিল, রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদার। রায় বাহাদুরের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা এই পদ

বিপ্লবের পথে

অলঙ্কৃত করে গেছে তাদের অনেকেই বিপ্লবীদের অগ্নি-মালিকার মুখে প্রাণ হাবিয়েছে। গোয়েন্দা-কর্তা বসন্ত চাটার্জি ১৯১৬ সালে বলকাতার সদর বাস্তাব ওপর বিপ্লবীদের আক্রমণে নিহত হয় (কুমিল্লাব শ্রীঅতীন্দ্র মোহন বায় আক্রমণকারীদের মধ্যে অগ্রতম বলে পরিগণিত)। গোয়েন্দা-কর্তা ভূপেন চাটার্জি দক্ষিণেশ্বর বোমাব মামলায় দীর্ঘ দণ্ডদেশ-প্রাপ্ত চট্টগ্রামের প্রমোদবঞ্জন, নদীয়ার অনন্তহবি, বাঁবেন বানার্জি ও তাদের অণু দুই বন্ধু কর্তৃক কলকাতা আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে ১৯২৫ সালে নিহত হয়। প্রমোদ-অনন্ত দেশদ্রোহিতার প্রতিশোধে জীবন দানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত বেখে গেলো।

গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তাদের অনেকেই তখন জ্যোতিষী ও গুরুব আশ্রয় নিতে দেখা যেতো। জ্যোতিষী ও গুরুতে মিলে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে ভাগ করে নিত। বিপ্লবীদের আক্রমণে তাদের জীবন-দাপ হঠাৎ নিভে যেতে পাবে এই ভয়ে প্রচুর সিপাহী শাস্ত্রী ব্যবস্থা কবেও তাবা নিবাপদ বোধ কবত না—তাই গুরু গৃহে তাদের আগমন ও আশীর্বাদের ব্যবস্থা। পার্টির কোনও সভা মাংসাত খবর এলো, দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে গুরুব কোনও এক বিশেষ আস্তানায় গোয়েন্দা-কর্তার গোপন যাতায়াত রয়েছে। স্থানটিরও সন্ধান পাওয়া গেল এবং সশরীরে তাকে ধর আনবার প্ল্যান হলো। তাকে পেলে বাংলার দেশদ্রোহীদের অনেক বড় চাঁইদের খবর পাওয়া যাবে। দরকার হলো, যথেষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র এবং উপযুক্ত ও সাহসী লোক। আমরা তাব জুড়ি উঠে পড়ে লাগলাম।

উনিশ

বেলঘরিয়ার ঘটনা আসন্ন দুর্ধোগের ইঙ্গিত। শক্তি সমাবেশেব মাঝখানেই বুনিয়াদেব ভিত্তি যেন খসে যাচ্ছে। সংগঠকরা কোনও না কোনও ভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ধনেশ ও শ্রীতিকে হারালাম।

টিটাগড় বাসাটি একান্ত পল্লী মন্ডো, লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবুও সন্দেহ এসেছে। বন্ধুরা একদিন সন্দেহজনক একটি লোককে দেখতে পেয়ে তাকে অনুসরণ করলো, কিন্তু সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পাবল না। বাসাখানি ছেড়ে দেবাব কথা হলো কিন্তু অনেকের ধারণা সন্দেহ তেমন গুরুত্ব নয়।

প্রফুল্ল সেন সবে মাত্র কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সংগঠনের ভার নিয়েছে। গজার ধাবে খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রের অদূরে ব্যারাকপুর ট্রান্স বোর্ডের নিকট পল্লী-বাসীদের একটি খেলার মাঠকে রাত্রিবেলায় কিছুদিন যাবত মিলন-কেন্দ্র হিসাবে আমরা ব্যবহার করে আসছি—সেখানে সেদিন দু'এক জন বন্ধুর আসবার কথা। শ্রামবিনোদকে সঙ্গে নিয়ে আমি ও প্রফুল্ল রওনা হয়ে গেলাম। রাত আটটার সময় আমি ও শ্রামবিনোদ খড়দহ আশ্রয়-কেন্দ্রে ফিরে এলাম—মাখন কর, সুধাংশুবিমল এবং আরও দু'এক জন ফেরারী বন্ধু সেখানে আছে। প্রফুল্ল রাত দশটার মধ্যেই মিলন-কেন্দ্র থেকে খড়দহ বাসায় চলে আসবে।

বিপ্লবের পথে

আমবা সবাই প্রফুল্লর আশায় বসে আছি। রাত দশটা বেজে গেল প্রফুল্ল এলো না। সওয়া দশটার সময় চিস্তিত হয়ে শ্রামবিনোদ প্রফুল্লর খোঁজে বের হয়ে গেল। এক ঘণ্টা পর হতাশ হয়ে ফিরে এলো—প্রফুল্লর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

প্রফুল্ল ধবা পড়েছে। পার্টির নিয়মানুযায়ী কেউ ধরা পড়ে গেলে তখনই সংগঠনকে বাঁচাবার জন্য জরুরী সাবধানী বাবস্থা অবলম্বন করতে হয় যেন সদস্যের গ্রেপ্তারজনিত কোনও খবরের বলে সংগঠনকে বান চাল করবার সুযোগ পুলিশ না পেতে পাবে। সদস্যের গ্রেপ্তারের জন্য দুঃখ অথবা আক্শোষ করবার সময় কোথায়! এখনই জরুরী কর্তব্য হিসাবে খুলনা গ্রামে চাকরবাল। দেবীর কাছে সুধাংশুবিমল দত্তকে পাঠাবার সিদ্ধান্ত হলো। চাকরবাল। দেবী (ওবফে কাকীমা) প্রফুল্লের নির্দেশমত একটি বন্দুককে তাবই ঘরের মাটির তলায় গোপনে রেখে দিয়েছেন; কাউকেই তিনি এ বিষয় জানতে দেন নি—এমন কি তাঁর স্বামী বিজয়বাবুও জানতেন না যে তারই ঘরে একটি বন্দুক রয়েছে। সুধাংশুকে কাকীমা জানতেন এবং তাকে তিনি বিশ্বাস করতেন। সুধাংশু চাঁটগার ছেলে, পার্টির মধ্যে সকলকিছু কিন্তু বৈপ্লবিক চবিত্তের গুণে সে সবাইর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বহুদিন থেকেই পালিয়ে পালিয়ে সংগঠনের কাজ অভ্যাস নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে সে করে যাচ্ছে। চাকরবাল। দেবীর কাছে গচ্ছিত বন্দুকটি আনবার জন্য রাতেই সুধাংশু একটি লম্বা পাশ-বালিস বিছানার মধ্যে নিয়ে রওনা হয়ে গেল—

বিপ্লবের পথে

বালিশটিব মধ্যে বন্দুকটি ভরে সে দু'তিন দিনের মধ্যেই খড়দহ চলে আসবে।

সুধাংশু চলে যাবার পব বোঝাব ভারে যেন মনটা স্থায় হয়ে বইল। একে একে সাথীর দল অন্তর্ধান হয়ে যাচ্ছে, সেট পাষান পুর্বীর মধ্যে যার বন্ধ চিরে আমবা বের হয়ে এসেছি। প্রতিটি সজাগ-মুহূর্ত্ত আমবা ভবে দিতে চেষ্টা করেছি—বিজ্রোহের আয়োজনে। তাকে সম্পূর্ণ করতে প্রাথমিক অনেক কাজ এখনও বাকী পড়ে আছে কিন্তু আয়োজনের পুনোহিত যারা তাদের সীমিত ভাণ্ডার নিঃশেষ হ'তে চলেছে।

রাত বারেটা—খড়দহ বাসা। সেখানেই রাত কাটাব স্থির করেছি। গ্রামবিনোদকে টিটাগড় বাসায় চলে যেতে বললাম, পাকুল সেখানে একাকী রয়েছে। বন্ধুরা আপত্তি জানালো— খড়দহ-বাসাব মালিক আমাদের আনা গোনা দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে—কোনও মেয়ে না থাকবার কাবণ বারবার করে জিজ্ঞাসা করেছে। বিশেষ কবে প্রফুল্ল সেন নিকটেই ধবা পড়ায় নিরাপত্তার দিক থেকে খড়দহের বাইরে থাকাই শ্রেয় মনে করে তারা আমাকে টিটাগড় যেতে অনুবোধ করলো। প্রত্যাষে সুধাংশুর বন্দুকটি নিয়ে আসবার কথা বললেও বন্ধুরা রাজী হলনা। অগত্যা আমি ও গ্রামবিনোদ টিটাগড় যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

শীতের রাত—তাই আঁট সাট করে পোষাক পরে সাইকেল নিয়ে দুই জনই বের হয়ে পড়লাম। শীতের কন্ কনে হাওয়া গজার বুক থেকে হিমশীতল স্পর্শ নিয়ে এলো—ওপারের বিজলী বাতিগুলো যেন কুয়াসার ঘন আবরণে বন্দী। নদীর বুকে নিঃসীম

বিপ্লবের গথে

অন্ধকারের ছাউনী কুয়াসার ওড়নাকে আপন বন্ধে জড়িয়ে আছে। আমরা সাইকেল বেয়ে চলেছি। গভীর বাত। মাঝে মাঝে দু'এক জন বিবল পথযাত্রীকে আনমনা হয়ে চলতে দেখা যায়।

টিটাগড বেল স্টেশনেব নিকট এসে বেল লাইন পার হয়ে আঁকাবাঁকা বাস্তা ধরে পল্লাব ভিতর পৌঁছে গেলাম। শাস্ত্র পল্লীখানা শাতেব নৈশ-নিস্তব্ধতাব পবিপূর্ণ ছবি নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পল্লী কুটিরগুলিব মাঝ দিয়ে অতি সাবধানে আমরা বাসািব নিকট পৌঁছতেহ পারুল দরজা খুলে দিল— পারুল জেগেই ছিল। পারুল সন্দেহজনক কোনও লোকেব যাতায়াত সেদিনও লক্ষ্য কবেনি। আমরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম—তখন বাত একটা।

সকাল চারটায় উঠেছি। দেবপ্রসাদ ও নিরঞ্জনব সঙ্গে জগদলে ছয়টার সময় দেখা হবাব কথা। বোজকার মতই স্নানাদি সেরে তৈরী হয়ে আমি ও শ্যামবিনোদ সাইকেল হাতে নিয়ে দরজা খুলতে গিয়ে এনে হলো, বাইব থেকে সজোবে দরজা ঠেলে ঢুকবার জন্য কাবা যেন চেষ্টা করছে আগন্তুকরা পুলিশেব দল। শ্যামবিনোদ বুঝতে পেবেই এাদেব ঠেলে দিয়ে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। গোলমালের এক কানে যেতেই পারুলও এসে হাজির হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও শ্যামবিনোদ গৃহেব একতলা ছাদে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। পারুল ও লাফ দিয়ে ছাদে উঠে পড়েছে। অন্ধকাবের ঘোব তখনও কাটেনি। কুয়াশা ও অন্ধকাবের আবছায়াব ভিতর দেখতে পেলাম, বাসাখানাকে চাবদিক হতেই পুলিশ ঘেবাও কবে রেখেছে তিল মাত্র কাক

বিপ্লবের গথ

তার কোথাও নেই—আব অদূবেহ কোতুহলী পল্লীবাসী জনতার ভিড়। শ্রামবিনোদ রিভলভার হাতে নিয়ে ছুঁবল স্থানের সন্ধান করে বেড়াচ্ছে, এবং পাকল তাকে সাহায্য কবছে। গুলি কববার অল্পমতি চাইলো। সব দিক দেখে সিদ্ধান্ত করলাম—গুলির ব্যবহার এখানে কোতুক মাত্র। পুলিশের বেষ্টনা ও মূর্থ জনতার ভিড়কে চূর্ণ করে দিতে রিভলভারের গুলি অসমর্থ—যাবার পথ নেহ। আমবা বন্দী হয়ে পড়েছি। বিভলভাবটি এখন আমাদেরই জীবন নাশ কবতে উত্তত। সঙ্গে পেলই অনিবার্য ফাঁসী দড়ি নেমে আসবে একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্ত। শ্রামবিনোদেব হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রিভলভারটি দূবে নিক্ষেপ কবে দিলাম। তাবপব অন্ধারবের মধ্যে, শত্রু-বুয়েব মাঝখানে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়লাম—আমি ও শ্রামবিনোদ। পাকল ইতিমধ্যে কি যেন ভেবে ছাদ থেকে হৃদয় হয়ে গচে—উঠোনে লাফ দিয়ে পড়ে সে ঘবেব দবজা বন্ধ কবে দিচ্ছে।

শ্রামবা বাইবে পড়বার সাথে সাথে অসংখ্য লোক যেন আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পুলিশের হাতে আমবা বন্দী—জনতার উরসিত শুব কানে বাজছে।

ইতিমধ্যে দবজা ভেঙ্গে পুলিশ ঘবে ঢুকে দেখতে পেল, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিব সামনে দাঁড়িয়ে—এক বিদ্রোহী নাবী। পাকল মূল্যবান কাগজগুলোকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ত আগুনে নিক্ষেপ কবে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। পাকল গ্রেপ্তার হলো। বোমার রাশিকৃত মালমসলা, সামরিক কিতাবাদি, অর্ধ-দক্ষ কাগজ, ভাষ্য সবই পুলিশ সংগ্রহ করলো। প্রতিবেশী

বিপ্লবের পথে

মেয়ে পুরুষেব সাক্ষী সাব্দ সংগ্রহ করে পারুলকে নিয়ে
বের হয়ে এলো ব্যারাকপুরের ইংরেজ পুলিশ-সাহেব। টুপি
উঁচু করে পারুলকে সম্মান দেখিয়ে, সে চলে গেলো। বিদ্রোহী
নারীর প্রতিও সম্মান দেখাতে এঁরা কুষ্ঠিত হয় না—পদানত
জাতির নিম্ন-মানদণ্ডের অপকৃষ্ট অংশের সাহায্যে অত্যাচারের
ব্যবস্থা ক’রে নিজেদের শালীনতা এঁরা রক্ষা করে।

সকাল সাতটা—টিটাগড় থানায় আমরা বন্দী। শ্যামবিনোদ
ও পারুলকে ধানার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখেছে। টিটাগড় থানা
সরগরম হয়ে উঠেছে—পুলিশের অফুরন্ত আনাগোনা। তিন তিনটি
ফেরারী আসামীকে একযোগে ধরবাব জন্তু বাংলার পুলিশের
বাহাদুরীর অশ্রুদার জুটেছে টিটাগড় বাসাখানার প্রতিবেশী ও
প্রতিবেশিনীর দল।

বিদ্রোহীর জীবন ইংরেজ রাজশক্তি নিকট প্রতি মুহূর্তেই
সংশয়াকুল! তবুও তা গৌরবের—অপমানের জ্বালাবোধ তাতে
নেই। কিন্তু দেশা লোকের হাতে বন্দীদশা—অপমানের ও ছুঁখের।
মনে হলো, যেন গীতা দেবীর আকুল প্রার্থনার মত ধরনী দ্বিধা
হলে এ মর্যাদাসিক জ্বালাবোধ থেকে মুক্তি পেতাম অথবা কোনও
অশরীর শক্তির সাহায্যে এত নিকট অংশকে সমূলে উৎখাত করে
দিতে পারলে জাতির বীহ্যবান অংশকে জিইয়ে রাখতে পারতাম।
কবির মানস ঝঞ্ঝায় জেগেছিল স্বপ্ন—“এমন দেশটি কোথাও
খুঁজে পাবে নাকো ভূমি—এ মানার জন্মভূমি”। সেই দেশ তখনও
জন্মায়নি।

বিপ্লবের গথে

কলকাতা থেকে অফিসারদের আগমন শুরু হলো। রায়বাহাদুর নলিনী মজুমদার ও বনবিদ্যা মুখার্জি গরাদের বাইরে থেকে আমাদের দেখতে এলো। চোগেন ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল অসংখ্য অফিসারদের সানানোনা। শুধু যেন চোখটাই খোলা ছিল, মনটা গোথায় যেন গলেয়ে গেছে। আমি নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে গবাদেব ভাবে বসে বহলাম, মাঝারিন একই অবস্থায় কেটে গেলো। নেউ কোনও প্রশ্ন কবেনি। ধানার দারোগাটি ছিল মাক্তব চর্চিন! গভীর প্রশান্তি দেখে বোধ করি আমার মনের আলোড়ন বুঝতে পেরেছিল—প্রশান্তি ভাঙ্গবার চেষ্টা সে করলো না।

সন্ধ্যার সময় পর পব খান তিন টার সশস্ত্র গাড়ী এসে হাজির হলো, নিয়ে যাবার জন্য। বাছাই-করা গোয়েন্দা অফিসারের দল গাড়ীর সঙ্গে এসেছে। গাবদের সামনে এসে দাঁড়াতে আমার যেন সম্বিত যাবে এলো। মনের কৌতুহল বেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম—দারোগা যাবার জন্য আস্তান জানালো। পাকলকেও নিয়ে এসেছে, শ্যামবিনোদও এলো। গাড়ীতে উঠবার সময় পাকল বলল, দারোগাটি এ পর্যন্ত ভাল ব্যবহারই করেছে—স্নান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

একই গাড়ীতে আমরা যাচ্ছি—সশস্ত্র সিপাহী আর গোয়েন্দা-অফিসার দিয়ে গাড়ীখানা ভর্তি—প্রত্যেকের দুই পাশেই দুইজন করে সিপাহী। অচ্যুত সশস্ত্র গাড়ীগুলি পিছু পিছু অনুসরণ করছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুর শিবিরে আমরা উপস্থিত হব। শিবিরের পরীক্ষা আমার বক্তব্য হয়েছে কিন্তু

বিপ্লবের পথে

শ্যামবিনোদ ও পাকুলের পক্ষে তা নূতন, তাই এদের সাবধান করা দরকার। চেষ্টা করতেই পুলিশ অফিসারটি প্রাণপণে বাধা দিল, চেষ্টামিটি স্বরূপ করলো, শেষ পর্যন্ত মারের ভয় দেখালো, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। বলে যেতে লাগলাম--“এরা যাই বলুক না কেন, যত প্রলোভন দেখাক না কেন, এদের একটি কথারও জবাব দেবেনা। এদের হাজার উৎসাহের মুখে, এদের বন্দরতার চাপে, এদের কৃত্রিম ভালবাসার কথায় বা দেশাত্মবোধের প্ররোচনায় একমাত্র নিজের পরিচয় ভিন্ন আর কোন খবরই দেবেনা।” অনেকবার বাধা পেলেও কথাগুলি বলে যেতে সমর্থ হলাম। আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে আমার বন্ধুবা পুলিশের অত্যাচারের কাছে কোমর বেঁধে যেন দাঁড়াতে পারে। পাকুল ও শ্যামবিনোদের মনের ভিতর ঝড় বইছে। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের গায় তাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে গেছে—এই হতাশার সুযোগ পুলিশ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে পুলিশ বীজাগুর মত মনের মধ্যে প্রবেশ করে তাদেরই হাতের ‘পুতুল’ বানাবার চেষ্টা করবে। আমার সাবধান বাণী শেষ হতেই গাড়ী চলে এলো কলকাতা—লালবাজার থানায়। আমাকে লালবাজার বেথে, পাকুল ও শ্যামবিনোদকে নিয়ে গাড়ীখানা অগ্নিত্র চলে গেল।

গাড়ী থেকে নামবার সাথে সাথে হাত ছুঁখানায় শিকল পরিয়ে দিল! সারিষক সার্জেন্ট ও সিপাহী বাহিনীর মধ্য দিয়ে লালবাজার কয়েদখানার দ্বিতল গৃহে আমাকে নিয়ে গেলো। পবিচিত সার্জেন্টের দল আশে পাশে, তারা অনেকেই আমাকে

বিপ্লবের গণে

শুভেচ্ছা জানালো। কিন্তু একদল সার্জেট মনের ঝাল মিটাবার জন্য বিপ্লব ইংরেজী ভাষায় (ইতর ভাষার গালিকে আমরা 'বিপ্লব' বলে নিজেদের মধ্যে বর্ণনা করতাম) গালি দিতে শুরু করলো। তাতেই আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য আমি প্রতি-গালিবর্ষণ শুরু কবলাম। আমাকে মাঝবাকের জন্য ওরা এগিয়ে আসতেই সার্জেট-ইন্-চার্জ ইমপেক্ট-এটি দৌড়ে এলো এবং ইতরগুলিকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই আমার দরজার কাছে বসে রইল। এক পেয়ালা গবম চা ('ব্র্যাক-টি') দিতে চাইলো ; ধন্যবাদের সাথে তা ফিরিয়ে দিলাম।

হাতের শিকলটি খুলে দিয়েছে। দ্বিতলের বৃহৎ কামরাটির মধ্যে আমিই একক লালবাজারের বাসিন্দা। মেঝের ওপর একখানি কম্বল পাতা ছিল। নিজের গরম চাদরখানা গায়েন ওপর টেনে দিয়ে নির্বাক, নিস্তব্ধ, জড়পাশের মত তাবই ওপর পড়ে রইলাম।

মাঝে মাঝে দলজা গোলাব শব্দ কানে ভেসে আসছে। পরিচিত গোয়েন্দা অফিসার দুই এক জন এসে নিঃশব্দেই চলে গেলো। প্রাণের ভিতর চলেছে ঝড়ের দোলা। ব্যর্থতা ও পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানিবোধ যেন পৌরুষকে খর্ব ও চূর্ণ করে দিয়ে অট্টহাস্তে বিদ্রূপ করেছে। অপরাধেয় আদর্শের বাহক আমরা! আমাদের বীধ্যাবান পূর্ব পুরুষরা পর্বত প্রমাণ ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ভারতকে স্বাধীন করবার আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন, গভীর অন্ধকারের ভিতর। তাঁদেরই পদাঙ্ক আমরা অনুসরণ করে চলেছি। মন আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালো। পরাজয়ের সোপান বেয়ে সার্থকতায় পৌঁছবার চেষ্টা করবো।

কুড়ি

পর্যায়ীনতাব শৃঙ্খল যাবা ভাঙতে চায়, জেলের শৃঙ্খল বরণ করে নেবার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হয়। লালবাজাবের পুলিশ হেফাজত থেকে পরেব দিন সকাল বেলায় আমাকে প্রেসিডেন্সী জেলে পাঠান হলো। সেখানে সঙ্গে সঙ্গে এলো—শৃঙ্খলের সুবিধি বন্ধন। লোহার বড়ি পরিয়ে পা দুটোকে এঁটে দেওয়া হলো। দীর্ঘ কয় বছর তারা আমার পায়ে জাঁড়িয়ে ছিল। বন্ধনের কদর্যা-কাদায় এর আগেও গতি হারিয়েছি, সে বন্ধন ছিল সাময়িক। এবারের এই বন্ধন হলো দীর্ঘস্থায়ী—পীড়নের ক্ষেত্র শুধু মন নয়, সাবা দেহটাকে ঘিরে।

থাক্‌বাব জন্য স্থান নির্দিষ্ট হলো—জেলের সুরক্ষিত ‘৪৪’ ডিগ্রী। নানা প্রকার সতর্কতার ব্যবস্থা হলো। ডিগ্রীর হিন্দুস্থানী সিপাহীদের উপর নতুন করে আরও এক প্রস্থ হিন্দুস্থানী ডবল গার্ডের সঙ্গে ইংরেজ সার্জেন্টদেরও গার্ড বসলো। ডিগ্রি ও উপ-ডিগ্রীর ছোট আঙ্গিনাটুকু ভেতরেই স্থান খাওয়া প্রভৃতির বন্দোবস্ত হলো এবং তত্ত্বাবধানের জন্য যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বিশালকায় ও বলিষ্ঠ এক পাহাড়ী পেশোয়ারী কয়েদী পাহারাদারকে আমদানী করা হলো। সকাল থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত ডিগ্রী ও আমার দেহটিকে ঘিরে তল্লাসী যেন লেগেই রইল।

বিপ্লবের পথে

ভাবতেন পশ্চিম প্রান্তে আফগান সীমান্ত রেখায় হুভেস্ত “ডুরাণু লাইন” ইংবেজেব সাম্রাজ্য বিস্তারকে রুখে দিয়েছিল। ডুরাণু লাইনের কোলে গিরিমালার বুকে পব্বতের মত দেহ ও মন নিয়ে যার জন্ম হয়েছিল তাব পক্ষে হুকুমের তাবদার হয়ে নিরীহ মেঘ-শাবকের মত জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য। একদিন সার্জেন্ট-জমাদারের হুকুম মাসিক কাজ করতে পেশোয়ারী পাহারাদারটি অস্বীকার কবলো। তাকে ওবা তিরস্কান করে মারের ভয় দেখাতেই সে ডিগ্রীর সামনেকার ছোট আফগানটুকুতে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে মুখ ফিবিখে আল্লাহ্‌র নান জপ্তে শ্রুত করলো এবং প্রার্থনা জানালো “খোদা হামকো গোস্তাসে বাঁচাইয়ে। হামারা ছোট ভাই গোস্তাসে আদমকো মারকে কালাপানীমে ফাঁসী চলা গয়া।” এইভাবে সে তার মেজাজ ঠাণ্ডা কবতে চাইলো, যেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে তাব দেহের প্রচুর শক্তির অপব্যবহার কবে কোনও অঘটন না ঘটিয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষ তখন তাকে পাহারাদারীর কাজ থেকে বরখাস্ত করে জেলের অশ্রুত সবিধে দিল।

তারই জায়গায় এলো—বরিশাল নিবাসী দীর্ঘ দাওয়াজ্ঞা প্রাপ্ত একটি মুসলমান কয়েদ-পাহারাদার। মুসলমান পাহারাদারটি দূর থেকে সব রকম সাবধানী ব্যবস্থাগুলি লক্ষ্য করলো এবং যাতে সিপাহী সার্জেন্টবা তাকে কোনও ভাবেই সন্দেহ না করতে পারে তার জন্য ডিগ্রী থেকে দূরেই আমার স্নানের জল ও খাবারের থালা রেখে যেতে লাগলো। পাহারাদারটির চলাফেরার মধ্যে যেন একটি শক্ত মানুষের ইঙ্গিত পেলাম। অনুমানে মনে হলো,

বিপ্লবের গাথ

ওর গলায় “থোপব”* বানানো বয়েছে এবং সতর্ক চলাফেরা এবং বিনয়-নম্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সে “থোপবটিকে” বাঁচাতে চাচ্ছে। একদিন সুরোগমত উপস্থিত সিপাহী সার্জেটদের অলঙ্কিতে তাব সঙ্গে চোখেব ইশাবায় ভাব বিনিময় হলো। সে সাহায্য কবতে বাজী হলো। ইশারায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে চাব পাঁচ ইঞ্চি পনিমাণেব সামান্য এক টুকরা সাদা কাগজ ও ছুই ইঞ্চি পনিমাণেব পেন্সিলেব ভিতবকাব এক টুকরা শীষ বাজবন্দা-বন্ধুদেব থেকে এনে আমাকে পৌঁছয়ে দিতে হবে। বিনা বিচারে আবদ্ধ বাজবন্দাবা তখন প্রেসিডেন্সী জেলেব একাংশ ভাবে নেখেছিল। কড়াগড়ি ব্যবস্থাব জন্তু তাঁদেব সাথে গোপন সম্পর্ক স্থাপন কবা এক বকম অসম্ভব ছিল। তিন চাবদিন পব খাবাবেব থালা বাথবার সময় একটি আঙ্গুল বাজিয়ে সে চলে গেল। সাবধানে খাবাব খেলাম কিন্তু খাবাবেব ভিতর কোনও জাখগাই ঈপ্সত ভিনিষটি পাওয়া গেল না। কিন্তু গবাদেব বাইবে থেগে হাত বাডয়ে থালা নবাব সময় ছুটি আঙ্গুলেব মাঝখান থেকে বানো সূতায় জড়ান এক টুকরা জিনিষ সবাইব অলক্ষ্যে সে গলায় দিল। সিপাহী-সার্জেটদেব প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ পর খামি টিকবাটি উঠিয়ে আঙ্গুলেব মাঝখানে চেপে বেখে দিল'ম। ঠাগজ ও পেন্সিলেব শীষ পাওয়া গেল। বাজবন্দা বন্ধুদেব সাথে যোগাযোগ স্থাপন হলো।

গলনালীতে খপোপচাবেব সাহায্যে অথবা সূতায় বেঁধে শীষ দিয়ে কয়েদীবা নিষদ্ধ জিন্যত সাজাশীষ বাহরে বাথবার জন্তু যে ছোট গর্ত করে নেয়—তাকেই থোপব বলা হয়।

বিপ্লবের গথে

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের জন্তু আবার সেই আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালের সামনে আমাকে হাজির করা হলো। বন্ধুরা ও আমাদের কৌশলী সবাই আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেপ্তারে মর্শ্বাহত। তাঁদের চোখ মুখে বেদনা পরিস্ফুট। পরাজয়ের গ্লানিবোধ তাদের অন্তরকে মথিত করে বিচারের আসন্ন রায়কে অর্থহীন কবে তুলেছে। সামান্য মাত্র কথার বিনিময় হলো। পুলিশ ও পাবলিক প্রসিকিউটোরের দল 'শিকার' দেখে মহাখুশি' যেন তারা আবার নূতন কবে জীবন ফিরে পেলো। বিচারপতি জেমসন্ সাথেব আমাকে খানিকটা বিস্ময় ও আগ্রহের সঙ্গে দেখে বিচারে মন দিলেন। পুলিশের নির্দেশের মাতা বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জন ঘোষালও ধরা পড়ে কোর্টে হাজির হলো। নিরঞ্জনকে বিশ্বাসঘাতক পাটি সভ্য বাঁকুড়ায় ধরিয়ে দিয়েছে। তাঁর সঙ্গে ধরা পড়েছে জীবন দে।

কিছুদিন পর সীতানাথ দেও প্রায় একই অবস্থায় এসে হাজির হলো।

আমাদের গ্রেপ্তারের পর সারা দেশব্যাপী যে ব্যাপক তল্লাশী শুরু হলো, তাতে আশ্রয়-কেন্দ্রগুলি সরাসরি ত্যাগ করে ফেরারী বন্ধুরা দরদী পাটি-সভ্যদের নিকট আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সংগঠকদের অনেকেই ধরা পড়ে যাওয়ায় ভালমন্দ বিচার করবার সুবিধা তাদের ছিল না। সহজেই তারা পুলিশের খপ্পরে পড়ে গেল। নিরঞ্জনকে যে ধরিয়ে দিয়েছিল, তার

বিপ্লবের গথে

নাম ধাম সহ বাজবন্দীদের জানিয়ে দিলাম যেন তাবা ভবিষ্যতেব
জন্ত সাবধান হতে পারে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিচার শেষ হ'তে চলেছে।
অল্পশীলন সমিতির সাবা ভারতবাসী বৈপ্লবিক গুপ্ত-সংগঠনের কথা
উল্লেখ কবে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাব ষড়যন্ত্রেব কথা, বিভিন্ন ঘটনাবলীর
উল্লেখ, সাক্ষা সাবুদেব দায় ফিবিাস্ত, প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও
বিস্ফোরক দ্রব্যাদিব বিবরণ, বিভিন্ন প্রদেশেব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাব
সাথে সম্পর্ক এবং ষড়যন্ত্রেব জন্ম-বহন সব একে একে উদ্ঘাটন
কবে ষড়যন্ত্রেব গভীরতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে পাবলিক প্রসিকিউটাব
ট্রাইব্যুনালকে বোঝাবান চেষ্টা কবলো।

ষড়যন্ত্রেব জন্মস্থান,—কলকাতাব প্রেসিডেন্সী জেল ও বক্সাভূগ,
১৯৩০-৩১ সাল। বিদ্রোহীরা বন্দা অবস্থায় সেখানে জমায়েত।
প্র্যান-মাফিক পলায়ন-পবিকল্পনা বচনা—প্রভাত চক্রবর্তী
ও পবেশ গুহেব অন্তর্ভুক্ত থেকে পলায়ন, বক্সাভূগ হতে জিতেন
গুপ্ত ও কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী পলায়ন, অনিল দাশগুপ্তেব অন্তর্বাণের
পথে পলায়ন - ষড়যন্ত্রেব প্রথম অধ্যায়।

ষড়যন্ত্রেব বহিঃপ্রকাশেব পমাণ হিসাবে উপস্থিত করলো—

ঝবিয়া ডিনামাইট মামলা—বল সংগাক ডিনামাইট “প্লিক”
সেখানে পাওয়া যায় এবং পাটির বিশিষ্ট ও পুরানো সভ্য
শ্রীপ্রমথ নাথ ঘোষ ও জ্যোতির্দ্বয় বায় সাত বৎসব কাবাদণ্ডে
দগ্ধিত হয়।

কলকাতাব মির্জাপুরে ডিনামাইট প্রাপ্তিেব মামলা—এখানে
আন্তর্মানিক বাবো শত ডিনামাইট “প্লিক” ও কিউজ প্রভৃতি

বিপ্লবের গল্প

পেয়েছিল। পার্টির বিশিষ্ট সভা ফরিদপুরের শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বানার্জি এই মামলায় সাত বৎসর কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কলকাতায় “ছোট খাট একটি অজ্ঞান আবিষ্কারের” ফলে মামলা—বহুসংখ্যক অস্ত্র (চৌদ্দটি বিভালভাব সমেত অগ্নি-জিনিষ) এখানে পাওয়া যায় এবং পার্টির পুর্বানো সভা শ্রীরাধাবল্লভ গোপ এই মামলায় চৌদ্দ বৎসরের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

চবপাড়া ডাকাতির মামলা—এই মামলায় নরেন্দ্র পসাদ ঘোষ, সভা রঞ্জন ঘোষ “শশা ভট্টাচার্য্যকে দাঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

আগরতলা ডাকাতির মামলা—কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী এক্সা দুর্গ থেকে পালিয়ে এসে এই মামলায় সাত বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

জলপাইগুড়ি অস্ত্র-প্রাপ্তির মামলা—এই মামলায় প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর সাত বৎসর কারাদণ্ড হয় কিন্তু জলপাইগুড়ি জেল থেকে বাজসাহী জেলে স্থানান্তরিত কববার সময় পথেই মাঝখানে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে সে পাল্লাতে মগ্ন হয় কিন্তু পরে সে হিলি-ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে।

উটি-বাক্স লুটের মামলা (মাজাজ) এই মামলায় রোশন সিং, হাজারা সিং, খুসীরাম মেহতা ও শম্ভু নাথ আজাদেব দশ বৎসর করে সাজা হয়।

এরা সবাই পাঞ্জাব ও দিল্লীর সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল।

বিপ্লবের গথে

মাদ্রাজ বোম্বা বিদ্বেষবণের মামলা—এই বিদ্বেষবণে পাটি সভা ভেঙে বরণ মাঝা মাঝা এবং এক জনের দণ্ড হয়।

বন্দ্যাস ডাকার্তি—বাবেন্দ্র চন্দ্র দে বৃত্ত হয়। প্রাথমিক বিচারে তাঁর চৌদ্দ বৎসব সাজা হয় (পরে আপীলে খালাস পেয়ে বিনা বিচারে বন্দা থাকে)।

লিউক-শুটিং মামলা—ভোলা বায় সাত বৎসব কঠোর কাবাদের দণ্ডিত হয়।

হিলি ডাকার্তিব মামলা—এই মামলায় বিশেষ আদালতের বিচারে চাবজন ফাঁসীর ভকুম হয়, তিন জনের যাবজ্জীবন দণ্ড, তিন জনের দশ বৎসব, তিন জনের সাত বৎসব কাবাদের দণ্ড হয়। পরে হাইকোর্টে চাবজনের মৃত্যুদণ্ড যাবজ্জীবন দণ্ডে পরিণত হয়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য, সত্য চক্রবর্তী, সর্বোজ বসু ছিল ফাঁসীর আসামী, এব মাবদল কাদের, পঞ্চুল সাম্মাল, বিনয় দে ছিল যাবজ্জীবন দণ্ডের আৰ বিজয় বানার্জি, বামকৃষ্ণ সৰ্কার, হবিপদ বসু ছিল দশ বৎসবের জন্ত দণ্ডিত আসামী।

সাক্ষেতক ভাষায় লেখা বহু চিঠিপত্র—অর্থ উদ্ধাবেন ফলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতার প্রমান আশ্রিতব সহজসাধ্য হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সী জেল হ'তে পলায়ন প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত কাঁকুবগাছিব ফেবাবী আড্ডায় প্রাপ্ত বিশেষ ভাবে তৈরী সিঁড়ি, মোটর গাড়ী প্রভৃতি।

প্রেসিডেন্সী জেল গেটে প্রাপ্ত সঙ্কেত লিপি—। বহু জরুরী খবরে চিঠিখানা ভর্তি ছিল।

বিপ্লবের গথ

দেউলী বন্দী নিবাসে লেখকের স্টুকেসে প্রাপ্ত চিঠি—
সঙ্কেত-লিপি সম্পর্কিত এই চিঠিখানার বলে লেখককে প্রত্যক্ষ-
ভাবে মামলায় জড়ান সম্ভব হয়ে ছিল।

বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র ও বোমার মাল মসলা
এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত।

রাজসাক্ষী ও বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও অত্যাচার আরও
অনেক দলিলপত্র।

সত্যেন মজুমদারের নিকট এক হাজার টাকার একখানা নোট
প্রাপ্তি—অস্ত্রবীনে যাবাব পথে বাস্তব তল্লাসী কবে নোটখানা
পুলিশ পেয়েছিল।

আনাদের কৌশলী ব্যাবিষ্টার শ্রী জে, সি, গুপ্ত ও শ্রীশেখর বসু
এবং উকীল বন্ধুবা, শ্রীমুকুন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীপূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী ও
শ্রীশশিব মৈত্র সাধ্যমত গবর্ণমেন্টের চুক্তি স্বাক্ষর করতে চেষ্টা
কবেন—বিশেষ করে শ্রী জে, সি, গুপ্ত মহাশয়ের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে
প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল।

এবার বায় দেবার সময় হলো।

প্রধান আসামী হিসাবে প্রভাত চক্রবর্তী ও জিতেন গুপ্ত
পেলো—যাবজ্জীবন দণ্ড (পঁচিশ বৎসর)। অন্তরীণ আইন
ভাঙ্গার অপরাধে তাদের পূর্বেই পাঁচ বৎসর করে দণ্ড হয়েছিল—
মোট তাদের সাজার পরিমাণ হলো ত্রিশ বৎসর।

সীতানাথ দে, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও
আমাকে একই সাজায় গাঁথে দিল। (যাবজ্জীবন দণ্ড—পঁচিশ
বৎসর)। নরেন্দ্র ঘোষের চরপাড়া মামলার দণ্ড মিলিয়ে মোট

বিপ্লবের গাথ

সাজা হলো ত্রিশ ছাড়িয়ে। নবেন্দ্র খোষের বন্দ্যাব কার্য-কলাপের সাক্ষা ও পমান এনে তার দণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছিল।

কিশোরী দাশগুপ্ত এলো - দশবৎসর। পার্টির বিশ্বস্ত সভ্য নোয়াখালী নিবাসী ভূপেন মজুমদার ছিল, এই মামলার একজন ফেরাবী আসামী। তার হস্তলিখিত একখানা চিঠি প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরাবী আড্ডায় পাওয়া যায়। পুলিশ উক্ত চিঠিখানা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞদের দিয়ে কিশোরীর লেখা বলে প্রমাণ কবে এবং ট্রাইব্যুনাল কিশোরীকে সেই চিঠির বলে দীর্ঘ দণ্ড দেয়। ইতিমধ্যে ভূপেন মজুমদার পলাতক অবস্থায় কলেবা বোগে আক্রান্ত হয়ে ফরিদপুর, পালং আশ্রমে (স্বর্গীয় জাবন ঠাকুরতা ও শ্রীআশুতোষ কাহিলী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) দেহান্তর করে। পুলিশ সে-খবর তখন জানতে পাবেনি।

পরেণ গুহ ও মণীন্দ্র চৌধুরীকেও দশ বৎসর করে সাজা দিল। পবেশ ছিল রংপুরের বিশিষ্ট সভা এবং বঙ্গ ক্যাম্প থাকাকালীন পার্টির উৎসাহী কর্মী। মণীন্দ্র চৌধুরী একখানা চিঠি ক্যাম্প থেকে লিখে বাইবে পাঠিয়েছিল। তাতে একটি অস্ত্রের উল্লেখ ছিল। সেই চিঠিখানা প্রভাত চক্রবর্তীর ফেরাবী আড্ডায় পাওয়া গিয়েছিল।

জ্যোতস মজুমদার ও বিমল স্ট্রাচারীকে দিল ছয় বৎসর করে। এব পূর্বের স্ত্র জামিনে তাদের ৬ মাসের পর চৌধুরীকে পাঁচ বৎসর করে সাজা দিয়েছিল।

তাবপব এলো, পাইকারী হিসাবে সাত বৎসরের সাজার তালিকা। তাতে ছিলো—গরিপদ দে, অমূল্য সেন, নিরঞ্জন ঘোষাল,

বিপ্লবের গথ

হেম ভট্টাচার্য্য, প্রভাত মিত্র, সুরেন্দ্র নন্দ চৌধুরী, দ্বিজেন তলাপাত্র, অমিয় পাল, যতীন চক্রবর্তী ও সন্তোষ মজুমদার ।

তিন হাতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে ছিল,—মদিনাপুরের অল্প বয়স্ক সুধীব ভট্টাচার্য্য, প্রবোধ ঘোষ, শ্যাম বিহারী শুক্লা ও কুমিল্লার সুধীব ভট্টাচার্য্য, ইন্দ্র মজুমদার, সুশীল বায়, অবনী ভট্টাচার্য্য ও ভোলানাথ দাস ।

খানাস পেলো — অজিত বসু, লক্ষ্মীনাথায়ণ শর্মা (কলকাতা পণ্ডিতজী), জ্যোতিমুকুল ঘোষ ও সঞ্জীব মুখার্জি ও বৈজ্ঞানিক দ্বিজেন বায় ।

গবর্ণমেন্টের ঋণ প্রসিকিউটরদের দল - নগেন বানার্জি, গুণেন সেন, বি, সি, নাগ প্রভৃতি এবং ব্রুটিল চক্রান্তকারী পুলিশ দলের মন্থন সেন প্রভৃতি নাজি ও চহাশ্বের হুণ্ড ও বানচাল কববার জগৎ আমাদের কৌশলীরা তাঁদের মণীষা উজ্জার কবে দিয়েছিলেন—পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য না নিয়ে । বিদেশী শাসকের অগ্নায় প্রচেষ্টার মুখে তাবা সাহসের সঙ্গে কোমর বেঁধে দাড়িয়েছিলেন । এসময় পুলিশের কোপানল থেকে কেউ বড় একটা বক্ষা পেত না ।

আমাদের মামলায় অর্থ সাহায্য ও তদবীর কববার জগৎ আমাদের অনেকেবই পরিবারস্থ লোকদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমার ছোট ভ্রাতা ধীরানন্দ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিমলানন্দ দাশগুপ্তকে হয়রানি করবার ফলে আমি বিশেষ আদালতের শরণাপন্ন হ'তে বাধ্য হয়েছিলাম ।

বিপ্লবের পথে

হিলি মামলার আসামীদের সমর্থন করবার জন্য দিনাজপুরের জ্ঞানীশীথনাথ কুণ্ডু ও হিলির উকীল জীবরদা চক্রবর্তীকে শুধু হয়রাণি ভোগ কবতে হয়নি, পুলিশ তাঁদের শেষ পর্য্যন্ত বিনা বিচাণে আবদ্ধ কবে রেখেছিল।

স্বাস্থ্যপ্রাদেশিক মামলা শেষ হলো। দীর্ঘ দুই বৎসরের মিলন-স্থান ছিল--বাচারালয়ের এই কাঠগড়া। আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

একুশ

এবার সাজা খাটাব পাল।

বাংলার সেন্ট্রাল জেলগুলো বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঢাকা ও রাজশাহী তখন হয়ে উঠেছিল—কসাইখানার নামান্তর। একবার এই জেল ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে আন্দামান কেন, জাহান্নামে যাবারও আগ্রহ এবং অধীরতা সঙ্গে সঙ্গেই এসে যেতো। এ সব জায়গায় বিপ্লবী-বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতো, তাতে নরকের বর্ণনাও ছোট হয়ে যেতো। বাংলার পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের সেই শীন অত্যাচারের ও মৃত্যুর চেয়েও অধিক যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার কাহিনী আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। অপমানে, লাঞ্ছনায়, বর্ষরতার সামাহীন বিস্তারে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন হয়ে উঠেছিল মূল্যহীন। প্রতিটি দিন ছিল—অজানা-আশঙ্কায় ভরা; প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠেছিল—জন্মদা মুহূর্ত।

শীঘ্রই একদল বন্ধুকে পাঠিয়ে দিল, মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে—কসাইখানা গুলোর অগ্রতম প্রধান-কেপ্ত। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের প্রসিদ্ধ “হুইশত ডিগ্রী” নামে পরিচিত প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে বিপ্লবীরা বন্দী—ডিগ্রীগুলি সারিবদ্ধ ভাবে মুখোমুখি দাড়িয়ে। আলো-বাতাসহীন গুমোট অন্ধকারের

বিপ্লবের গথে

ভিতর মনের আলো জ্বালিয়ে বিপ্লবী বন্দীরা চরম নির্যাতনের ভিতর দিয়ে দিন গুনছে। কুখ্যাত জেলাব হরেন সেন ও ডেপুটি জেলার অবনী রায় ও ভাবতীয় আই, এম, এস সুপারিন্টেন্ডেন্ট গুলা ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে খুসী কববার জন্য সদা-তৎপর। নামমাত্র স্বযোগেব অছিলায় মাঝে মাঝে লাঠি-সোটা নিয়েও তারা আক্রমণ করছে, আবার কাউকে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়ে বিপ্লবীদের তাজা খুনের ফোয়ারা দেখিয়ে প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে। তবুও বিপ্লবীদের জীবন চলেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তাদের প্রাণের ওপব ও আক্রমণ হবে।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র ও অগাঢ় বিভিন্ন মামলাব অমূল্য সেন, হবিপদ দে, জ্যোতিষ মজুমদার, ধীবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিজয় বানার্জি, পবেশ গুহ, কালী বানার্জি, কালী চক্রবর্তী (ময়মনসিং) সুরেশ দে, ছুগী সিং, ভবেশ তালুকদার, ননী মুখার্জি প্রভৃতি অত্যাচারেব মরশুম ভোগ করছে। আলিপুর জেল থেকে পালাবর পর সাবা বাংলাব জলগুলিতে যে অত্যাচারের বন্যা শুরু হয়ে গেলো, তাতে দল নিবিশেষে প্রতিটি বিপ্লবী সভাই তার ভাগীদাব হয়েছিল—প্রত্যেকের পায়ের সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল ন্যূনতম এক ডাড়া কবে লোহাব-বেড়ী। বেত্র দণ্ডেব সত্তা অভিল্পতা লাভ কবে প্রাচীন বিপ্লবী শ্রীননী মুখার্জি ও সুরেন সরখেল সেখানে আছে। সূর্য্য সেনের তখন কাঁসী হয়ে গেছে। তাঁকে আশ্রয় দেবার অপরাধে মাতা ও ছেলে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে সাত বৎসরের কঠোর কারাদণ্ড নিয়ে বন্দী। ছেলে রামকৃষ্ণ যজ্ঞা রোগাক্রান্ত হয়ে জেলের

বিপ্লবের গথে

হাসপাতালে নাম মাত্র চিকিৎসাপীণ আছে। তাঁর পা ছ'খানাতে ডাঙাবেড়ী পরিয়ে দেওয়া হয়েছে—দুর্বল শবীর লোহার ডাঙা বইতে পারছে না। মা কণ্ঠ ছলকে একবার দেখবার জন্য জেলেব ছোট বড় সাহেবদের নিকট আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে, কিন্তু তারা পাষান-প্রাচীরের মতই অটল।

ক্রম বর্ধমান অত্যাচারেব মাত্রা দেখে বন্ধুবা বন্ধুতে পেরেচে যে খুব শীঘ্রই তাদের জীবনের ওপর আক্রমণ হবে, তাই তারা নিজেদের প্রকোপেব বাইবে যেতো না যাতে ওরা বাগরে পেয়ে কোনও অভিলায় আক্রমণ করতে না পারে। তবুও ওরা সুযোগ করে নিল। আক্রমণ হলো। জেলেব সিপাহীর দল নির্বিচারে মাথা সই কবে লাঠি চালাতে শুরু কবলো। আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায় বইল না। অমূল্য সেন তাঁর বলিষ্ঠ হাত দিয়ে নিজেব মাথা বাঁচিয়ে লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে জবাব দিতে শুরু করলো—ছুঁচা জনকে ধবাশাখা করলো কিন্তু সমগ্র সিপাহী বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। অমূল্য সেনেব সংজ্ঞাহীন দেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে বইল—অপরাপর বন্ধুবাও সবাই হতভয় আহত। অমূল্যের সংজ্ঞাহীন দেহ নিয়ে গেলো জেলের হাসপাতালে মৃত্যু-কালীন জবান বন্দী লিখবার জন্য যেন আইনের কাছে জল্পাদদের সঠিক পরিচয় সে দিয়ে যেতে পারে। জল্পাদদের দল তার শেষ কথা শোনবার জন্য সংজ্ঞাহীন দেহটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু “মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?”—অমূল্য সেন বেঁচে গেলো। দীর্ঘ কাল পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। সে দেখতে পেলো, তার পাশে বসে আছে শীর্ণ দেহ নিয়ে যক্ষ্মা

বিপ্লবের গাথ

রোগাক্রান্ত বামকৃষ্ণ—ডাঙাবেড়ীৰ ভাৱে সোজা হয়ে দাঁড়াতে অক্ষম। ক্ষীণ কণ্ঠে অমূল্য সেনকে ভবসা দিয়ে সে আবার চলে গেলো তাব নির্দিষ্ট শয্যায় হামাগুড়ি দিয়ে, পায়ের শিকল টেনে-টেনে। মৃত্যুপাবের যাত্রী—সামন্তনা দিতে এসেছিল তাবই সত্যার্থকে। অমূল্য সেন বক্ষা পেলো ভাঙ্গা-হাত ও ভাঙ্গা মাথা নিয়ে, কিন্তু বামকৃষ্ণেৰ জীবন-দীপ শেষ হয়ে এলো। কাটাৰিখা তখন জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। বিপ্লবী বন্দীবা সবাই তাকে অন্তবোধ কবলো--মৃত্যুৰ পূৰ্বে পুত্ৰকে জীবন্তে দেখবাৰ জন্তু মাতাব আকুল প্ৰাৰ্থনা যেন সে মঞ্জুৰ কৰে এবং তান পা'তুখানাকে ডাঙাবেড়ী থেকে মুক্ত কৰে দেয়। আবেদন না-মঞ্জুৰ হলো। বামকৃষ্ণেৰ জীবন-দীপ নিৰ্ব্বাপিত হলো। শোকাতুৰা মাতাকে মেয়েদেব “ডিগ্ৰী” থেকে নিয়ে এলো সম্ভানকে দেখাবাব জন্তু- সম্ভান মৃত কিন্তু ডাঙাবেড়ীৰ বন্ধন তখনও জীবন্ত হ'য়ে বয়েছে। জেল ও পুলিচ কৰ্ত্তৃপক্ষেৰ নাবকীয় ব্যবহাৰেৰ একটি মাত্ৰ উৎকট দৃশ্য।

নিবঞ্জন ও আমাকে মফঃস্বলেৰ অত্যাচাৰ-কেন্দ্রে পাঠাবাব সুযোগ কৰ্ত্তৃপক্ষ পেলো না। টিটাগঙকে কেন্দ্ৰ কৰে বাজাৰ বিকল্পে যুদ্ধোত্তম ও ষড়যন্ত্ৰেৰ দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টায় আৰ এক দফা আমাদেৰ আসামী হ'তে হবে।

নিবঞ্জেৰ পায় ডাঙাবেড়ী পৰান হয়েছে। তাবও মাথাঙ্গ লাল টুঙ্গী চড়েছে (পলাতক আসামীদেৰ পৃথক কৰে দেখাবাব ব্যবস্থা)।

বিপ্লবের গথে

অন্ত-আইনের অপবাধে আমাদের সাথে বাথবাব জন্ম নিয়ে এলো, আরও দুইজনকে—বমেশ ও তাবাপদ। সে-সময় অন্ত পেনেই সন্তাসবাদী বলে গণ্য হ'তো, অথ বোনও বিচার করতো না। তাদেরও বেড়ি পবিযে দেওয়া হলো কিন্তু তা' ছিল অনেকটা হালকা ধবণের শিকল-বেড়া—চলাফেরা তা'ে অনেকটা সহজ।

এবাব এলো, বিদেশী পাঁচজন চৈনিক নাবিক। তাবা কলকাতার ডকে চড়া দামে বিভলবাব বা পিস্তল 'দফ্রী' কবতে চেয়েছিলো—মাল সহ পুলিশ নাকি তাদের ধবেছে। লর্ড সিংহার পুএ—এস, কে, সিংহা ছিল তখনকাল কলকাতার প্রোসিডেন্সা ম্যাজিষ্ট্রেট (১৯২২ সালে বেল ও ঠোমান ধর্ম্মদেব সময় শগীয় জে, এম, সেন গুপ্ত পবিচালিত সত্যাপ্রদেব ওপব গুলি চালিয়ে 'নাম' কবেছিলেন)। সন্তাসবাদীদের বিচাবে বা অন্তপ্রাপ্তিব মামলায় তাব নিকট কোনও উদারতা বা ক্ষমা ছিল না। বিচারে দেশী-বিদেশী বা অন্ততা-বজ্ঞতাব কোনই প্রভেদ তিনি কবতেন না। “কলোনিয়েল” (ও নিবোশিক) নেজেব মাগনা-কাটা বিবর্জিত মেজাজ দিয়ে হতভাগ্য চৈনিকদের তিনি বিচার কবলেন। অসহাযেব মত দাঁড়িয়ে থেকৈ সাত বংসব কাবাদগু নিয়ে তাবা আমাদের প্রতিবেশী হ'য়ে এলো।

আমাদের কড়াকড়ি ব্যবস্থাপুলো সবই বজায় আছে, তবুও তার মধ্যে খানিকটা শিথিলতা এসেছে। আধ ঘণ্টা কবে ডিগ্রী ও উপ-ডিগ্রীর বাইবেব আজিনায় বেড়াবাব অন্তমতি হয়েছে। আজিনাব এক ভাগ নিবজ্ঞন, বমেশ ও তাবাপদেব জন্ম আন এক ভাগ আমার জন্ম নিদ্বিষ্ট হয়েছে। আমাদের পরপ্পব কথাবার্তা

বিপ্লবের পথে

ও মেলানেশা নিষিদ্ধ। Equator বা বিষুব রেখার মত এই ভাগকে মনে রাখতে হতো। Equator আছে অথচ দাগ নেই, তেমনি আঙ্গিনার মাঝখানটা আছে কিন্তু চিহ্ন নেই। ছ'দল প্লান করেই হোক বা স্বাভাবিক ভাবেই হোক ৬' দিক হতে এসে মিলে যেতাম। পাশেব ডান-বায়ের সিপাহীরা সঙ্গে সঙ্গে চলতো, তাবা খট্ট কবে বুটেব আওয়াজ দিয়ে জানিয়ে দিত—আর এগোবেন না অর্থাৎ আমবা সীমানায় এসে পড়েছি। আমবাও ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ কবে ডাঙাবেড়া নিয়ে যুবে যেতাম। এই সময় চানা নাবিকদের সঙ্গে দেখা হতো। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে তাদের মনেব কথা প্রকাশ কবতো যাকে Pigeon English বলা হয়। তাদের বয়স অনুমান করা কঠিন ছিল তবুও এতদনের কথায় বুঝে নিলাম যে তার বয়স প্রায় বাটেন মঃ হবে।

সে-সময় প্রোসডেন্সা জেলে বিপ্লবী বন্দীদের আরও বেশী সাযেষ্টা কবাব জন্তু সুদূব সিঙ্কুদেশ থেকে আরউইন ষাড়েব মত (Irwin Bull) এক জাড়া খাতি, এম, এস পর পব অনবার বাবস্থা হয়েছিল। প্রথমটিব নামেব পদবী ছিল, কাটাবিয়া আর দ্বিতীয়টির পদবী ছিল, বালিগা। ইংরেজ সার্জেন্টগুলি নিজেদের গলা দেখিয়ে কাটারিয়াব বর্ণনা দিত—Cutter অর্থাৎ গলা-কাটা আদমা। তাব নিত্য নতুন অত্যাচারের স্বরূপ দেখে একজন সাধারণ প্রবাসী বাঙালী কয়েদী (পশ্চিমের জেল থেকে বাংলায় মেয়াদেব অবশিষ্ট অংশটুকু খাটবার জন্তু তাকে তখন এনেছিল) অনুমান করে বলল যে কাটারিয়া সাহেব নিশ্চয়ই সিঙ্কুর

বিপ্লবের গণ্ডে

অধিবাসী কাণ্ড তার অভিজ্ঞতায় ভাবতে নিষ্ঠুরতম অপকার্যের স্থান হলো সিদ্ধু প্রদেশ—সে তারই উপযুক্ত সম্ভান। জেলের সমস্ত কয়েদী এমন কি অধীনস্থ কর্মচারীবা পর্য্যন্ত তার অত্যাচারে অস্থির হয়ে পড়েছিল।

দৈনন্দিন কাজের চাপ এমনই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল কিন্তু কাটারিয়ায় আগমনে তা একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে বিকেল পাঁচটা পর্য্যন্ত থেটেও আমরা কেউ নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। নিরঞ্জন আমার চেয়ে কাজ বেশী দিতো কিন্তু আমি তো অর্ধেকটার বেশী দিতে পারতাম না। কাজ কম হলেই, রাত্রির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হতো—হাত ছ'খানায় শিকল পরিয়ে দিত। অথবা হাত পা বাঁধা অবস্থায় ঘুমোতে হতো। তা' ছাড়াও জেলে তরেক রকম সাজা দেবার ব্যবস্থা ছিল। দিনের বেলায় যে সব রকমারী সাজার ব্যবস্থা ছিল, তার মধ্যে একটি হলো—দেয়ালের গায় লাগানো লোহার কড়ার সাথে হাত ছ'খানাকে শিকল দিয়ে এঁটে ডাঙাবেড়ী সহ সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখা। আর এক রকম হলো, ডাঙাবেড়ী খুলে নিয়ে ছ'পায়েব পাতাব ওপরকার গাঁটে দুইটি লোহার কড়া পরিয়ে এক ফুট পরিমাণের একটি লোহার ডাঙা কড়া দুইটির সঙ্গে এঁটে দেওয়া, যেন পা দু'খানার মধ্যে এক ফুট ফাঁক থাকে এবং যাতে চলবার সময় তিন চার ইঞ্চির বেশী একবারে এগোতে না পারে। শোবার সময় বা মলমূত্র ত্যাগ করবার সময় এই ধরনের

বিপ্লবের গথে

বেড়ী খুবই কষ্টকর হতো—এর চলতি নাম, ‘আউলা বেড়ী, ইংরেজী নাম—cross-letters।

ডাঙা বেড়ী, আউলা বেড়ী বা হাতের শিকলে মানুষটির চেহারা বা “শকলের” পরিবর্তন তেমন হতো না কিন্তু তাকে পরিবর্তন করে অভূত দেখাবার ব্যবস্থাও ছিল। কতগুলি চটকে সেলাই করে জামিয়া, টুপী, কোর্তা বানিয়ে দিত এবং তা পরতে হতো। গরমের দিনে এই পোষাক একেবারেই অসহনীয় ছিল। খাবারের ব্যবস্থার ভেতরেও সাজা দেবার বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক কয়েদীর জন্য চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা ও তরকারীর সরকারী বরাদ্দ রয়েছে। সেই বরাদ্দ চাল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি সাজা-প্রাপ্ত কয়েদীকে অনেক সময় আলাদা ববে পাক করে খেতে বলা হতো এবং পাক কববার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ এক টেলা কয়লাও তাকে দিত। তার ওজন হতো আধপোয়া। আর সিগারেটের কোঁটার মত একটি ছোট্ট কোঁটাকে চুলার মত করে ব্যবহার করবার জন্য দিয়ে যেতো যাতে কয়েদী নিজের বাটিতে সব রান্না করে খেতে পারে (একটি বাটি আর একখানা থালা তার বাসন পাত্রে রাখা কিছু সম্বল) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ক্ষুধার জ্বালায় সবই কাঁচা বা অর্ধ-সিদ্ধ তাকে খেতে হতো। এই সাজাগুলি সবার ওপর না এলেও বিপ্লবী বন্ধুদের অনেককেই তা ভোগ করতে হয়েছে।

চীনদেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ খাটুনিতে পরাজিত হয় না। এবার তারাও পরাজিত হলো। আমাদের মতই চরকা ঘুরিয়ে

विश्वेन्द्र अथ

[illegible][illegible]

ইংরেজ সার্জেন্টদের আদর্শ দেব সঙ্গে এবং বলতে দেখলেই
শ্রবধান হবে দিয়ে বলতো, 'No Talk English Eat
India, Eat China, Eat All. ইংরেজ দোলেই বলতো—
ভানত খেয়েছে, চান খেয়েছে, সবই খেতে চায় ওদের সঙ্গে কথা
বলবে না।

বুড়োব লগুনে এক ঔংবেজ-পত্ৰী ছিলো, আর ছিলো চাঁদ
দেশে তার চেনিক-পত্ৰ, নাবিকের জীবনের আলোক-সুস্থ।

বিপ্লবের পথে

তাঁদের কথা আমাদের বলবার সময় সে চোখের জল ফেলত। মাঝে মাঝে তাঁদের খবর পাবার আশা নিয়ে চীয়াং-কাই-সেথের কলকাতার দূত (কল্মাল) এর সঙ্গে জেলের গেটে দেখা করতো। ফিবে আসতো, বিমর্ষ হয়ে আঁব বলতো—No News China London Give News How get Pistol--Dog-Dog-Dog—কল্মাল চীনদেশের বা লণ্ডনের কোন খবরই দেয় না—কেবল সে জানতে চায়, কোথা থেকে পিস্তল পেয়েছি, কুত্তা, কুত্তা, ইত্যাদি! হাড় ভাঙ্গা খাটুনি, নিকৃষ্টতম খাবার, নির্ঘাতন, ও আলো-বাতাসহীন সর্কার্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করার ফলে বুড়োর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ল এবং গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তাঁকে জেল হাসপাতালে নিয়ে গেলো। একদিন খবর পেলাম, বুড়ো শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। চীয়াং-এর রাষ্ট্রদূতের ওপর ভার—তার পত্নীদের নিকট খবর পাঠানো। দীর্ঘকাল ধরে তারা হয়তো তাঁর খবরের আশায় অপেক্ষা করেছে,—সমুদ্রেব পাবে বা মাঠের দিকে চেয়ে।—কিন্তু তারই দেশের রাষ্ট্রদূত যে ব্রিটিশের গুপ্তচর! পথ চেয়ে চেয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেলেও তারা খবর পেয়েছিল কিনা, সন্দেহ !!

বাইশ

টিটাগড়ে খবা পড়বার পব গভর্নমেন্টের পক্ষে মামলা চালাবার ভাবপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্মচারী মন্মথ সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্ত চিঠি দিলাম। মন্মথ সেন জেলে এসে দেখা করলো। তার সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্য ছিল--টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও সাক্ষ্য সাবুদের বলে নূতন কবে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধোত্তমের প্রচেষ্টার মামলা যখন সুনিশ্চিত তখন দলকে বাঁচাবার জন্ত মামলাকে সংক্ষেপ কবে দেওয়া। তাকে প্রস্তাব দিলাম, যদি বেশী লোককে না জড়িয়ে প্রাপ্ত জিনিষপত্র ও সাক্ষ্য সাবুদের বলে টিটাগড়ে ধৃত তিনজনকে নিয়েই মামলা করবার জন্ত সে গবর্নমেন্টকে রাজী করাতে পারে তবে বাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তম ও ষড়যন্ত্রের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি স্বীকার করে নেব এবং তার জন্ত যত্নদণ্ডও নিতে আমি প্রস্তুত থাকব। পারুল ও শ্যামবিনোদকে যথাক্রমে দশ বৎসর ও যাবজ্জীবন দণ্ড নেবার জন্ত আমি রাজী করাতে চেষ্টা করবো। মন্মথ সেনের কথায় মনে হলো, সরকার পক্ষ মামলা সাজাবার কাজে অনেকখানিই অগ্রসর হয়েছে। বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র মামলায় গোড়ার কথা হ'লো, স্বীকারোক্তি। সে দিক দিয়ে পুলিশ হয়তো বিশেষ সুবিধা করতে পেরেছে, যার জন্ত সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হলো না।

বিপ্লবের গাথ

কিছুদিনের মধ্যেই সনাক্ত করবার হিড়িক পড়ে গেলো। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক এনে সনাক্ত-করণ অভিনয় শুরু হলো। সনাক্ত করবার সারিতে কিছু সংখ্যক ভদ্রবেশ-ধারী লোকের মধ্যে আমাকে এক জায়গায় দাঁড়াতে হতো। বাইর থেকে যাবা আসতো তারা সারির সামনে এসে আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। পুলিশ তাদের আগে থেকে ফটো দেখিয়ে অথবা চেহারার বর্ণনা দিয়ে বা অণ্ড কোনও ইঙ্গিত দিয়ে এমন করে প্রস্তুত করতো যে তারা ভুল করতো না। কিন্তু একদিন একটি লোক ভুল করে বসল। সামনে এসে ও আমাকে সঠিক ভাবে ধরতে না পেরে, আমার নিকটস্থ ছইজনকে ছাড়িয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলো আমাকে দেখাবার জন্য (বোধ হয় কোন ইঙ্গিত পেয়ে)। কিন্তু পাহারায় নিযুক্ত সার্জেন্ট এডওয়ার্ড দৌড়ে এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে গেল এবং সনাক্ত করবার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলল যে এটা সম্পূর্ণই বে-আইনী কারণ দ্বিতীয়বার কেউ সারিতে ফিরে আসতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট ও তার কথা মেনে নিতে বাধ্য হলো।

আবার আলিপুরে কোর্টেই টিটাগড় বড়যন্ত্র মামলা শুরু হলো। ট্রাইব্যুনালের বিচারক ছিলেন তিনজন—প্রেসিডেন্ট কে, সি, দাসগুপ্ত, আই, সি, এস (বর্তমানে হাইকোর্টের জজ), মিষ্টার বিভার আই, সি, এস ও মিষ্টার এন, কে, বসু, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রোসেকিউটর, জে, সি, মুখার্জি (নগেন বানার্জি ইতিমধ্যেই মারা গেছে), বি, সি, নাগ প্রভৃতি, আর আমাদের পক্ষে ছিলেন, ব্যারিষ্টার জে, সি, গুপ্ত ও

বিপ্লবের পথে

শেখর বসু, এডভোকেট শ্রীমন্মথ নাথ দাস, পর্ণেন্দু বায় চৌধুরী, সুকুমার দাশ গুপ্ত ও শিশির মৈত্র্য।

মামলাকে সাড়িয়ে ফুজিয়ে যাচ্ছে এমন শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় তার জ্ঞাত ছিলো, সরকার পক্ষে কুড়িল চকাতুকাবী পুলিশ-উপদেষ্টা মন্মথ সেন।

বহিঃ জনকে আসামী করা হলো - দেবপ্রসাদ বাসায় ধৃত সিলেটের স্বীকৃত বজ্রনই ছিলো, প্রথম আসামী। তারপর আমরা সবাই-- প্রফুল্ল সেন, ধর্মেশ চট্টোপাধ্যায়, পারুল মখাজি, শ্যামবিনোদ পাল চৌধুরী, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শাস্ত্রীবজ্রন সেন, সুরেন্দ্র বিনয় দত্ত, নির্মলেন্দু ঘোষাল, মাখন লাল কর, বনেন্দ্র বোদ, বিভূতি ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ বানার্জি, জগদীশ ঘটক, কালাপদ চট্টোপাধ্যায়, বরেন্দ্র মুন্সী, ধীরেন্দ্র ধর, কার্ত্তিক সেনাপতি, অজিত মঙ্গলদায়, দেবপ্রসাদ বায় (সিলেট) জীবন দে, জুড়ান গাঙ্গুলী, জীবন ধর্মী, বীরেন বসু, সীতানাথ দে, মহোদয় সেন (রাজসাক্ষী), বিক্রমপাল চৌধুরী (রাজসাক্ষী), সুনীল বসু (রাজসাক্ষী)।

বিপজ্জনক রাজসাক্ষী হয়ে চাঁড়ালো, মহোদয় সেন। তার স্বীকারোক্তির ফলে দক্ষিণ বাংলার সংগঠন, বিশেষ করে বরিশাল ও খুলনার, প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং বহু পার্টি-সভা ও দরদী ধরা পড়ে গেল। পার্টির দরদী সভ্য ও শিক্ষক শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্যকে আসামী শ্রেণী ভুক্ত করলো এবং খুলনার কাকীমা এবং তাঁর স্বামী বিজয় বসু ও গ্রেপ্তার হলেন। কাকিমার ছেলে সুনীল ছিল, পার্টি সভ্য। পুলিশের চাপে এবং মা ও

বিপ্লবের পথে

বাবাকে বাঁচাবার জন্য সে শেষ পর্যন্ত রাজ-সাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালো। সন্তোষ সেনের স্বীকারোক্তির ফলে লুকোন বন্দুকটির সন্ধান করতে গিয়ে তাদের বাড়ীখানার মাটি নাকি পুলিশ চষে একাকার করে দিয়েছিল। ফরিদপুরের বিজয়পাল চৌধুরী ও রাজসাক্ষী হ'য়ে দাঁড়ালো।

বিপ্লবীদের পক্ষে সামান্যতম স্বীকারোক্তি ও দোষনীয়। শুধু যে বৈপ্লবিক চরিত্রের দৃঢ়তার অভাব তাতে প্রকাশ পায় তা নয়, তাতে সংগঠনের যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মারের চোটে, অথবা মারের ভয়ে বা নিজের শাস্তিকে লম্বু করবার আশায় স্বীকারোক্তি করার উদাহরণ সকল বিপ্লবী মামলাতেই ছিল তা' থেকে আমাদের ও অব্যাহতি পাবার কথা নয় কিন্তু প্রধান অথবা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাজ সাক্ষী তো দূরের কথা সাধারণ স্বীকারোক্তিও আশা করা যায় না। সন্তোষ সেন ছিলো সংগঠনের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত, তাই তার রাজসাক্ষী হবার ফলে বিষম ক্ষতি হলো।

রাজসাক্ষীদের বাদ দিয়ে আমাদের সবাইকে ডকে একত্রে রেখেছে। সেখানে জানা গেলো, পুলিশের অত্যাচারের হাত থেকে কেউ বড় একটা রেহাই পায় নি। এমনকি নারী আসামী ও বাদ যায় নি। ধরা পড়ার পর পুলিশ হেড-কোয়ার্টারসএ নিয়ে গিয়ে কুখ্যাত গোয়ান্দা অফিসার সন্তোষ গুপ্তের হাতে তাকে ছেড়ে দেয়। অকথা বর্বর ভাষার ভূগগুলি নিক্ষেপ করেও যখন সে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারল না তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে পারুলকে উৎপীড়নের জন্য

বিপ্লবের পথে

ছুটে গেল। পারুল চোঁকাব কবে ও জুতা ছুঁতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে কিন্তু ক্রমশে পাবছে না। এমন সময় চোঁকার শুনে পারুল জটিল গোয়েন্দা অফিসার ছুটে এসে অবস্থা দেখে সন্তোষ গুণকে সাবধান কবে বলল “আপনি আপনার পরিণাম বুঝতে পারছেন না--আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে”। ভয় পেয়ে সে নিরস্ত হলো—পারুল জানোয়ারের হাত থেকে রক্ষা পেলো।

বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারিত সাথে সাথে মেয়ে ও পুরুষের মতই স্বাধীনতার সংগ্রামে সক্রিয় ভাবে যোগ দিতে শুরু করে যার ফলে শাস্তি, স্তন্যমোচন, প্রাণত্যাগ ও খাদ্যদেহের উৎস্রাও বীনা দাসের কল্প-কীর্তিতে বিপ্লব-ভূমি মুগ্ধ হয়ে উঠেছিল। রৈপ্লবিক আন্দোলনের এই সন্মিলিত সংগ্রামকে বাধা দেবার কোনও সহজ পথই পুলিশের ছিল না। একমাত্র গঠন-প্রচার ও পার্শ্বিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে তারা ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

আমাদের দুইজনকেই ছুটির দিনগুলোতে পূবা খাটনি দিতে হচ্ছে। মেদিনীপুর জেলকে সায়েস্তা কবে কাটারিয়া তখন সবেমাত্র প্রেসিডেন্সী জেলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এসেছে। কলকাতার জেলে, এই তার প্রথম পদার্পণ। অল্পদিনের মধ্যেই জেলখানা গরম হয়ে উঠল।

প্রেসিডেন্সী জেলে (পুরানা জেল নামে পরিচিত) বাংলার ও ভারতের বহু জায়গা থেকে কয়েদীদের এনে রাখবার ব্যবস্থা ছিল। জেলের কড়া নিয়ম কানূনের মধ্য দিয়েও তারা তাদের জীবন

বিপ্লবের পথে

যাত্রার উপযোগী ব্যবস্থা করে নিত। নিষিদ্ধ জিনিস যথা, চুঙ্গ, আফি, তামাক, বিড়ি, কোকেন সবই সেখানে পাওয়া যেতো কিন্তু বাজার দরের উঠানামা ছিল—তামাকের দর ছটাক এক টাকা হতে দুই টাকাও হতে পারত। কাটারিয়া সাহেব আসবার পন্থে কেই দর বেড়ে গেল, এমনকি দুপ্রাপ্য হয়ে উঠল। নানা অছিলায় জেলখানার শাস্তিমূলক কুঠুরীগুলি ভরে গেলো। কয়েদাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এমনকি স্বভাব-দুর্ভাগ্য কয়েদাদের পক্ষের ভিতরকার খোপারটি উল্লাসী করে নিষিদ্ধ জিনিস বেগ ব্যবহার দেওয়া হতো—গলা টিপে স্থান রোধ করে। যদি সফল না হতো, তবে কব্জ-ধোলাইর ব্যবস্থা করতো অর্থাৎ কব্জ দিয়ে কয়েদার দেহকে জড়িয়ে নিয়ে উঠার হতে পিচটোন হতো যেন গায়ে কোনও দাগ না পড়ে। এ সব দেখেই সাজেক্টর। গুর নাম দিয়েছিল, 'কাটার' (Cutter)।

চুয়ার্লিশ ডিগ্রার টর্থে নীচের খালি জায়গাটুকুর মধ্যে বিকেল বেলায় নিয়ম মত একদিন আন খণ্টা বেড়াবার জায় নিয়ে এলো—সিপাহীরা দুইজন আমার দুই পাশে বয়েছে। গরমের দিন। নিরঞ্জন রমেশ, ২ তারাপাক নিয়ে প্রাচীরের সংলগ্ন ভলের কলটিতে স্নান করতে যাচ্ছে দেখে সিপাহী আপত্তি করলো কিন্তু গুরা কেউ তার আপত্তিতে কান দিল না। গালি দিচ্ছে দেখে, সিপাহীটিকে সংযত ভাষায় কথা বলতে বললাম কিন্তু সে তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সিপাহীটি ছিল পার্শ্বান, তাকে ধমক দিতেই সে যেন বর্করতার উদ্ভূত বন্যা ছেড়ে দিল। তার গালি আমার অন্তরাঙ্গাকে বিদ্রোহী করে তুলল এবং ডাঙা-বেড়ী

বিপ্লবের পথে

নিয়েই আমার সিপাহীদের বেইনী ভেঙ্গে ওব উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ভিজে জামা কাপড় নিয়ে নিবঞ্জন, রমেশ এবং তারা পদও এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কয়েক ঘা মেরে বর্ধরতার জবাব দিতেই আমার পার্শ্বস্থ সিপাহীরা পাগলা নাঁশি বাজিয়ে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেলের চার দিক হতেই নাঁশি বেজে উঠল। সঙ্গীন অবস্থা উপলব্ধি কবে নিরঞ্জনকে তার সেলেব ভিতর ঠেলে দিয়ে আমি ও আমার সেলেব দিকে দৌড়ে গেলাম। ভারপ্রাপ্ত সার্জেন্ট-ওকশট-অবস্থাব গুরুত্ব উপলব্ধি করে দৌড়ে এসেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে সেলেব ভিতর ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কাটারিয়াও তখুনি এসে হাজির হলো—উন্মত্ততার ছাপ তার চেহারায। আমাকে সেলের ভিতর অর্গল-বন্ধ অবস্থায় দেখতে পেয়ে, সে ক্ষিপ্ত হয়ে সার্জেন্ট ওকশটকে ভৎসনা করে বলল, “ওকে মেরে ফেলবার সুবর্ণ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। ওকে যদি ঢুকতে না দিতে তবে বাইরেই অনায়াসে আজ আমবা গুলি বরে মেরে ফেলতাম, তাতে এক কলম মাত্র লাল কালি আমার খরচ করতে হতো”। কথাগুলি শুনে আর ওর অসভ্যতা দেখে চূপ করে থাকতে পারলাম না। সেলের ভিতর থেকেই বুক পেতে দিয়ে বললাম,— “সাহস থাকে তো গুলি কবে এখুনি আমাকে হত্যা করো— চৌচামেচি আর অসভ্যতা করো না”। তবুও খানিকক্ষণ ধরে সে চৌচামেচি করলো এবং ভয় দেখাবার জন্ত বন্দুকের কতকগুলি ফাঁকা আওয়াজ করে সে প্রস্থান করলো। জেলখানা আরও গরম হয়ে উঠল।

বিপ্লবের গথে

ওরা চলে যাবার পর মনে হলো, যেন মনের স্থৈর্য হারিয়ে ফেলেছি। সামান্য কারণে আজ আমরা প্রাণ হারাতে বসে-ছিলাম—শত্রুকে সুবর্ণ স্বযোগ দিয়েছিলাম। প্রেসিডেন্সী জেলের ইন্টের লাল মাটির ওপর আমাদের নিঃসার দেহ পড়ে থাকত, আর ওরা লিখত, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদীরা সিপাহাকে মেরে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল, কেবল দ্বিগত হস্তক্ষেপে তা ব্যর্থ হয়েছে এবং দুইজন মাত্র সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে। রাজকীয় ঘোষণার সময় সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়তো এর জন্য কোনও সম্মানজনক পদবী ও পেতে পারতো। বিজ্রোহী মন ভাবে, বেঁচেই যখন গিয়েছ একবার ঐ সুপারিন্টেন্ডেন্টকে দেখাও না—কেমন করে সে আস্ত আস্ত কথাগুলি বলে সেরে যায়! কোর্ট তো এখনও শেষ হয় নি, শেষ হবার কিনারায় শুধু এসেছে।

ইংরেজের শাসন পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বত্রই সবলতার ছাপ রয়েছে। পরের দিন কোর্টে উপস্থিত হয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পবামর্শ করে বিচারকদের কাছে ঘটনাটি বিবৃত করে প্রতিকারের দাবী জানালাম। তাঁদের জানালাম, প্রেসিডেন্সী জেলে আমাদের দু'জনেরই জীবন-সংশয়। জেল থেকে পালিয়েছিলাম বলে জেল-কর্তৃপক্ষের আমরা বিরাগভাজন হয়েছি, তাই ওরা প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছুতা পেলেই সুপারিন্টেন্ডেন্ট তার বাগিনী নিয়ে ছুটে আসে ও খুন করবার ভয় দেখায়। কাটারিয়ার অমূল্য কথাগুলি জুড়ে দিয়ে বললাম যেন বিচারের সময়টা আমাদের জেল থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে রাখা হয় যেমন রেখেছিল, লাহোর খড়যন্ত্র মামলার আসামীদের লাহোর-দুর্গে।

বিপ্লবের পথে

বিচাবক কে, সি, দাশ গুপ্তের নিবপেক্ষতার সন্ধান ছিলো। পুলিশের কথা বা কারসাজিতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। মনোযোগ দিয়ে তিনি সব শুনলেন এবং তাব সহকারী বিচাবকদের সঙ্গে পরামর্শ কবে জরুরী নির্দেশ জেলে পাঠিয়ে দিলেন এবং আমাদের আশ্বাস দিলেন যে যাতে একপ ঘটনাব পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্ত তিনি চেষ্টা করবেন।

কোর্টের নির্দেশ পেয়ে কাটারিয়াব চনক নড়ে গেলো। কেমনতর কয়েদী এবা!—একেবাবে কোর্টের পরওয়ানা এনে হাজির কবেছে! কাটারিয়াব সুব বদলে গেলো এবং আমাদের অভাব অভিযোগ জানতে চাইলো। কাটারিয়াব বিলেত ফেবং ডাক্তার। ডাক্তারী আইনগুলি নিশ্চয়ই তাব পড়া ছিলো, কিন্তু পড়া ছিলো না—শাসন-ইতিহাসেব পাতাগুলো যেখানে ওয়ারেন হেস্টিংসকেও কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের নিকট নাজেহাল হ'তে হয়েছিল।

ভেইশ

টিটাগড় মামলার শেষ অধ্যায় ঘনিযে এলো।

রাজসাক্ষী সন্তোষ সেন সনাক্ত করবার সময় ডকের সামনে এসে কেঁদে ফেলল কিন্তু সনাক্ত করতে সে একটুও ভুল করলো না। তার পার্টি-প্রধান প্রফুল্ল সেন থেকে শুরু কবে, অন্তরঙ্গ বা পরিচিত কাউকেই সে বাদ দিল না—ধীরেন্দ্র মুখার্জি, কালীপদ ভট্টাচার্য্য, বীরেন্দ্র বসু, দেবপ্রসাদ বানার্জি, জগদীশ চক্রবর্তী, পংকল মুখার্জি, লেখক এবং আরও অনেককেই সে দেখিয়ে গেল।

বৈপ্লবিক সংগঠনে রাজসাক্ষীর স্বীকারোক্তি বৈপ্লবিক দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। দল ও পার্টি-সভ্যদের নিশ্চিহ্ন ও হনন্, যত সম্পূর্ণভাবে সে করবে, ততই তার নিজের নিরাপত্তা বারবে এবং ভবিষ্যতেব পথও সহজ হবে। আলিপুর বোমার মামলা, ১৯০৮ সাল, বাংলা—বাংলা কেন, সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক প্রেরণার বাহ্যিক অগ্নিস্ফুরণ। শ্রীঅরবিন্দ—বারীন—উল্লাসকর—উপেন্দ্রনাথ—হেমচন্দ্র—বিভূতি—কানাই—সত্যেন—প্রভৃতি সবাই আসামী। শ্রীরাসপুরের জমিদার তনয় বা বংশোদ্ভব আসামী নরেন গোসাই রাজসাক্ষী। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু সত্যেন দত্তের বোনের সাহায্যে খাবারের ভিতর বাইরে থেকে রিভলভার নিয়ে এসে প্রেসিডেন্সী জেলে নরেন গোসাইকে গুলি

বিপ্লবের পথে

করে হত্যা করলেন—তারা দলকে বাঁচালেন, নিজেদের জীবনের বিনিময়ে। সত্যেন দত্ত ও কানাই বসু জাতির নমস্কৃত হয়ে রইলেন—বৈপ্লবিক দৃঢ়তাব গ্রেনাইট-কঠিন প্রস্তবে বাধা রইল, তাঁদের ছবি।

স্বদেশ-প্রেমিকরা বিশ্বাস-দ্রোহীদের কখনও ভোলে না। আলিপুর জেল থেকে পালাবার পব পুবাণো পাঠি বন্ধু ঢাকার হরিশচন্দ্র সরকার একটি বিশ্বাসঘাতকের কথা লোক পাঠিয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। হরিশ তখন বিলেত থেকে এসে নামী কোনও ব্যাক্সের ম্যানেজাব কিন্তু তার অতীত দিনে যখন সে বিপ্লবকে সার্থক করে তোলবার জন্য কাজ করতো সে সময় দলের একজন সভ্য যে পাঠির বিশেষ গোপন খবরগুলি—রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ, অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্তের গোপনে ভারতে আগমন এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে পাঠির আশ্রয়ে থেকে বিক্ষোভক অব্যাদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রভৃতির খবর—পুলিশকে পৌঁছে দিয়ে তার বিনিময়ে বিলেত চলে গেল, নিজের ভবিষ্যৎ বানাবার উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেখান থেকে ফিরে এসে কোনও এক বড় কোম্পানীর বড় চাকুরীতে বা ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান কবল, তা হরিশের মন থেকে কিন্তু মুছে গেল না।

আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এই মামলা জড়িত—একই দলের বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মাত্র—আন্তঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মানস-সম্মান। তাই সরকার পক্ষকে আন্তঃ-প্রাদেশিক মামলার অনেক সাক্ষ্যও প্রমাণ আবার এই মামলায় এনে হাজির করতে হলো।

বিপ্লবের গাথ

টিটাগড়-ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপ্তি কাল মাত্র চার মাস—১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৫ সালের পয়লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত। এই অল্পকালেব মধ্যে ষড়যন্ত্র গভীর ও ব্যাপক রূপ ধারণ করতে পারে না। তাই পুলিশের ভরসা ছিল,—প্রধান রাজসাক্ষী সন্তোষ সেনের ও অপর রাজসাক্ষীদের সাক্ষা, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষ পত্র, খান কয়েক চিঠি ও সাক্ষেতিক ভাষায় লিখিত একটি তালিকা এবং সাক্ষীদের দিয়ে সনাক্তকরন। এই মামলাকে সাজিয়ে ভয়ঙ্কর রূপ না দিতে পাবলে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অ-প্রমাণিত হ'য়ে যেতে পারে। বিশেষ আদালতের বিচারে স্থায়ের মর্যাদা বাখবার লোক তখনও ছ'এক জন মাঝে মাঝে দেখা যেতো। যদি কোন বিচারক গভীরভাবে সত্যানুসন্ধীই হয়ে পড়ে, তার জ্ঞা পুলিশ চেষ্টা করছে যেন সাক্ষী-সাবুদের কোনও দুর্বলতা না থাকে। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার মনুগু সেন সরকার পক্ষের দুর্বলতার পাহারা দাব, আর আইনের শিক্ষা ও সংস্কার্ত বিসজ্জন দিয়ে জল্পাদের ছুরি হাতে নিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটোরের দল। সরকার পক্ষ ষড়যন্ত্র প্রমানের দুর্বলতা জেনে বিশেষ করে জোর দিল, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষ গুলোর ওপর—বোমার মাল-মসলা, বা বোমার প্যাটার্ণ, সামরিক কিতাবাদি এবং বিশেষ কবে কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রটি। এই সব মূল উপাদানের মধ্যে আবার বিভলভারটিই হ'লো—ব্রহ্মাস্ত্র। ঐ-টিকে যদি ঠিকমত কারু ওপর চাপিয়ে প্রমাণ করা যায়, তবে তার সুরক্ষা হবার সম্ভাবনা আছে। মুখাজি, নাগ ও সেন মহাশয় খুবই চেষ্টা করলো, যাতে স্কুজ বস্তুটি আমার

বিপ্লবের পথে

ওপরই চাপান যায় কিন্তু ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট কে, সি দাশ গুপ্ত মহাশয় সঠিক প্রমাণ চাইলেন। শ্যামবিনোদ ও পারল যে দাবীদার ছিল না, তার প্রমাণ কোথায়? যা'হোক পুলিশ খুব সুবিধা করে উঠতে পারছেন না বলেই মনে হলো। বিশেষ করে নিষ্কিপ্ত রিভলভারটি অনেক দূর থেকে কুড়িয়ে পাওয়ায় ট্রাইবুনালের মাবণা হয়েছিল, হয়তো শ্যামবিনোদের বলিষ্ঠ হাতেই উহা নিষ্কিপ্ত হ'য়ে থাকবে। তবুও পুলিশ আশা ছাড়লোনা।

এখানে উল্লেখযোগ্য, মেদিনীপুরের ব.গ্রেস-নেতা এড্-ভোকেট মন্থ দাস মহাশয় গ্রেপ্তার সময়কার পুলিশ-তালি মাকে তার জেরার মুখে অনেক খানি ঘায়েল করে দিয়েছিলেন।

সওয়াল আরম্ভ হলো। প্রত্যেক আসামীর বিবন্ধেই একে একে অভিযোগের গুরুত্ব দেখিয়ে বলল যে এই বিপজ্জনক দলটির অনেককেই কঠিন দণ্ড দেওয়া উচিত কিন্তু দলেব প্রধান নায়ক, পূর্ণানন্দ দাশ গুপ্তকে আইনের বাবস্থিতি চরম দণ্ড দেওয়া উচিত। একটি মামলায় যখন সে একজন প্রধান আসামী তখন পালিয়ে গিয়ে দলের সভ্যদের নিয়ে আবার এক ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হলো— ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব উচ্ছেদ করে। এক্ষেত্রে ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হয়েছে। আরও প্রমাণিত হয়েছে, যে নিষ্কিপ্ত অস্ত্রটি ছুঁড়বার সময় তারই হাতে ছিল। অতএব চরম দণ্ড অর্থাৎ মৃত্যু দণ্ডই একমাত্র উপযুক্ত দণ্ড তাতে শ্যায় ও আইনের মর্যাদা রক্ষা হবে। আমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছি—কিন্তু ওদের আকুল আবেদনে বিচারকরা যেন সায় দিচ্ছে না অর্থাৎ কে, সি, দাশ-গুপ্তকে যেন এতটা বোঝাতে পারছেন না যদিও বিপ্লবী সভ্যদের

বিপ্লবের গথে

অপসারণের জন্মই অস্ত্র-আইন নূতন করে ঢেলে সাজা হয়েছে। সবকারী পক্ষের কথা শেষ হলে, আমাদের কৌশলী আমাদের নির্দোষিতার কথা বললেন—আমঃ-পাদেশিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক হীনতার কথা তুললেন, টিটাগড়ে প্রাপ্ত জিনিষগুলি পুলিশ নর্জুক চাপিয়ে দেবার কথা উঠালেন, অস্ত্রটির প্রমাণ অভাবের কথা বললেন, হাতেব লেখা বা সাক্ষাতিক লেখাগুলি প্রমাণিত হয় নি বললেন এবং বাজসাক্ষীদের কথাগুলি পুলিশের বানানো বলে ব্যাখ্যা করলেন।

বায় দেবার দিন। আমরা সবাই উপস্থিত। বিচারকদের রায় পড়া শুরু হলো। ফাঁসীর দণ্ড নেবার জন্ম তৈরী হয়ে এসেছি। অনন্ত পথের যাত্রা—হয় ফাঁসীর মধ্যে, জীবনের জয় গান গেয়ে, নয় তো পীড়নের বথচক্রে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়ে। দেশকে স্বাধীন করবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘব থেকে যখন বের হয়েছিলাম, দুঃখী-মায়ের অবস্থা কান্নার আবেগ যেন ঘরের জানালা বেয়ে আমার পিছু পিছু ধাওয়া করতো। সেই স্ত্রীর বেশ তখনও যে কানে না বাজত বা মনে না হতো 'তা নয়; কিন্তু তবুও কেমন হবে তা' যেন ঝাপসা হয়ে গেছে। একমাত্র মায়ের মঙ্গল মূর্তিখানিই মনের উপর ভেসে উঠত—মনে হতো, যেন জন্ম জন্মান্তরবেব আশীর্বাদ নিয়ে মা শিয়রে বসে আছেন। শুধুমাত্র এ-জীবনের আশীর্বাদ নয়—জীবন হতে জীবনান্তরবে মঙ্গলকে পূর্ণ করার আশীর্বাদ। সেই মঙ্গল-কাজে হয়তো আমার ডাক এসেছে।

বিচারকরা যাদের দোষী সাব্যস্ত করলেন তাদের নাম, দণ্ডের

বিপ্লবের পথে

পরিমাণ ও দণ্ডের ধাৰা বলে যেতে লাগলেন। আমার নাম বলে আমায় দোষী সাব্যস্ত করলেন সবল বাণাতেই আমার দাষ অখণ্ডনীয় কিন্তু দণ্ডের বেলায় আমাকে যাবজ্জীবন দণ্ড ঘোষণা করতেই বন্ধুবা সবাই তানন্দিত হয়ে উঠল। আমাদের কৌণ্ডলীবাও খুসী কাবণ তাঁরা জানত যে ফাসীব দণ্ড একবার দিলে তাকে আপীলে খণ্ডন করা কঠিন হবে।

তাবপব একে একে দণ্ডের তালিকায় এলো—

১। প্রফুল্ল সেন—চৌদ্দ বৎসব। ৩। শ্যাম বিনোদ পাল চৌধুরী—দশ বৎসব। ৭। দেবপ্রসাদ সেন গুপ্ত—সাত বৎসব। ৫। নিবঞ্জন ঘোষাল—সাত বৎসব। ৬। ধীরেন্দ্র মুখার্জি—পাঁচ বৎসব। ৭। তরেন্দ্র নাথ মুন্সী—পাঁচ বৎসব। ৮। কার্ত্তিক সেনাপতি—পাঁচ বৎসব। ৯। জগদীশ চক্রবর্তী—পাঁচ বৎসব। ১০। শান্তি সেন—পাঁচ বৎসব। ১১। জীবন ধূপা চার বৎসব। ১২। বিভূতি ভট্টাচার্য্য—চার বৎসব। ১৩। দেব প্রসাদ ব্যানার্জি—চার বৎসব। ১৪। জগদীশ টেক—চার বৎসব। ১৫। সুধাংশু বিমল দত্ত—তিন বৎসব। ১৬। প্রাণত রঞ্জন পুৰকাযস্থ—তিন বৎসব, ১৭। পাকল মুখার্জি—তিন বৎসব।

প্রমাণ অভাবে যাবা মুক্তি পেলো—

১। ধনেশ ভট্টাচার্য্য ২। সাতী নাথ দে ৩। মাখন গাল কব ৭। ববীন্দ্র ঘোষ ৫। বালীপদ ভট্টাচার্য্য ৬। অজিত মজুমদার ৭। জীবন দ (ওৎফে নীবোদ বানার্জি) ৮। জুড়ান গাঙ্গুলী ৯। বীরেন বসু ১০। ধীরেন ধব ১১। যজ্ঞেশ্বর দে ১২। দেব ব্রত বায়।

বিপ্লবের পাত

ট্রাইব্যুনাালের রায় হয়ে গেল। বিশেষ আইনে গঠিত ট্রাইব্যুনাালের বিচারে একমাত্র পুলিশ ও বিচারকদের মর্জির ওপরই ভাগ্য নির্ভর করতো। পুলিশের তখন একছত্র-রাজ—তারা মনের মত করে সাক্ষী বানিয়ে সাজি ভরে সরকারী উকীলদের হাতে তুলে দিত, এমন কি দণ্ডেরও পরিমাণ ঠিক করে দিত। কিন্তু টিটাগড় মামলায় এদের আকাজক্ষা পূর্ণ হলো না। ট্রাইব্যুনাালের প্রেসিডেন্ট কে, সি, দাশ গুপ্ত পুলিশের সাক্ষ্য বা নির্দেশের উপর নির্ভর করেন নি। আসামীদের পক্ষও তিনি দেখতে চেষ্টা করেছেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সুযোগ তিনি আমাদের দিয়েছেন। দণ্ড ব্যবস্থার মধ্যেও কাউকে ফাঁসী কাষ্ঠে না ঝুলিয়ে স্থায়ীভাবে জেলে রাখবার ব্যবস্থা করে আমাদের অভ্যস্ত জীবন যাত্রার পথকে অব্যাহত রেখেছেন, আর নতুনদের অনেককেই হালকা সাজা দিয়ে বা বোরষ্টাল জেলের ব্যবস্থা করে ভবিষ্যতে ভাববার সময় দিয়েছেন। মেয়ে-আসামী পারুলের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ শ্রামবিনোদের চেয়ে কম ছিলনা, তবুও সেখানে তিনি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যাদের মুক্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে ধনেশ ভট্টাচার্য ও সীতানাথ দেকে দণ্ড দিতে হলে প্রমাণের অভাব হতো না। ঐ সময় নির্দোষ বাক্যিকে দণ্ড দেবার দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতিতে পাটিব পুতান সভ্য ৬যশোদা চক্রবর্তীর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পাটি-সভ্য মোক্ষদা ও প্রিয়দা এবং পাটি-সভ্য মহেশ বড়ুয়ার সাথে সম্পূর্ণ নিব্বীহ ও নির্দোষ তাদের ছজন গৃহকর্ম-চারীকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সাক্ষী বানিয়ে মোক্ষদা, প্রিয়দা

বিপ্লবের পথে

ও মহেশ বড়ুয়ার মতই তাদেরও গাবজীবন নির্বাসনের দণ্ড দিয়েছিল। একবারও তারা ভেবে দেখেনি, এদেব পক্ষে বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তৃসাহসিক কাজ করা সম্ভব ছিলো কি না !

রায় হয়ে যাবার পর হাইকোর্টে আমাদের আপীল দায়ের হলো। সেখানকার শুনানী শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সবারই আন্দামান-যাত্রা স্থগিত রইলো।

চব্বিশ

ভারতের সমুদ্রোপকূল থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রায় আট শত মাইল দূরে—সমুদ্রের মাঝখানটায় যেন গ্রহরীর মত জেগে রয়েছে। ব্রিটিশ রাজত্বের গোড়া থেকেই আন্দামান দ্বীপ নিবাসনের “দেশ” হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। সারা ভাবত থেকে যেমন চূর্ণদান্ত স্বভাবের কয়েদীদের এনে সেখানে রাখত তেমনি রাজনৈতিক কারণে যারা বিপজ্জনক বলে গণ্য হ’তো তাদেরও সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করতো। ওয়াহাবী আন্দোলনের অনেকেই সেখানে জীবন কাটিয়েছেন—ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো, ১৮৭৭ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের একজন নেতার হস্তে আন্দামানে নিহত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের নব-জাগরণ সৃচিত হলো, মহারাষ্ট্রে ও বাংলায়। তাকে স্তব্ধ করবার জন্য আন্দামানে বন্দীশালা ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবীগণের আবাস ভূমি হয়ে উঠল। বারান ঘোষ, পুলিন দাস, থেকে সুকর্ণের বাংলার ও ভারতের অগ্রাঙ্গ স্থানের বিপ্লবীদের পাদ চারণে আন্দামান হয়ে উঠল, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পুণ্য-তীর্থ—স্বাধীনতার উচ্চ শিখরে পৌঁছাবার তুর্গম রাস্তা। ১৯৩০ সালের পর বৈপ্লবিক আন্দোলন আবার যখন আগুনের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল, তখন দলে দলে বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামান

বিপ্লবের পথে

যাত্রা শুরু হয়ে গেলো। মাদ্রাজ, বেঙ্গল ও কলকাতা থেকে একথানা করে জাহাজ বন্দী ও খাবাক নিয়ে মাসে একবার যাতায়াত করতো। দ্বীপের আদিম অধিবাসীরা মাল্লমের সন্তানতাব পবিচয় পেয়ে গভীর ভক্তিতে আশ্রয় নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে গেছে। তাই আন্দামানের কথা, সভ্য সমাজের শিক্ষাসভার জীবন-কথা।

বাংলাব জেলের মত আবাস-দুখ্যাদেশাল নিয়ে আন্দামানের সেলুলার (cellular) জেলের ঘরদেওয়ান হয় নি। সেখানে খেতে সাঁতার কেটে বা দেয়াল টাঙ্গিয়ে পালাবার কোনও পথ ছিল না বলে। বাংলাব জেলের নিকৃষ্টতম খাবার ব্যবস্থার মত সেখানকারও ব্যবস্থা, এবং তাই এক দাপট নীচা। আবহাওয়া বাংলাব চেয়েও খারাপ। দৈনন্দিন কাজকর্ম বাংলাব জেলের তুলনায় বেশী ছিল না। আন্দামানের শাসন ব্যবস্থা ছিল, ইংবেজ রাজত্বের প্রাথমিক যুগের চিহ্ন-স্বরূপ—চাফ্-কমিশনার শাসিত প্রদেশ। আইন কাহুনেব বাংলাই ন ই—চাফ্-কমিশনারই শেষ পর্য্যন্ত দণ্ড মুণ্ডের বস্তা (সেখানকার অপরাধে ফাঁসি পর্য্যন্ত দেবার তার একতিয়াবের মধ্যে ছিল)। তবুও বিপ্লবী বন্দীরা বাংলা ছেড়ে আন্দামানে পালাতে চাচ্ছে। বাংলাব জেলে তাদের জীবন অতিষ্ঠ। প্রতিটি পাহাবাদাব, প্রতিটি, অফিসার, পুলিশের নির্দেশ মত অত্যাচারের নগ্ন বুড়াল হাতে বিপ্লবী বন্দীদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে—সম্মাহীন ও নির্ভব দৃষ্টিপাতে। তাদের অত্যাচারে মথিত ভিন্নভিন্ন বস্তুমাথা শরীর ও মনের তন্তুগুলো যেন বিশ্বাস নিতে চায় কোথাও কোন

বিপ্লবের পথে

নিভৃত আডালে, গভীর বনের অন্ধকারে বা স্থাপদ সঙ্কুল রাজ্যে-
ক্ষণিকের বিশ্রামও উপভোগ্য। একেই আমরা ‘আন্দামানের মন’
বলতাম। ১৯৩০ সালের পর প্রথমবার যাত্রীদের মধ্যে ছিলো,
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার ও মেছুয়া বাজার বোমার মামলার আসামীরা।
বাংলা যত তেঁতে উঠলো, আন্দামান বন্দী নিবাস ততই ভরে উঠতে
লাগল। বা দাব অগুণ ভারতের অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো —
সেখানকার অগ্নি-পূজাবাদ দলকে দল আন্দামানে নির্বাসিত
হয়ে এলো। স্বাধীনতান দ্বর্গম পথ সার্থকতায় ভরে উঠলো।
ভারতের দৃষ্টি বদল, আন্দামানের দগুিত শৃঙ্খলিত সন্তানদের
দিকে। চাব’ পাঁচশো দগুিত বিপ্লবীর সমাবেশে নবক গুলজার
হয়ে উঠলো—আন্দামান যেন আর আন্দামান রইলনা।

বাংলা জেলের অত্যাচার শুরু হলো, ১৯৩২ সালের পর
থেকে। তাই প্রথমবার যাত্রী দলের মধ্যে আন্দামানে যাবার মন
ছিল না। অত্যাচারের আকার প্রকার সম্বন্ধে দেহ ও মনে
অনভ্যস্ত চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন মামলার অনেকই ছিলেন,
আন্দামানে। কর্তৃপক্ষের সহিত সংগ্রাম মূলক ব্যবহারে
কদম কদম পা ফেলে তারা প্রথমে একত্রে চলতে পারেন
নি। “জালিয়ান-ওয়াদা-বাগের” অত্যাচার যেমন ভারতকে
নিবিড় বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিল, তেমনি বিভিন্ন জেলের অত্যাচার
বিপ্লবী-বন্দীদের দল নিবিশেষে বেঁধে দিয়েছিল—যার মূল্য
ছিলো মনোরাজ্যে।

এক টানা জেল খাট্টা শুরু হলো। হাইকোর্টে বিচারের জঞ্জ
কোর্ট-কাছারীতে আমাদের আর বেঁচে হবে না। উভয় পক্ষের

বিপ্লবের গণ্ডে

কৌশলী ও বিচাবকবাহী তাঁর সমাপান করবেন। কিন্তু তবুও
আবার এক বিচাবে প্রথমানে দাঁড়াতে হলো। সিপাহী
মারবার অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, অনাবাবুল মুশল
সিংহা বিচার করবার জন্য জেল-গেটে এসে হাজির হলো।
আসামীদের মধ্যে আমবা দুইজন, নিরঞ্জন ও লেখক। ভাবলাম
—এ আবার কি ধরনের বিচার, এর আবার সাক্ষ্য বা কি
হবে? শুনেছিলাম, আমাদের বে. ম. হবে প্রতিরোধন. নবাব জুজ
কাটাঘিয়া লিখেছিলো কিন্তু পুলাশ কামিনার নারী এ. সহজ
বাস্তব প্রতিশোধ নিতে বাজী হয়. ন. ন. ন.
কলকাতা সহবে ওপব বাজী.
জেলের ইনসপেক্টর-জেনারেল সমসন.
দগুবে বিপ্লবীদের (বিনয়-দাদা-দাদেশ) আক্রমণে প্রাণ শাবালো
—সে তো মাএ, সর্দিনবাব.
কথা আছে। কাটাঘিয়া সাহেবের.
হলো। তাই এই বিচার বা.
রাখবার জন্য। আমবা পোষাক পরিচ্ছন্ন পূর্ন।
কুর্ভা-জাজিয়া-গামচা.
পোষাকেব গ্রন্থ্য) সিপাহী-সাহাবদের.
সামনে উল্লু প্রাঙ্গনে কতকটা সার্মিব.
গেলাম। জানালায় ভিত্তবদয়ে.
কাঠের চেয়ারে তাঁর মসনদে আসীন।
প্রতাপাশ্রিত কাটাঘিয়া সাহেব, জেলের অফিসার বুদ্ধ, পুলিশের
লোক আর সরকারী প্রসিকিউটার। বাহরে আমাদের প্রতি

বিপ্লবের পথে

হাকিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রসিকিউটর ঘটনার বর্ণনা দিতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের দিকে চেয়ে পুলিশের বর্ণনা শুনছেন—তাব মনে কেন কিসের খটকা বেঁধেছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “ডিফেন্ড” করবার উকীল কোথায়? নিম্প্রয়োজন, বলে আমরা উত্তর দিলাম। সবকার পক্ষকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের দণ্ডের পরিমাণ জানতে চাইলেন। কাটারিয়া সাহেব আমাদের দেখিয়ে উৎসাহ ভাবে বলে উঠল, শীর্ণদেহ লোকটির মোট সাজা হয়েছে, পঁয়তাল্লিশ বৎসর আর তার পাশের আসামিটির হাওড়ে, চৌদ্দ বৎসর। ম্যাজিস্ট্রেট মুখে কলম গুঁজে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে একটি কথা মাত্র কথা উচ্চারণ করলেন, “All the best” অর্থাৎ দণ্ড দবাব কোনও অংশই হয় না। তবুও প্রত্যেকেরই দুই বৎসর করে দণ্ড দিলেন। আগের দণ্ড গুলি খাটবাব পর এ দণ্ড চলবে অর্থাৎ মোট সাত চল্লিশ বৎসর দণ্ড খাটতে হবে, যদি আবার কিছু পবে যোগ না হয়।

অত্যাচারের যে দিন গুলি চলে যেতো, তাব বর্ণনা দেওয়া কঠিন। নিঃসঙ্গ সেলবাস, কাজের খাটনি এবং চারদিকে কড়াকড়ির বাবস্থাব মতো এতটা নিঃশব্দ পৃথিবী আপনা হতেই নেমে আসত বর্জমান পৃথিবীর আলো-বাস, জীব-ভান্ন, জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই যেন মহাশূন্যে মিলিয়ে যেতো। একমাত্র থাকত কয়েদ-জীবন আব তাণ্ডা নির্ভুবতার পরিবেশ। এত গহন ভ্রমস্রাব ভিতর নিজেব মনের ভিতর থেকে পথের সন্ধান করে বড়োতাম আর গুণগুণ করে কবির কথা উচ্চারণ করতাম, জীবনের যত পুড়া হয় নি সারা। মনের এই নিঃসীম শূন্যতার মাঝে পথ টেনে টেনে চলতে অনেকে

বিপ্লবের পথে

হয়ে যেতো পথ ও দিশে-কাণ্ড -মানুষ বিকৃতির লক্ষণের
প্রাথমিক উপাদান। ফবিদপুবেন বন্ধুবব স্রবেন কব, ঢাকাব
তকণ বিপ্লবী ভূপেশ বানার্জি, বাবশালেব যুগান্তব দলের
বিশিষ্ট কম্মী ফণী দাশ গুপ্ত ও ঢাকাব বিমল ঘোষ সহজ বসিকতা
হাবিষে ফেলল --জীবনেব গুণভাব চানবাব যে লেভার তা
বিকল হয়ে গেছে।

জেলখানায় বন্দাদেব বই দেওয়াব .ম ব্যবস্থা তা আমাদেব
বেলায় নিষিদ্ধ ছিলো। বই, পত্র দেও গলে হাও বদল হবে।
বদল-কণ বইখানা আবান অগ্নে হাও পড়বে সাবা জেলে
যুবে বেড়াবাব সম্ভাবনা ছিলো। বিশেষ নবে বইখানাকে
সাক্ষেতিকে পবিণা কবলে সবকাব পক্ষেব নোকেব। শুধু তাব
বাহক হবে অর্থাৎ সবকাব বকদ্ধ কম্মে না জনে সাহায্য কবে—
তাব জ্ঞাত কোনও বইই আমাকে দেওয়া বাবনা ছিল; এমন কি
কোনও থানা বাটি পযাস্ত আমান কাছ থেকে অগ্নত পাঠান নিষিদ্ধ
ছিল। এই নির্দেশেব পিছনে একটি গুপ্ত বহস্ত ছিল তাবা যে
খামখা কবেনি তা' আমি বুঝে পোবছিলাম। জেলে আসবাব
পব খাবাবেব থালা ও বাটী আমান খাবান হয়ে গেলে আবাব
বন্ধন শালায় চলে যেতো। থালা ৫ বাটীল তলায় এটি সাক্ষেতিক
চিহ্ন একে দিতাম যাতে সচেতন পাটি সভাদেব হাতে পবপেই
থালখানা উলটে সাক্ষেতিক চিহ্নট দেখতে পলে বুঝতে পাববে
যে এটা আমান ইঙ্গিত। সে তখন থালা খানার পিছনে
অগ্ন চিহ্ন দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকাব বোঝাবে। এই ব্যবস্থা হবাব
পব আমাব প্রয়োজন জানাব। এইভাবে কিছুদিন দেবাব

বিপ্লবের পাথ

পরও সভ্যদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই কিন্তু সরকারেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাই তারা আমার জন্ম থালা ও বাটি নির্দিষ্ট করে দিল এবং বইপত্র দেবার ব্যাপারেও সাবধান হলো। পুস্তকাদি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজের মনের ভিতরই পাদ চরণ করা ছাড়া উপায় ছিলনা। অনেক সময় দেওয়ালকে সামনে রেখে কথা বলতাম—দেওয়ালই হয়ে উঠত সঙ্গী। দেওয়ালের গায় চাঁনা নাবিকদের ছোট ছোট লাল-ইটের কুঁচি দিয়ে জাহাজের ছবি, নৌলনয়না কোনও রমণীর ছবি আঁকা। সাময়িক ভেবে মন দেখতো সমুদ্র, তার উদ্ভাল তরঙ্গ বেয়ে বিদেশী বণিকের পণ্যভরা জাহাজ গুলো ওপারে বণিকের ঐশ্বর্য ও বৈভবের লীলাভূমি আর এপারে নিঃস্ব ভারতভূমি।

মনের এই নিঃস্ক্রান্ততা ভঙ্গ হতো, বুটের খট্ খট্ শব্দে, পাহারা ওয়ালাদের পায়েব 'তালে আর বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত আলো দিয়ে আসামাকে দেখে নেবার মতো, যেন শিক কেটে বা মস্ত্র বলে সে ভেগে না যেতে পারে। তালাগুলি মাঝে মাঝে খট্ খটিয়ে উঠতো, আর শিকগুলি ঝন ঝন করে বাজতো—কি জানি, কেউ যদি বাইরে থেকে তালাগুলি খুলেই দিয়ে থাকে বা শিকগুলি কেটে দিয়ে থাকে !!

মনের খোঁরাক টেনে নিতাম অতীত স্মৃতির গহন গভীর থেকে, জীবনকে পোরয়ে শত সহস্র বৎসর ইতিহাসের পিছন পাতায় যেখানে সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে ভবিষ্যতের অনিবার্য ইঙ্গিত হিসাবে লেখা আছে।

গ্রীষ্মের গরম যেন দাবানল জ্বলে রাখতো, ডিগ্রীর ভিতর।

বিপ্লবের পথে

গবাদেব শিকের ভিতর দিয়ে নাক গলিয়ে বাহর থেকে হাওয়া
টানবাব চেষ্টা করতাম।—নাকটা যদি আবে একটু বড় হতো—
আমাব মামাদেব মত হতো।—কবে আবে .বশী কবে হাওয়া
টেনে নিতে পাবতাম।

কিন্তু আলোতো টানতে পাবছি না, সে তো দূরে পালিয়ে
পালিয়ে বেড়ায়।

ছোট বয়সে মানুষ হয়েছি অনন্ত আকাশের তলে, সীমাহীন
মাঠে পাবে, আলো-বাতাসের ঐশ্বর্যপূর্ণ সমাবেশ ও আড্ডার
মধ্যে। ছুটে যতাম—সূর্য্য ধবব জন্ম সন্ধ্যা বেলায় মাঠে
ওপাবে খালের ধাবে আব সেখান থেকে গায়েব দাঁদিমা সন্ধ্যা
“সূর্য্য” শিয়বেই পৌছে দেবাব ভবসা দিয়ে পাঠিয়ে দতেন,
মায়েব কোলে। তখন তো সাতা সাতা সাতা সূর্য্য পাঠিয়ে-
ছিলেন। আব এখন তো দেখছি, সূর্য্য বন্দী হয়ে রয়েছে
সাম্রাজ্য-দানবেব কাছে।

পাঁচিশ

কঠিন পাববেশের এত শূণ্য হাব মধ্যে কড় তালে এসে দেখা দিতো, ফাঁসীর দণ্ড নিয়ে ফাঁসীর আসামীবা, আমাদেবই নিকট প্রতিবেশী হ'য়ে।

কেটে বা সুবাপানে মজ্ব হয়ে, কেটে বা লালসাব উন্মাদনায়, কেউ বা অগ্নেব দৌলতনে আত্মসাৎ করবার প্রবল আগ্রহে, কেউ বা মর্যাদা বক্ষাব অবাধ্যতা, কেউ বা নিজ্জান মনের বিচাবহীন ইচ্ছিতে গুনের দায়ে প্রাণ হাবাবাব আদেশ পেয়ে হাজব হতো।

প্রতিবেশী হ'য়ে এলো নামা ভাগ্নে দু'জন। চাষীর ছেলে তাড়ি খেয়ে নশান মজাজে খুন পাঠেছিল পাউকে, তাই প্রাণ দহেব আদেশ হযে।। নামার চেয়ে ভাগ্নে বালক—তাজা ও নবীন যুবক—স্বাস্থ্য খেন উপ চিয়ে পড়ছে—প্রাণেব তেজ ফুটে বেনোচ্ছে। ফাঁসী যে তাদেব হ'তে যাচ্ছে, এ ধাবণা তখনও তাদেব হযান। কথ'-বার্তা চাল চলনে অতি সহজভাব পাবিস্কুট, উদ্বেগ-উৎকর্ষণ কানৎ লক্ষণ যেন নই। লাঠেবানকট প্রাণ-ভিক্ষাব মন্ত্রণি জবাব না আসা পযান্ত তাদেব ফাঁসী স্থগিত বযেছে মাত্র।

কানে ভেসে আস্ছে, ডিগ্রীগুলির পিছন থেকে ফাঁসীমঞ্চেব মহড়া—“লেভাব” (Lower) টানার শব্দ। আসামীদেব সমান

বিপ্লবের গথ

ওজনব দুইটি বালিপূর্ণ বস্তাকে মাঝে একেবারে ফাঁসী দড়ির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে লেভার টেনে দড়ি ও মঞ্চের একসাথেই পৰীক্ষা চলেছে। লেভার টানার সাথে ফাঁসীর মঞ্চ (কাঠের তৈরী প্ল্যাটফর্ম) সবে গিয়ে দড়ির সঙ্গে বাধা বসে। দুটি মানুষের মতই ফাঁসীর গহ্বরে ঝুলতে থাকবে। মহড়া শেষ হ'লে অতি প্রত্যাষে এক নির্দিষ্ট মাঝে বসে। জটিল কায়দায় এসে দাঁড়াবে, মামা-ভাগ্নে দু'জন—একই মঞ্চে—একই সময়ে। লেভার টানার সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরে পড়ে তাদের গলায় হাড়খানা। সঞ্চে মায়ে প্রাণশীল দেহ ঝুলতে থাকবে দড়ি ও মঞ্চ মাথাপাশ। জীবনবায়নের হয়ে যাবে দু'বে-ছদ্মবে। যাতে আর জীবনের স্পন্দন না থাকতে পারে তার জন্ত রয়েছে চাক্ষুশ। শস্ত্র-দাও থেকে নামিয়ে গহ্বরের থেকে টেনে এনে শব্দ উপাধারামূল কেটে দেওয়ায় ব্যবস্থা। তাবপব স্মরণে, কব'ব'লে বা বায়ুমনে বস্মাশ্রয়ী তার শেষ পৰিণাম।

বাণী ভিক্টোরিয়ান শতশাসন রয়েছে—পটোক প্রজাব বস্মাচরণ অলঙ্ঘনীয় ফাঁসা যাবা পৃথকমুহুর্ত পৃথক ব্যবস্থার ক্রটি নেই—গঙ্গাজল, গঙ্গামাটি, ফুল, স্নানাদি ও নৃতন বস্ত্র পরিধান—জিলাব ও জেলের মালিক শাস্তাযাটার মত জেল ও সাধাবণ পুলিশের বাহিনী নিয়ে আগমন। যজ্ঞদ্বারা মাথা ও মুখ ঢেকে দিয়ে এবং গলায় দড়ি পরিয়ে দিয়ে লেভার টানবে তাবা পাবে একটি কবে ভিক্টোরিয়ার গিনি ও তরল পানীয়। যাবা ফাঁসীমঞ্চে গহ্বরের থেকে দেহ টেনে আনবে, তাবাও বক্ষিও হবে না, পুণ্য কাজের পাওনা থেকে।

বিপ্লবের পথে

ওদের প্রাণ ভিষ্কার আবেদন না-মঞ্জুর হলো। বিকেল বেলায় মাথার টুপী বানাবার জন্ত লোক এলো। তারা এতেও বুঝতে পারলো না যে রাত্রি শেষেই তাদের ফাঁসী হয়ে যাবে। রাত তিনটার সময় সার্জেন্টরা এলো—জেগেই ছিলাম। সার্জেন্ট তৈয়ার হ'তে বলল—এবাব তারা বুঝতে পেরেছে। বুককাটা কান্না শুরু হলো, কত অনুরোধ, কত উপরোধ, কত আক্ষেপ, কত বিলাপ যেন অসহায় দুটি মানব শিশু বন্ড জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচবার জন্ত সমগ্র মানব ও প্রকৃতির কাছে তাদের সতর্কণ আবেদন জানাচ্ছে।

আর সময় নেই—ফাঁসীর নির্ধারিত সময় আগত। সিপাহীর দল ওদের হাত দুখানায় পিছন দিক থেকে শিকল পরিয়ে ও দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেল, ফাঁসীর মঞ্চে। যাবার পথটুকু কান্নার রোলে ভরে গেলো। তারপর কাণে এলো, লেভার টানার শব্দ—“খট”! সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের কাঠ খানা ছ'দিকে সরে গেল—দড়ির সঙ্গে বাধা ওদের দেহ পড়লো গহ্বরে। কান্নার রোল, বন্ধ হয়ে গেছে, চারিদিক নিথর-নিস্তব্ধ। সিপাহীরা নিঃশব্দে ফিরে এলো। চেয়ে দেখি, বুড়ো সার্জেন্ট “হাওড়া ব্রিজ”-হাওড়া ব্রিজের মত তার দেহ ছিলো উঁচু ও সেখানে পুলিশ সার্জেন্ট হিসাবে এক সময় পাহাড়া দিত বলে সে নামেই সে পরিচিত ছিল ও দুই তিনটি হিন্দু-মুসলমান সিপাহী আমার ডিগ্রীর সামনে বসে কাঁদছে—আমার চোখেও জল এসেছে।

সারাটা দিন যেন সমস্ত জেলটার উপর বিবাদের এক ঝুমোঁট

বিপ্লবের পথে

ভাব বিরাট ডানা মেলে বসে বইল। বেদনা বিহীন এই দিনগুলি মনের নিঃসাব নিঃশব্দতাকে ভেঙ্গে দিতে।

আবার গতানুগতিক চললো দিনগুলো। স্বাস্থ্য ক্রমেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। জেলেব নিম্নতম তৃতীয় শ্রেণীর খাবাবের ব্যবস্থা (বোধ কবি পুলিশ অফিসার মন্থন সেনেব কৌশলেই এ ব্যবস্থা হয়েছিলো) ভাত, ডাল ও তেতুল তাল যেন খেতে পারছিলাম। দেহ যদি চলতে না চায়, তবে এখানে কামা-ভাগ্নেব মত হাত পা বেঁধে সামনে টানবে নাকি? জেনেব হাসপাতালে চিকিৎসার যে সামান্যতম ব্যবস্থা ছিলো, তাতে এ প্রাণসম লোট সাহেবেব কুপায় উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে—এব আন বাচো 'চিকিৎসা যা' কিছু হয় একমাত্র ডিগ্রীগুলিব মধ্যেই হবে, তাব কাখাও তা হতে পারবেনা।

এবই মধ্যে সবল পদক্ষেপে বঙ্গবাহিন প্রসিদ্ধ গুণা খেদাব আগমন হলো। ঝটপট বিচার হয়ে এান কামার জুকুম হলো। একদিন মাত্র কয়ল মুড়ে সে প্রবোঠে শুয়ে বইল, তাবপন খেদা-গুণাব মনে যেন আব কোন গদই রইলনা। যাব কাছে মালুয হয়েছিলো, পিসীমা বা মাসীমা কামার আগে এসে ডিগ্রীব কোলে বসে কাঁদাকাটি কবলো। খেদাই তাকে সান্ত্বনা দিল—কাঁদো কেন?—আবার তোমাব কোলে ফিবে আসবো, নূতন মালুয হ'য়ে।

পিসীমা চোখের জল ফেলতে ফেলতে চলে গেলো। খেদা লাট-বেলাটেব আপীলে ভবসা বাখে নি—বলে ওটা নিরর্থক। তাব জামার মধ্যে বক্তেব সামান্য একটু দাগ পাওয়াতেই নাকি

বঁপ্‌লবের পথে

তাব ফাঁসীব জুকুম হ'য়ে গেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটির মৃগু কেটে ঝড়ে বাওয়া বন্ধ নিয়ে ও নাকি কোনও এক রমনীকে দেখাতে গিয়েছিল—সেইটাই হয়েছিল, ওর কাণ। পুলিশ-সাজেটের মুখে শুনেও পেয়েছিলাম যে পব পব পাঁচ ছয়টি হত্যার মামলা ওর বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু প্রথম মামলাতেই ফাঁসীব দণ্ড হয়েছে বলে সবকার বাকীগুলোই বিচার করবার জন্ত আর এগোয়নি।

ফাঁসার নির্দ্ধাবিত দিন এসে গেলো। বাত চারটার সময় অফিসার-সাজেট ও সিপাহীরা এসে ওকে তৈয়ার হ'তে বলল—খেদা তৈবী হয়েই আছে। ফাঁসী-নামা বলে একটি শপথ জেল কর্তৃপক্ষ পড়ে শোনােলো। তাতে লেখা ছিলো, তাদের কোনও দোষ নেই, তাবা সত্ৰাটের আত্মপরিবাহক—সত্ৰাটের আইন অনুযায়ী দণ্ডের ব্যবস্থা তারা কার্যকরী করছে মাত্র। খেদা স্নান কবলো, নতুন জামা কাপড়, সহজ ভাবে পবে নিল। সবাইর সঙ্গে আলাপ করতে করতে মঞ্চের দিকে যাবাব জন্ত আপন ডিগ্রী হ'লে পা বাডালো। খানিকটা চলবাব পব আমার ডিগ্রীর বরাবর এসে সে দাডালো এব সুপারিন্টেন্ডেন্ট পাটনৌ সাহেবকে অনুবোধ কবলো, যাবার পূর্বে সে একবার স্বদেশীবাবুব সঙ্গে দেখা কবে যেতে চায়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, হৃদয়বান লোক প্রত্যাখ্যান কবতে পাবলেন না। খেদা আমাব ডিগ্রীর কাছে এসে নমস্কার করলো—আশীর্বাদ চাইলো যেন সে নূতন জীবনে আমাদেব মতই সৎকার্যো অকুণ্ঠে প্রাণ ঢেলে দিতে পাবে। চেয়ে বইলাম, আশীর্বাদও ফবলীম। কোন গ্রহের ফেবে অত্যায়ের পথে পা বাডিয়ে সে জীবন তাবাতে চলেছে! খেদা চলেছে অচল

विष्णवे नमः

অটলভাবে—কাঁসী-মখেব দিকে। মখেব কাছে এসে সে একটি পান চাইলো, সিপাহীবা তাকে একটি পান দিল। তারপর সবাইকে নমস্কার করে আপন-থেকেই ঝেঁপে উঠে গেল খেদার জীবন শেষ হলো।

সিপাহী-সার্জেন্ট সব ফিবে যাবাব সময় বলে গেলেছে -
 'বাহাদূর হায়', 'শেবকা হিম্মত' 'জবাহ ৩ ঘাববাসা .নহি'। কাঁসী
 হ'য়ে যাবাব পব এমন স্বচ্ছ আবহাওয়া .জশে বড় একটা দখা
 যেতো না - সমস্ত জেলখানা বিমাদেব শবস্ত্রন থেকে মুক্ত অথচ
 সবাই .খদাব বিষয় নিয়ে আলোপ অবছে ।

গতান্ধাতিক ভাবন, বেগে বেবেছে। পায়েব শিকল যেন
আব টানতে পারিচিনা। 'পা'কেটে খাড়া টানা মহিষের গলাব
চামড়াব মত শক্ত হয়ে গেছে—মনগুনের মন বশী কটেছে বলে,
মনে হলো।। কাটিবাব বাঁধা এখন আব নতুন চপবাব বাঁধা
বেড়েছে কারণ আমাদের শাবীর দুর্জন সব হুড়ুডুডু।

আবাব একাদিন বিকেল এনায বেড়াবার সময় হাং কড়-
মুক্তিতে এক পাঠান যুবক আসামা হিসাবে দণ্ডা দিল। এসেই
আমাকে চিনতে নেবে সেলাম ঠিক হাংসমুখে হিন্দাতে বললো
“আপনি আমাকে চিনতে পাবেন নি, কোর্ট থেকে আপনাদের
গাড়ী ছাড়া—মেয়ে ও পুরুষের গাড়ী—অনুসরণ করে চলতাম
আবার পবেব দিন কোর্টে অনুকপ অনুসরণ করে যেতাম। আমি
ইলাম লালবাজার সংস্কৃত বিজ্ঞান বা হিন্দী লোক। অত্যাচারী স্লেট্টন
জমাদার এবং আবাব কয়েকটাকে গুলি করে এসেছি, বোন করি
সবগুলি হবে গেছে—এখন কাঁসীতে যাব। আমার মনঃকামনা

বিপ্লবের গণ্ডে

পূর্ণ হয়েছে ! বহুদিন প্রতীকার চেয়েও ফল পাইনি, আজ তার প্রতীকার করেছি” ।

সুগঠিত দেহ, ফর্সা রং, লম্বায় ছয় ফুটের ও বেশী জোয়ান পাঠান যুবকটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তখনি তাকে জেলের নিকৃষ্টতম খাবার দিলে, সে বাটিশুদ্ধ দূরে ছুড়ে ফেলে দিল, পরে কাঁসীর প্রতীক্ষায় রাত কাটালো, যেন ভোর হতেই তার আকাঙ্ক্ষিত কাঁসী তার শিয়রেই এসে যাবে।

তারই পাশে এলো, কাঁসীর দণ্ড নিয়ে এক বিকৃত মস্তিষ্কের এংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক—বয়স আঠার হবে।

নিজেবই আপন বোনের স্বামীর কটুকৃতিতে ক্ষিপ্ত হয়ে খাবার টেবিলের ছুরিখানা নিয়ে তার বুকে মেরেছিল এবং অবস্থা বুঝতে পেরেই রক্তমাখা ছুরিখানা নিয়ে সে কাঁদতে কাঁদতে নিকটস্থ থানায় গিয়ে নিজের দোষ স্বীকার করেছিল। তারপর থেকে কেউই তাকে সুস্থ মস্তিষ্ক আর দেখেনি। হত্যা করবার সময় সুস্থ মস্তিষ্ক ছিল বলে হাইকোর্টের বিচারপতি কষ্টে লো সাহেব নাকি এর পরবর্তী মানসিক অবস্থার বিচার করেন নি।

পাটনো সাহেব জেলের কর্তা হলেও ডাক্তার এবং তার উপর তার আবার হৃদয়ও রয়েছে। তিনি কখনও পাগলকে কাঁসী দেন নি। আসামীকে প্রাণ ভিক্ষার জন্য আবেদন করতে বললে সে চাকুরীর আবেদন করে, যৌশ্বন্তের মত হাত ছুথানাকে চার পাঁচ ঘণ্টার মত শূণ্যে ভুলে রাখে। ঘুমের বালাই নেই, খাবারের তাগিদ নেই।

কাঁসী দেবার দিন পড়ে গেছে। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বিপ্লবের পথে

ফাঁসী মঞ্চের পৰীক্ষাও শেষ হয়েছে। কিছু শোনা গেল কলকাতার পাদবীর দল বডলাটের কাছে আবেদন জানিয়েছে।

ফাঁসী হবার আগেই দিন খবর এলো—ফাঁসীর দণ্ড মকুব হয়েছে। ছেলেটি নাঁচীর পাগলা গারদে চলে গেলো।

পাঠান সিপাহীটির সামরিক পেন্সনভোগী বৃদ্ধ বাপ ছেলের এই অপ্রত্যাশিত ভ্রাসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেই কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলো। সে ন্যাক ভাক বলছে—ছেলেকে পাগল ‘বনতে’ বুলো তবেই সে হয়তো বাঁচতে পাবে। এই ঘটনায় পুলিশের মর্গদাও শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়েছে, তাই তাবা মামলা করতে চাচ্ছেনা। ছেলে বাজী হচ্ছেনা—শেষ পর্যন্ত বাবার চোখের দল দেখে সে রাজী হলো। কিছু পাগল ‘বনবে’ কি কবে? তাব জন্য সে উপদেশ চাইলো! তাকে বললাম,—খাবার খাবেনা—মা খাবে যেন আনিচ্চায় বা লুকিয়ে—বেশী খাবারই ছুড়ে ফেলে দিবে। কাউকে সামনে পেলেই ভেঙে মাবতে আসবে। রাতে কখনও ঘুমিওনা। গটুকু ঘুমাতে দিনের বেলায়। দিনের বেলায় ঘুমালে বাঃ জাগতে তোমাব অসুবিধা হবেনা এবং তখন চোখ দুটা এমনই পাগলের মতন লাল দেখাবে। মলমূত্র যেখানে সেখানে ত্যাগ করবে ইত্যাদি। এই ভাবে সে ছুঁচর মাস চলাব পৰ তাকে পাগল বলে কোর্ট সিদ্ধান্ত করলো, অবশ্য পিছনে নশ্চয়ই কোনও ইঙ্গিত ছিল। তাকেও নাঁচী পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিল।

ছািবিশ

একদিন একটি সার্জেট অতি সংগোপনে জানালো, ভারতে ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং বাঙানৈতিক উন্নত শ্রেণীভুক্তির দাবাতে আন্দামানের বিপ্লবী বন্দীরা অনেকদিন থেকেই অনশন শুরু করে দিয়েছে এবং তাদের দাবীর সমর্থনে দেশব্যাপী প্রচার ও আন্দোলন আবিস্ত হয়েছ। দেশের বড় বড় নেতারা এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

বাইরের জগৎ থেকে ওবা আমাদের এমনি করে বিচ্ছিন্ন করে বেখেঁড়িল যে অনশনের কোনও খবরই আমাদের নিকট তখন পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অনশন সহ্যে কিংকর্তব্য স্থির করবার জন্য নিরঞ্জনের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আরও সঠিক না হলে অনশনে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সমীচীন হবে না। এরই মধ্যে সংবাদ এলো যে আন্দামান থেকে পশ্চিমবঙ্গ ছাটার জন্য বিপ্লবী বন্দীকে ফিরিয়ে এনে আমাদের সারিবদ্ধ ডিগ্রী জেলার দরপ্রাপ্তি বেগেছে—সেখানে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেল না। তাদের আগমনের সংবাদ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, আন্দামানে অনশন সমাপ্ত হয়েছে অথবা সমাপ্তির অধ্যায়ে এসেছে। মাত্র কয়দিন পর পরিচিত একটি মুসলমান ডেপুটি জেলার নিঃশব্দে এসে জানালেন গবর্নমেন্টের চিঠিপত্র ও নির্দেশ হতে মনে হয় আপনাদের দু'জনকেই

বিপ্লবের গথে

আলিপুর জেলে শীঘ্র স্থানান্তরিত হইবে, আমবা তখন 'নন্দেশ্বর' অপেক্ষায় আছি। তিনি আরও জানাণেন অত্যাচারতলব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দৈনিক কাগজ গুলো ফোর লিখছে। পরে জানতে পেরেছিলাম যে প্রেসিডেন্সি 'ডলোর' নামক এক বাঙালি গোপনে সংবাদ পাঠিয়ে এই প্রচারে সাহায্য করোছিলেন। তারপর তিনি তাব বড় ভাইর মৃত্যুর এক মর্মস্পর্শক সংবাদ দিলেন। তাবই মুখের কাহিনী লিখছি। -

আপনি জানেন, আপনি ও আপনার বন্ধু ধীরেন বাবু (বাবেন্দ্র কুমার মুখার্জি) যখন বঙ্গীয় কংগ্রেস বোম্বাই সম্মেলনকে মারবার অভিযোগে জলপাইগুড় জেলে বন্দীকৃত হইলেন, সেই সময় (১৯২১-২২ সাল) আমিও দাদা ছিলাম সেখানে ডেপুটি জেলাম। দাদা ছিলাম নিঃশাস সাদামির ও গোবেচারা প্রকৃতির মানুষ। শাসনাব্যবস্থার উচ্চমাত্রায় অসুস্থতার সমর্থন করবার জন্য একখানা চিঠি ঢাকার পাঠান টমাল ও দেশ নেতা শ্রীমত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট লিখে দাদার নিকট দিলে দাদা জেলের সারাবর্ণনা সহ ১০০ খেয়ালকার সুপারভিন্টেন্ডেন্ট ও সিনিয়র মাস্টার ইত্যাদি দিয়ে পাশ করিয়ে চিঠিখানা ডাকে দবার জন্য নিজের টেবিলের ওপরই বেখে দেন। ইতিমধ্যেই ওলাল রাণী গোহন্দা অফিসারটি কোনও উপলক্ষ্যে জেলের ফটকের ভিতরে এসে হাজির হয় এবং চিঠিখানা তাব টেবিলের ওপর দেখতে পায়। দাদাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারে যে আপনার লিখিত চিঠিখানা জেল সুপারভিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক পাশ হয়ে ডাকে দেবার

বিপ্লবের পাত

অপেক্ষায় মাত্র আছে। তখন সে দাদার বিনা অনুমতিতে চিঠিখানা নিয়ে যায় এবং জেলার পুলিশ কর্তা হডসন সাহেবকে (যে ঢাকাতে দীনেশ, বাদল, বিনয় কর্তৃক গুলিতে জখম হয়েছিল) দেখিয়ে দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে সে বিপ্লবী বন্দীদের চিঠি পুলিশকে না দেখিয়ে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করেছিল। ফলে দাদার চাকরিটি যাবার মতনই অবস্থা হয়। জে, এম, সেন গুপ্ত মহাশয় তখন জলপাইগুড়ি জেলে রাজবন্দী। তিনি ঘটনাটি জানতে পেরে জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিষ্টার ঈয়ংকে বলে দাদার চাকরিটি অতিকণ্ঠে বজায় রাখতে সমর্থ হলেন কিন্তু দাদাকে সরাসরি ডেপুটির পদ হতে অপসারণ থেকে তিনি রক্ষা করতে পারলেন না।

দাদার সংসার ছিল বড়, কেরাণীর সামান্য আয়ে তার সংসার চালানো অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে দাদা ববিশাল জেলে বদলী হয়ে এলেন। সেদিন বাৎসরিক জেল পরিদর্শনের সময় কারাধ্যক্ষ মিষ্টার অন্তপ সিং এর কাছে দাদা তার অতীত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিবেদন করলেন যেন তিনি তাকে ক্ষমা করে তাকে পুরাতন পদে বহাল করেন কারণ তিনি স্বল্প আয়ে তার বড় সংসার চালাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। কারাধ্যক্ষ মিষ্টার সিং দাদাকে মুখের ওপরই জবাব দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তার গুরুতর অপরাধের কোনও ক্ষমা হতে পারে না এবং তাকে চিরকালই কেরাণীর পদে থাকতে হবে। দাদা সেই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে নিজের হৃৎকের অবসান করলেন।

বিপ্লবের পথে

চোখের জল ফেলে সে চলে গেল। সাম্রাজ্যবাদীর জীবাংসার জঠরে নিরীহ আমামুল্লার প্রাণ দিতে হলো। স্মৃতির পাতায় অলিখিত শহীদেব তালিকায় আমামুল্লা এসে যোগ দিল। আমামুল্লাকে ভোলা যায় না।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আমরা স্থানান্তরিত হলাম। আন্দামানের অনেক বন্ধুরা সেখানে এসেছেন। বহুদিন পর তাদের সাথে আবার মিলন হলো।

কিন্তু বড় কর্তাদের নীতি বদলের সূচনা হলেও খুদে শাসন কর্তাদের আচার ব্যবহার বা মতি গতিতে তখনও কোন পরিবর্তন আসেনি। তিন চার দিন পর জেল-সুপারিন্টেন্ডেন্ট আম্মাস্বামী আয়েঙ্গার আই, এম, এস রাজকার মতনই জেল পরিদর্শনে বের হয়ে আমাদের রাজনৈতিক বন্দীদের সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলির সামনে দলবল সহ উপস্থিত হলেন। তাকে আমি আমার অর্গলবদ্ধ প্রকোষ্ঠের ভিতর হতে আবেদন জানালাম যেন তিনি নিরঞ্জন ও আমার পা'ছখানাকে ডাঙাবেড়ী থেকে মুক্ত করে দেন। তিনি সরাসরি অস্বাকৃতি জানালে কারাধ্যক্ষকে লিখবার জন্তু আবেদন পত্র চাইলাম কিন্তু তাও তিনি প্রত্যাখ্যান করতে মোটেই দ্বিধা করলেন না। তারপরে হাইকোটে টিটাগড় মামলায় আমাদের পক্ষ সমর্থনকারী এড্‌ভোকেট ও ব্যারিষ্টারদের নিকট চিঠি লিখবার জন্তু অনুমতি চাইলে, তিনি তাও নিঃসঙ্কোচে অগ্রাহ্য করে প্রকোষ্ঠের বারান্দা থেকে দল বল নিয়ে অণু প্রকোষ্ঠের দিকে এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘ জেল অভিজ্ঞতায় বাঙলা বা বাঙলার বাইরে এযাবত

বিপ্লবের গথে

কোনও ইংরেজ বা ভারতীয় অফিসাবেন কাছ থেকে অভিযোগ করা নিয়ে এমনতর তাজ্জিল্যকর জবাব পাইনি। জবাবের ওপর রুঢ় জবাব পেয়েছি, জবাবের ওপর লাঠি বা গুলোর ভয় পেয়েছি কিন্তু এ বকম তাজ্জিল্যকর জবাব দেবার মত নাচতা কখনও দেখিনি। এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে তাই আমার মন কথো দাঁড়ালো।

তাকে ধৈর্য্যেব সঙ্গে আমার কথা শুনবার জন্য পিছন থেকে হেঁকে ডাক দিলাম ও আমাদের খায়া দাবীকে অস্বীকার করবার কারণ জানতে চাইলাম। উত্তরে পেলাম রুঢ় জবাব, “shut up” (চুপ করো)। পারিষদ দল “shut up” এর প্রতিধ্বনি তুললো। বন্দীর অভিযোগ বুঝবার বা শোনবার কোনও ইচ্ছাই এতে নেই—জেলখানায় জেলকর্তার আগমন-নির্গমনের সাথে বন্দীদের অভিযোগ শুনে যে প্রতিকারের সামান্যতম ব্যবস্থা আছে, তার প্রয়োজন যেন সুপারিন্টেন্ডেন্টের মন থেকে উঠে গেছে। উপবস্তু কাট জবাব নিয়ে বন্দীর হাত পা বাধাব মত মুখ বাধাব প্রচেষ্টা যেন অসহনীয় মনে হলো। তাই তাকে এবার “shut up” (চুপ করো) এর জবাব দিতে সূক করলাম। জবাব শুনে দলবল নিয়ে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলেন ডিগ্রী পূলে আমাদের সায়েস্তা কববার জন্য। তাবপর কি-যেন-কি ভেবে বাইরে টাঙানো আমার কয়েদ পঞ্জীখানা—(History ticket) উলটিয়ে শাস্তি লিখবার জন্য বন্দীরা উঠালেন। তাকে বললাম, অনর্থক মুখের মতন শাস্তি দেবার বা ভয় দেখাবার কোনও মানে নেই কারণ আমার দেহে অথবা আমার কয়েদ পঞ্জীখানার মধ্যে শাস্তি দেবার কোনও জায়গা নেই।

বিপ্লবের পথে

জেলেব বড সাহেব যখন কলম ধবেছেন তখন নিজের মর্যাদার খাতিরে শাস্তি তার লিখতে হবে। নিজ্জন কারাবাসেব ছকুম লিখে দলবল নিয়ে তিনি প্রস্থান কবলেন। তখনি সাঙ্কেট সিপাহীবা আমাকে নিজ্জন কারাবাসে নিয়ে গেলো—আলিপুর জেল থেকে পালাবার সময়কার ডিগ্রীগুলিব নকটস্থ (চৌদ্দ নম্বর ডিগ্রীর) একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে।

ডাণ্ডাবেরী কাটাবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নিজ্জন কারাবাসে অনশন শুরু করে দিলাম। জেলেব রাজনৈতিক বন্দী বন্ধুবা সে খবব পেয়ে আল্লাস্বামী আয়েজাবের সাথে দেখা করলো এবং সঠিক অবস্থা জানবার জন্য আমার সঙ্গে নিজ্জন কারাবাসে দেখা করবার অনুমতি চাইলো। প্রতিনিধি স্থানায় ছাঁজন বন্দাকে বন্ধুবর সুনীল চাটার্জি (ষ্টেটসমান সম্পাদক ওয়াটসনকে গুলি করে হত্যাব প্রচেষ্টায় যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত) ও পবেশ গুহকে (আফঃ-প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত) অনুমতি দিলে তাবা এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো। আল্লাস্বামী তাদেব জানিয়েছিলেন যে আমি তাকে গানি দেবার ভণ্ড ক্ষমা প্রার্থনা কবলে তিনি নিজ্জন কারাবাস থেকে মুক্তি দিয়ে আমাকে বন্ধুদের সঙ্গেই একত্রে রেখে দিবেন। আল্লাস্বামীই প্রথম দোষ করে ছিলো তাই সে নিজের অণ্ডায় ও ভুলেব জন্ম দোষ স্বীকার করলে, আমিও নিজের দোষ স্বীকার করতে পারি কিন্তু তাব পূর্বেকিছুতেই তাহতে পাবে না—আমার একথা বন্ধুবা স্বীকার কবলো এবং আল্লাস্বামীকে তাবা তা জানিয়ে দিল। তাকে জানাবাব পরও অবস্থা অপরিবর্তিত রয়ে গেল। সেদিনমাত্র আন্দামানে জীবন পণ করে বন্ধুদেব অনশন

বিপ্লবের পথ

করার কথা বিবেচনা কবে আমি অনশন ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। আমার অনশন জ্ঞানত অবস্থা দল নিবিবশেষে সেখানকার সকল রাজনৈতিক বন্ধুদের বিড়ম্বিত করে তুলবে কারণ রাজনৈতিক দাবীতে আমবা প্রত্যেককেই প্রত্যেকেই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

শীঘ্রই আল্লাপানী আয়েজাব আলিপুর জেল থেকে অন্ম জায়গায় বদলী হয়ে গেলেন। তার জায়গায় এলেন একজন বাঙালী-কর্ণেল এম, দাস আই, এম, এস, । মেদিনীপুর জেলে থাকার সময় রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য তিনি গুনাম অর্জন করেছিলেন। একটি ঘটনাতে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কয়দিনের মাত্র ছুটিতে তিনি তার স্ত্রীকে রেখে কোথাও কার্যোপলক্ষে গেলে মেদিনীপুর জেলের কুখ্যাত কাজী উপাধিবাহী মুসলমান ডালাবতি ও একজন বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাদের মনের ঝাল মচাবার জন্য দুইজন রাজনৈতিক বিপ্লবী বন্দীকে মৃগেন্দ্র ভট্টাচার্য (দাসপুর দানোগা হত্যা মামলায় দণ্ডিত) ও কৃষ্ণদ চক্রবর্তী (বঙ্গা কাম্পের পলাতক ও আগরতলা ডাকাতির মামলায় দণ্ডিত) কে বেত মারবার চক্রান্ত কবে।

বেত মারবার আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন সেই খবরটী কর্ণেল দাসের বিদ্রো পত্রী জানতে পাবেন এবং জানতে পেরেই স্বামীকে তখনই তারবার্তা পাঠিয়ে দেন। তার পেয়ে কর্ণেল দাস বেত মারবার ঠিক পূর্বেই পৌঁছে যান এবং কাজীর “পাজী” আয়োজন সম্পূর্ণ বার্থ করে দেন।

বন্দীদের পথে

কর্ণেল দাস গালিগুব .জলে .পৌছে নিজন কাবাবাসে
 আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি সব জানতে চাইলে তাকে
 সব খুলে বললাম। অল্পপণি কাবাসাক হিসাবে প্রোসডেন্সী
 জেলে থাকাকালীন ডাঙাবেড়ী ও তার কষ্টের কথা সম্বন্ধে
 নিরুদ্বেগ মন নিয়ে যখন কথা বলছিলেন তখন তাকে যেমন
 করে বলছিলাম— Escape from prison is the
 dream of every freedom fighters- shoot or kill
 we shall try it as long as our country is in
 bondage—দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক স্বাধীনতা-
 কামী বন্দীর পালানো একটা নৈতিক দৃষ্টি—। আমরা গুলিই করো
 অথবা মেরেই ফেলো, তাতে আমাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন
 হবে না কিন্তু তৎসঙ্গেও .জলখানায় বন্দীদের মৃত্যুদের নিয়ন্ত্রণ
 উপযোগী খাবার দাবাও থাকবে ব্যবস্থা . আমাদের কষ্ট হবে,
 তেমনি কর্নেল দাসকেও বললাম যে ডাঙাবেড়ী থেকে স্বাধীনতা
 ভাবের পা দুখানাকে মুক্ত করতে হবে। কর্নেল দাস রাজী হলেন
 এবং আশ্বাস দিলেন যে এক মাসের মধ্যেই তিনি ডাঙাবেড়ী
 খুলে দেবেন। ইতিমধ্যে তিনি ডাঙাবেড়ীর জায়গায় হালকা
 শিকল-বেড়ী পরিয়ে দেবার আদেশ দিলেন। একমাস পর তিনি
 ডাঙাবেড়ী থেকে আমাদের পা দুখানাকে মুক্ত করলেন।

কটু জীবনের সজ্জা হিসাবে দাখকা . তারা পায় ঝড়িয়ে
 ছিল এবার তাদের বিদায় .দলান .পাড়নের প্রদান আঙ্গিক-
 চিহ্ন দূর হলো। .পাড়নের 'অমাদের'ওপন মরমিকা পাত হলো।
 দেহের উপর দাগ কাটার মত মনের মধ্যেও তারা অসংখ্য

বিপ্লবের গথে

ছোট বড় দাগ কেটে রেখে গেছে। নিকটতম বন্ধুর পাশে দূর বিদেশীর আত্মীয়তার কণ্ঠ এসে জীবনের আদর্শকে পূর্ণ করেছে— অগ্নির দাহিকায় কৃত্রিমতার মুখোস খুলে গেছে—সঙ্কীর্ণ গণ্ডি কেটে মানবিক বিচার বোধের মধ্যে আদর্শ বিস্তার লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন আমাদের স্বপ্নের ছয়ার পার হয়ে বিশ্বের দরবারে হানা দিচ্ছে—সৈনিকের আত্মত্যাগের বাস্তব ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দাবী—“এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন-- আসিবে সে দিন আসিবে।”

সত্যশ

হাইকোর্টে টিটাগড় মামলায় আপীল চলেছে। এবারপাতি কষ্টেলোসাহেব ট্রাইব্যুনালের বিচারে সম্মুখীন। দণ্ড বাড়াবার জন্য পুনর্বিচারের কথা তুলেছেন কিন্তু গভর্ণমেন্টেব আইন উপদেষ্টা নাকি বলেছেন যে ট্রাইব্যুনালের দণ্ড বাড়ান যাবে না বা পুনর্বিচারেব জন্য আবার নতুন কবেক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাবে না। তাই আমাদের দণ্ড যা ছিল তাই রয়ে গেলে।

কয়েদ-পঞ্জীতে গান্ধী মেয়াদেব সীমাবদ্ধতা, ১৯৭১ সাল। ১৯৭১ সাল পেৰিয়ে বয়েছে, পাশ্চিম্বেব বামাসং। বা'লায় ৯ ১৯৭১ সাল এ তাব নিকট সময়েব চ'চাবজন মেয়াদেব দোসব আছেন—কুমিল্লাব “ইটাগোলা মামলায় বিবাজ দেব বরিশালের ফণী দাশগুপ্ত, “আন্তঃপ্রদেশিক্বেব” প্রভাৎ চক্রবর্তী ও জিতেন্দ্র গুপ্ত ও “হিলিব” প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী—সঙ্গীত অভাব নেই।

আদর্শবাদেব বিচাবে বিপ্লবী বন্দাদেব ভিত্তিৰ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জাতীয়তাবাদেব আদর্শেব গভীর বাহবে অনেকের মন ছুটে চলেছে—মার্ক্সীয় দর্শনে, লেনিনবাদে বা ষ্টালিন পন্থায়। নিছক আদর্শেব বিচাবে জাতীয়তাবাদেব গণ্ডীকেটে বেব হয়ে গেলো এক দল, তাদেরই টানে আবার একদল। এমনি কবে জাতীয়তাবাদেব পুরাতন ভিত্তি খসে পড়তে লাগল। দৃষ্ট

বিপ্লবের গাথা

বিপ্লবীদের গামূল মানসিক পারিবর্তনে পুরাতন দল ও সংহতির রূপান্তর ঘটলো। জাতীয়তার স্বপ্নে-গড়া বাংলা দেশ দীর্ঘকাল ভারত রাষ্ট্রীয় গগনকে উদ্ভাসিত করে বেখেছিল—সুদীর্ঘকালের এই বৈপ্লবিক পটভূমিকায় পরিবর্তন হলো। ইংরেজ রাজশক্তি বিপ্লবীদের সবল আঘাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় নূতন পটভূমিকাতে প্রস্তুতি শুরু কবলো।

বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির দাবিতে দেশেব জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি প্রচেষ্টায় এগিয়ে এলেন। স্মার নাজিমুদ্দিন তখন ছিলো বাংলার প্রধান মন্ত্রী ও হোম-মিনিষ্টার। মহাত্মা বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তি—বিবোধী শক্তি গুলোব সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মুক্তিকে সহজ কবাব উদ্দেশ্যে বিপ্লবীদের কাছ থেকে অহিংসার প্রতিশ্রুতি আদায়ের প্রচেষ্টা কবলেন। অনেক হাঁটাইটি ও ঘাঁটা-ঘাঁটিব পর মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে ফরে গেলেন—বন্দী মুক্তির প্রচেষ্টায় মহাত্মার ব্যক্তিগত নাজিমুদ্দিন বা অন্যান্য রাজপুরুষদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হলো না। ইংবেজ সাম্রাজ্যবাদীদের “ডায়ার নাজিম” প্রভুদের নিকট বিশ্বস্ততার পরিচয় দিল।

গণ আন্দোলনকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তির বিষয় নিয়ে সবকার বন্দামুক্তি পরামর্শ কমিটি নাম দিয়ে একটি কমিটি গঠন কবলেন।

অক্সাপদ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়কে ও তার সভ্য পদে মনোনীত কবলেন কিন্তু হাল চাল দেখে শরৎবাবু বুঝতে পারলেন

বিপ্লবের পথে

যে সরকার তাদের সুপারিশ মেনে নেবেনা তাই তিনি কমিটি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কমিটির কাজ বেশী দূর এগোলনা। ছাঁচার জনকে তারা সর্ভাধীনে মুক্তির সুপারিশ কবলেন। কিন্তু অনেকেই তা গ্রহণ কবলেনা। সর্ভাধীনে মুক্তি অগ্রাহ্য করলো মেদিনীপুর বাজ্জ-ইত্যা মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডে দাণ্ডিত, শাস্তি সেন। বয়স অল্প বলে কমিটি তাকে মুক্তির সুপারিশ করবেছিলো কিন্তু সর্ভাধীন মুক্তি নামা সে অস্থান বদনে অগ্রাহ্য করে অন্যান্য সবাইব মত তার দীর্ঘ দণ্ড ভোগ কবে যেতে লাগলো।

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্য থেকে নেয়ে বন্দীদের ও বিনা। বচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের বিভিন্ন ক্যাম্প ও জেল থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলা সরকার মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। নতুন শাসনতন্ত্র বলে গঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস মন্ত্রী সভা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দাণ্ডিত বন্দীদের বন্দীদের জেল থেকে মুক্তি দিল। একমাত্র এয়ে গেল বাংলা ও পাঞ্জাবের দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা। জনমতের দাবার কাছে শেষ পর্যন্ত অকংগ্রেসী পাঞ্জাব মন্ত্রীসভা ও তাদের জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো। বইল শুধু বাংলা দাণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীরা—সংখ্যায় প্রায় আশীজন। তাদের ছুই অংশে ভাগ কবে, এক অংশকে আলিপুর সেনট্রাল জেলে, অপর অংশকে দমদম সেনট্রাল জেলে রেখে দিল। বাংলা সরকারের নীতিতে বোঝা গেল যে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি বিনা আন্দোলনে সম্ভব হবে না। অন্যান্য প্রদেশে এমনকি পাঞ্জাবে সম্ভব হলেও, বাংলার মুক্তি বিরোধী শক্তিশালী গুরুত্ব ও সমাবেশ ছিলো বেশী। বাংলায় এই কঠিন

বিপ্লবের পথে

প্রশ্নের সমাধান করবার জন্য নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হলো।

আমাদের স্পষ্টই মনে হলো যুরোপীয় বর্ণক সভা ও লীগের সম্মিলিত বাধাকে শিখিল করবার ওপর একমাত্র দণ্ডিত বন্দীদের মুক্তি নির্ভর করে। আমরা বিচার করলাম যে ১৯৩৫ সালের আইনে গঠিত মন্ত্রীসভাকেও দেশবাসীর বিশ্বাস পেতে হলে রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির প্রশ্ন সমাধান করতে হবে।—তদুপরি ভারতের পতি ব্রিটিশের আন্তরিকতার প্রশ্নও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এসব বিবেচনা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে যদি আমরা অনশন শুরু করে দেই তবে দেশের গণ আন্দোলনের প্রবল আঘাত ওদের সম্মিলিত বাধাকে ভেঙ্গে দিয়ে আমাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে স্বায়ত্ত শাসনের আসল পরিচয়টুকু সমগ্র দেশ উপলব্ধি করবে ও বিপ্লব-আন্দোলনের শক্তি তীব্রত বৃদ্ধি পাবে। এই বিচারের পর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে, ৭ই জুলাই, ১৯৩৯ সাল, আমাদের অনশন শুরু হয়ে গেলো। দমদম জেলের বন্ধুবাও খবর পেয়ে অনশনে যোগ দিল।

অনশন মেটাবাব জগু মহাত্মা গান্ধী তার সেক্রেটারী ভ্রীমহাদেব দেশাইকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সাথে হলেন ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়। মুক্তির প্রশ্নে তাঁরা অনশন মেটাতে পারলেন না। বন্দীরা যখন অনশনে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসে গেলো, তখন সুভাষ'চন্দ্র নিজে এসে অনশন স্থগিত রাখবার জগু সবাইকে অতুরোধ করলেন। সুভাষ চন্দ্র ছিলেন, কর্মীপুরুষ।

বিপ্লবের পথে

সংগ্রামের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন দাও-বিপ্লবী বন্দীদের মুক্তি প্রবল আন্দোলন ও সংগ্রামের . . . তবু দিতে একমাত্র সম্ভব। মুক্তি যতই জরুরী . . . ক না কেন, ওন তাব দাবা নাট পেরিয়ে তুর্গেব গায় . . . পদনি . . . ওন না কেন প্রতিক্রিয়াশীল স্বার্থবাদী শক্তির নিকট যে . . . তব . . . কান . . . দাম নেই—এদের নিকট একমাত্র দৃশ্য হলো . . . শীত . . . পলিচয় . . . সে কথা স্মৃতিচারণ . . . ওন . . . তব . . . তিনি . . . শত্রু . . . সত্যাবেষ . . . কব . . . বাব . . . জ্ঞান . . . নয় . . . চাইলেন—নেতৃত্বের উদ্যুক্ত দাবী। স্মৃতি . . . চন্দন . . . দাবী . . . সবাই . . . মেনে . . . নিলো— . . . তখন . . . ১৯১৮ . . . ১৯৩৯ . . . সাল।

এই সময় আমবা বাইন থেকে . . . লাব . . . ওন . . . নিয়ন্ত্রণ . . . দিক . . . কাগজ . . . পড . . . তাম। . . . সংবাদ . . . চূর্ণ . . . ম . . . সংবাদ . . . আচরা . . . পাব . . . দ . . . ছিলাম। . . . মেছুয়া . . . বাজা . . . বোমার . . . মামলা . . . য . . . দাঁড় . . . ত . . . শ . . . ম . . . ক . . . ব . . . গুপ্ত . . . ছিলেন . . . আমা . . . দেব . . . পত্রিকা . . . পড় . . . য়ে . . . শে . . . নাবা . . . ম . . . ঠি . . . ঠা . . . গ . . . ড . . . গ . . . ড . . . কবে . . . তিনি . . . পড়ে . . . যেতেন, . . . আমবা . . . তাব . . . তাব . . . পাশে . . . ঘি . . . বে . . . বস . . . তাম . . . শোন . . . বার . . . জ . . . গ . . . আমবা . . . প্রত্যেকে . . . ত . . . ছিলাম . . . শচীন . . . ক . . . ব . . . গুপ্ত . . . ওন . . . এক . . . একটি . . . প্রহরী . . . ব . . . ত . . . ।

আটশ

বাইরের রাজনৈতিক আকাশে মেঘ জমে উঠেছে—মেঘের গুরু গুরু ডাক কানে আসছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজিত জার্মানী আবার নিছক জাতীয়তার বর্ষ্য পরে সমগ্র যুরোপের ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান সামরিক অফিসার হিটলার জার্মান জাতির নায়ক। ফিল্ড মার্শাল ফন্ হিঙেন বার্গের সামরিক শক্তি ও কৌশলকে রূপদান করে জার্মান জাতিকে পৃথিবীরবুকে শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসাবে দাঁড় করতে সে বদ্ধ পরিকর। “ফুরার” হিটলার জার্মান জাতির মধ্যে প্রেরণা জাগিয়েছে।— প্রেরণা, ফুরারের নেতৃত্বে বৃহত্তর জার্মানী সৃষ্টির অভিযান, তা সে যেখানেই হোক না কেন। ফ্যাসিষ্ট মতবাদী ফুরার সাম্যবাদী রুশিয়াকে আঘাত হানবে—তা অনিবার্য সত্য, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রী ইংলণ্ড সেই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার নিশ্চিত ভরসা কোথায়? জার্মানীর চিরশত্রু ফরাসী দেশ তার আক্রমণের অন্ততম প্রধান ভাগ—তাই ফরাসীরা জার্মান প্রান্তে “ম্যাজিনো লাইন” বানিয়ে দূর পাল্লার কামান বসিয়ে নিজের দেশ রক্ষা করেছে, তার ওপারে জার্মানরাও “সিগফ্রি” লাইন বানিয়ে ওঁত পেতে বসে আছে। ছোট ছোট সমুদ্র পারের দেশগুলো মায়ের অঞ্চল ধরে অসহায় ভাবে সম্ভাব্য

বিশ্ববের পথে

[illegible]

ভাষ্যানী নিশ্চঃ প্রাক্রমণেব সক্ষাস্থা তেনৈ সোভিহং
দর্শ মিজেব সামান্যক পশুত বন্যমান পাটেই বাপে ভাষ্যানাব
সামান্যক পাদক্ষেপেব সাজ্ঞানজেন পাদক্ষেপেব তাল
নেবেহো। প্রাপ্তে সাগরব্য ব লটিকু মাএ .পনিয়ৈ নবেছে
সমুদ্রেব মেঘনা। .প্রাপ্তি ই লং দেশ - বচনা নবেছে, আধুনিক
ভাগে। বাণিজ্য ও উপনিবেশের = হাস পৃথিবীর প্রায় হতে
পালে, বানিয়েছে আধুনিক গণ-প্র নিজেব দেশের মাটির ওপর -
শস্যদেব স্বা পূনের বি'নময়ে। তার বিবাট ও বিস্তৃত সাম্রাজ্য
বক্ষাব প্রশ্নেব সঙ্গে নিজেব দেশের আত্মবক্ষাব প্রশ্ন জড়িত। জার্মান
সামরিক শক্তি কুলোগ এখনও সে দুর্বল, তাই দেশের গণ হস্তেব
মনব প্রতিবাদ প্রধান মন্ত্রী চ্যাথোরলে'নেব ,তাষণ নীতির বিরুদ্ধে।
অতলাস্টিক পাব হয়ে রয়েছে স্বাধীন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

বিপ্লবের গথ

সম্পদে, বৈভবে ও দক্ষতায় সে সবার শীর্ষে। গণতন্ত্রের পূজারী বলে পরিচিত জর্জ ওয়াশিংটনের দেশে প্রতিক্রিয়াশীল অথবা এক নায়কত্বের কোনও দল তখনও আমেরিকানদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকার শক্তি ও সম্পদ হিটলারের ভ্রাসের কারণ।

দূর প্রাচ্যে জাপান একক শক্তি। সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকায় চীনের ওপর দৌরাণ্য করে নিজেব সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে, অপেক্ষা করছে নতুন কোনও সুযোগের আশায়। মেঘ যত জমবে, জাপানের প্রাচ্যে ভূমিকা তত সহজ ও স্বাধীন হবে—তাই সে সুচতুর ভাবে রাষ্ট্র গগনেব প্রতি লক্ষ্য রাখছে।

জার্মান সামরিক শক্তির পুনরুত্থানের সাথে সমগ্র ছনিয়ার শক্তি পরীক্ষা অনিবার্য ভাবে এগিয়ে এসেছে। পরাধীন দেশ সমূহের আন্তরিক কামনা, যেন শত্রুর হাতে তার শাসক শক্তির পরাজয় ঘটে। পরাধীনতার শ্রানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য শাসকের দুঃমনেব সাথে মনের মিল সহজেই এসে যায়—ইংরেজের দুঃমন আমাদের বন্ধু, ইংরেজের বন্ধু আমাদের দুঃমন। পরাধীন জাতির মনের ছক্ ইতিহাস এইভাবেই রচিত করেছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সাল হিটলার ঝাঁপিয়ে পড়লো ক্ষুদ্র পোলাণ্ডেব ওপর। সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়া পূর্ব-পোলাণ্ডে তার বাহিনী পাঠিয়ে দিল। পোলাণ্ড ভাগ হয়ে গেল।

এবার বিজয়ী জার্মানী পশ্চিমে মুখ ফিরিয়ে ফরাসী দেশের দেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—বিদ্রোহ আক্রমণে ফরাসী ও ব্রিটিশ বাহিনী ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ফরাসী দেশ জার্মানীর পদানত

বিপ্লবের পথে

হলো। ইংবেজ চব্বি বিপ্লবের সম্মুখীন হলো। ১৯৩৩ খ্রীঃ
ভাবভেব সঙ্গে বোঝা পড়া কলো না। যুদ্ধের পর ১৯৩৩
চললো নুন নুন বাই গমে যুদ্ধের পর ১৯৩৩ খ্রীঃ
স্বার্থের প্রয়োজনে স্বার্থশীল গাংগুী ১৯৩৩ খ্রীঃ
বাই মোভিয়েংএব সাথে শ্রী নিভাগে, কাব গুরুশাক ১৯৩৩
হাত মিলিয়েছে জামান, হাতা ১৯৩৩ খ্রীঃ
গুলি কেউ এদিক কেউ বা উদে গমে লাভলো। ১৯৩৩
বিচারের সঙ্গে জাতীয় স্বার্থে বোঝা পড়া ১৯৩৩
পরামর্শ ১৯৩৩ ইংবেজ সাম্রাজ্য ১৯৩৩, বে ১৯৩৩
আকাশায় অক্ষ-শক্তির জয়ছে নিভেদের হাতে সমস্ত
কলো। মোভিয়েং দেশে পাকি মহাশক্তি ১৯৩৩
মিত্রপক্ষীয় লড়াইকে বিনা সার্ভে সাহায্যেব দখা স্বাধীন
জাতীয়তাবাদী ভারতের মনে ১৯৩৩ সপক্ষ ১৯৩৩
জাতিব মনে বৈব, ভাব গুটি ১৯৩৩। ১৯৩৩ ইংবেজ
আবার একদফা আঘাত ১৯৩৩। ১৯৩৩ জাতীয়তাবাদী
নেতা ও কর্মীরা গ্রেপ্তার হলো। ১৯৩৩ ১৯৩৩, বুদ্ধি ১৯৩৩
সমর্থনবান বদল আবে ইংবেজ ঘনোয়া সমর্থনবান
ধবে ইংবেজ শাসনব তলায় নিভেদের জামান ১৯৩৩
প্রতিকূলতায় গড়ে তুলেছে।

জেলের ভিতরও মাঝে মাঝে যুদ্ধের পিচম পাওয়া যাচ্ছে।
“সাইরেন” বাজার সাথে সাথে আমাদেরও ডিগ্রী ভিতর প্রবেশ
কবতে হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়ান একজন সাংবাদিককে ভাবভেব
পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ধরে নিয়ে এলো—সে নাকি উটের পিঠে চড়ে

ବିପ୍ଳବର ମାଥେ

[illegible][illegible][illegible]

বিপ্লবের পথে

জাপান যুদ্ধে যোগ দেবার পর পঞ্চ সমুদ্র বাপী সমরানল পৃথিবীকে ঘেন ঘিরে ফেলল। এই অনলের মাঝখানে অতুণীনাথক সুভাষচন্দ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে ভাব-ত্যাগ করতে সমর্থ হলেন। সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের আনন্দ সাবাদটুকু পরিবেশন করলেন, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জেলখানার সমস্ত গ্রানিবোধ ঘেন আনন্দের উচ্ছ্বাসে ধুয়ে মুছে গেলো। সুভাষচন্দ্র দীর্ঘ জীবিত হয়ে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে সহ্য করুক, এই বাণী উথিত হলো। অশ্রুপূর্ণ অতুণীনাথ পদেদশ হতে—কোটি কোটি জননাধারণের শুভেচ্ছার সঙ্গে আমাদের অতুণীর বাণীও ঘেন মিলিত হয় সুভাষচন্দ্রের জয়যাত্রার মঙ্গল পথে।

ইতিমধ্যে যুদ্ধে নিরপেক্ষের অবনতির কথা বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ আলিপুর জেল থেকে আমাদের সবাইকে ঢাকা জেলে পাঠিয়ে দিল। কেন পাঠানো, তা জানতে না পারলেও অতুণীনাথ মনে হলো যে কলকাতা সহরকে তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ মনে করছে না। ওদের ভাবনা, যদি কলকাতা সহর শত্রুর আক্রমণের স্বলে হাত ছাড়া হয়ে যায় তবে বিপ্লবী বন্দীরা তো জেল থেকে সদর রাস্তার পড়ে শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওদেরই ঠেঙাতে সক্ষম করবে।

পূর্বেই বলেছি, থাঁকায় বন্দী পাঠার মত আমাদের জীবন যাত্রা শুরু হয়েছে—বিনা বিচারে রাজবন্দীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে বিশেষ পার্থক্য আর নেই। অল্পসময় দিনগুলি গল্প শুভবে, খেলাধুলায় বা পড়াশুনার কেটে যেতো। যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করা ছিলো, আমাদের অন্যতম প্রধান বিষয়। গান্ধীজির “ভারত

বিপ্লবের গণ

চাডো” আন্দোলনের সাথে স্ভাষ চন্দ্রের বন্দীভাবিতবদিয়ে ভারত আক্রমণের প্রচেষ্টা বাইরে প্রবল গণ-আন্দোলন ও উৎসাহের সৃষ্টি করেছে—আন্দোনের উচ্ছ্বাস জেলের পাঁচি ডাঙ্গিয়ে ভিতবে ও প্রবেশ করেছে। সাবা জেলময় প্রবল উদ্বেজনা। মানসচক্ষে দেখতে পেলাম, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের মত ‘বাক্তাব’ সিংহাসন যেন তাপের খেলা ঘরের মত জনগণের দুর্জয় অগ্রগতির সামনে ধুলিসাৎ হ’তে চলেছে। “*Le Etat Moi*”—I am the state—আমিই রাষ্ট্র, আমিই সব, এই দ্বৈচ্ছাচার তত্ত্বের বিকল্পে আবাব নৃত্যন কবে ভাবের শক্তির লড়াই চলেছে। জনগণের ক্রুদ্ধ গর্জনের শোন কোথায়ও রেল ভেঙ্গে, কোথায়ও রেল উপড়িয়ে কোথায়ও গশঙ্গ বাহিনীকে আক্রমণ কবে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘোষণা করেছে। শত শত অজানা ও অচেনা শহীদের তাজা রক্তে ভারতের মাটি সিক্ত হচ্ছে। উন্নত ইংরেজ মিতিলিয়ান, তাব মাক্সমাক্স ও বুদ্ধিজীবী সহায়তাকাবী দল জনগণের এই প্রবল উচ্ছ্বাস ও স্ভাষচন্দ্রের ভাবত সীমান্ত পাব হয়ে ভারতে প্রবেশ কথবার জন্য স্তূনা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। যুদ্ধের প্রহোড়নে যেমনি, যুদ্ধের অপয়োজনেও যেমনি দেশের শস্ত্রভাণ্ডার গুট ববে, দেশ ও জাতির নৈতিক চরিত্র বিনাশ কবে ভারত ভূমিকে বিশেষ করে বাঙলা দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে—শ্মশানের প্রজ্বলিত বহির লেলিহান শিখা উচ্চ গগনে দেখা যাচ্ছে—ওপারে নাতার ক্রন্দন, পিতার শোক, পত্নীর বিচ্ছেদ শ্মশানকে ঘিরে যুদ্ধের আসল বাস্তব যুদ্ধের আসল প্রকৃতির পরিচয় দিচ্ছে।—এই মহাশ্মশানে সাম্রাজ্যবাদী কাপাটিকের দল ভারতের নবযুগের ওপর সাম্রাজ্য সাধনার রত, সঙ্গে বয়েছে শ্মশান শৃগাল ও কুকুরের দল।

বিপ্লবের পথে

বিপর্য্যয়ে উন্মত্ত ইংবেজ বংগপুত্র শাসনের অসুস্থগুলির নির্বিচার ব্যবহারের ক্ষমতা দিয়েছে। জলান গুটিকয়েক টপেজ সাহেবদের ওপর তাদের কাছে শাসন শাখা চালাবার জন্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত বা বুনোদের মধ্যে এখন আর পার্থক্য নেই। ঢাকা জেলে তখন সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলো, নোবল সাহেব। জেলের ভিতরকার কক্ষল ফ্যান্টাইম পূর্ণ। ম্যানেজার ও ডপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট বসে পবিচত নোবল সাহেব খাস যোগা হংবেজের যুদ্ধজনিত অভাবে সুপারিন্টেন্ডেন্টের পদ অধিকৃত করে আছে। ১৯৩০ সালের বক্সা ক্যাম্পের সহকর্মীরা গুডেট ও শিক্ষানবিশ আই, সি, এস, লিলুয়ান সাহেব এখন সেখানে বুনো জলা-মাজিষ্ট্রেট।

ঢাকা জেলে বন্দী । ১ . ০ টি ডাবল শাব্দে গাড়ে। বিনা বিচারে বাদবন্দীরা জেলের ওপর শাসন করে। কবেছি জেলের অর্থ এক অর্থ দলের নথি রাখা যায় পাড়িয়ে-যেছে। সভাপতি আহ্মদগানের বন্দীরা গার সাংগে বন্দীদের দল। যুদ্ধের গাতবেগ বাড়বার সাথে সাথে বন্দীরা বচাবে বাজনারওক বন্দীদের সংখ্যা। যেমন বাড়বে। গারগো, . ০ মনি স্বভাব-ভরত বলে পবিচিতদের ও জেলের মধ্যে পূর্বে রাখা হলো। তাদের সংখ্যা কম ছিলো—ঢাকা ডেপুটি-কমিশনার চাব-পাশের মত হবে। বাজবন্দী বন্ধুদের সংগে একটি ব্যাপারে গারগো স্থান নির্দিষ্ট ছিলো। আমাদের এখান থেকে তাদের ব্যাপারের দ্বিতীয় কামরাটি দেখা যেতো। বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার তাৎপর্য বা অর্থের সঙ্গে অপরিচিত এরা শুধু জানতো। সীমাবদ্ধ জেলের মেয়াদ, আর

বিপ্লবের পথে

মেসাদ অশ্রু খালাস হয়ে আবার কোনও অপবাসমূলক অনুষ্ঠানেব জগু জেলে আগমন। চির-শাস্তি গান পশ্চব পবিবর্তন তাঁরা পছন্দ করেনি। নতুন ধীবন যাত্রায় এনভ্যস্ত এত সব সাধারণ কষেদী দাবী উঠলো যেন। বনা বিচারে গাটক বাজবন্দীদের মত তাদেবও সুযোগ স্মাবনাগ্ধা দেওয়া হবে— না হ'লে তাঁরা “অঘটন” ঘটাবে। বাঙালি সজে অঘটন ঘটাবার ক্ষমতা বা নিজেদেব উচ্চাচিত কথাগুলোব তাৎপৰ্য্য তাদেব শিক্ষিত মনে বোঝবাব ক্ষমতা ছিলনা। একথা সত্যি, বাউদেব জনতাব সর্বোষ গজ্জন বা ইংবেজ বাঙালিবিব বিনায়মান নক তাদেব অবুঝ দাবীকে উৎসাহ জুগিয়েছে কিন “কম্বলী”—নবল এল বুনো মনে এদেব দাবীও জাগালো জীঘাংসাব মনোবৃত্তি তাদেব সমাচিত শিক্ষা দেবাব হৃদম অভিলাষ। গুটি কয়েক মনোপীযানএব সম্মিলিত সভাগ রাত্রিব বৈঠকে কপালী মনোভেদেব মনোবৃত্তি শিক্ষা দেবাব ব্যবস্থা, যেন তাঁব প্রভাবে জেলেব আভাষবাণ। বজ্রোত চিবতবে বন্ধ হ'তে পারে।

পবেব দিন অতি প্রত্যয়ে বেড়াবাগ সময় মনে হলো যেন আমাদের প্রাচীণ-যেবা আজিনাব প্রহ্লাদেব মধ্যে আত্ম সতর্ক ও সাবধানী তাঁর—চঞ্চল পদক্ষেপে পাচাঁবি কববাব সাথে তাদেব দৃষ্টি বয়েছে আজিনাব বাসবে। আজিনাব বদ দবজাব গায়ে সিপাহীদেব দেখবাব জগু য এটি এক ছিদ্রপথ বয়েছে সেখান থেকে কি যেন সঙ্কেতব প্রত্যাফায় মুহূর্মুহঃ তাঁরা বাউবে দৃষ্টিপাত কবছে। তখনও দিনেব আলো বাতেব অন্ধকাবকে সম্পূর্ণ দূর কবে দেয়ান বডপ্রাচীবেব ওপাবে সিপাহীদেব ব্যাবাক

বিপ্লবের পথে

থেকে সেসে আসছে, সিপাহী সনাতনদের পক্ষক্ষেপ আর বহুসংখ্যক বাইফেল জমায়েৎ করবার ‘ঝানাং-ঝানাং’ শব্দ। অজানা আশঙ্কায় মনটা ভাবা হয়ে উঠে। ডাঃমা কললাম, প্রহরানও সিপাহীদের ব্যাবাবে চাঞ্চল্যের কাব্য। আত্ম সংক্ষেপে তারা জবাব দিল – “আভিহ মালুম হো জাংগা”। বলবাব সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল জেলের ভিতরকার বড় গোট গালবাব আওয়াজ আর দলে দলে সিপাহীদের “মার্চ” এবং “চাব-ব-শব্দ, এবাব সারবজ্জ ভাবে সাম এক কায়দায় দাঁড়াবাব নির্দেশ এবং সাথে সাথে সামরিক লকুম “Fire,” গুলি বনে। গজ্জ উঠলো, বাগফের গুলি স্বপাব-ছুর্গ বনে পবিচিত বন্দীদের ব্যারাকে দিকে। ভোবেব শাস্ত্র প্রকৃত ধুম থেকে মাচ মকাজেগে উঠলো। জাগলো, আতঙ্কিত সহববাসী। আশঙ্কা – বন্দী ভারতেব বন্ধন-মুক্তি কামনাব বন্দীদের নিশ্চিত হত্যা নয়তো।

বিবামহীন গুলি চলেছে, গুলির পচও ধ্বংসলীলা প্রতিটি মান্নেবে জীবন গুণে গুণে নিক্ষেপ, ব্যাবাবে ইমাবতগুলির ইট যেন খসে পড়ছে, লৌহ-গবাদের শব্দগুলি গুলিব প্রচণ্ড ঘর্ষণে অগ্নি-ফল্গু দিবে হানকাবাদের কানিয়ে দিচ্ছে—লক্ষ্য ঠিক হয়নি, আবাব গুলি চলে। গুলিব বাক্সগুলির গুলি ফুবিযে গেছে আবাব বাস্তু এলো – বিবামহীন অজস্র গুলি-বর্ষণ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মত। বাকদের শোয়া ভবে দিল জেলের আকাশটুকু, বাকদের গন্ধ আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বাতাস। আমাদের অসহায় দর্শকের মত বেঁধে রেখে সরবারী ছুর্গুকাবাব দল তাদের অভিল্য পূরণ কবছে। গুলি বন্ধ

বিপ্লবের গথ

হলো। সিপাহীরা এগেে ঢালো, স্বভাব দুর্বৃত্ত বন্দীদের
বাবারকর দিনে মনে স্মরণে এক কল্পার জগত। আবাব গর্জে
উঠলো বাতাসে— এক—মদে। স্ত্রী ও ভাষা যাণ লুকিয়ে
আত্মবক্ষা করাছলো এবান শায়েন স্থলি কবছে শান যাবা
নর্দমাৰ শিতন না গাছ চায়ে আত্মবক্ষা কবছিলো তাদেরও হত্যা
কবছে। তবুও মন সীমা মাৰ শো হলোনা। বাঁশেব শক্ত লাঠি
মৃত ও অর্দ্ধমৃত। অপোপে পড়ে মৃক হলো। এবাব ডাক্তার
এলো—মৃত্যু মিশ্রিত সাজে, ফসার সাহেব। শোনা যায়
তাকে দেখে ছ'খকন মন কান গায়েন ওলায় পাণ বাঁচাবাব
আকুল আবেদন নিয়ে লুটিয়ে পড়ে, তাদেরও মেথানে সঙ্গে
সঙ্গে স্থলি বনে গা এবা হাযছে।

দুর্গাব প' শিব। এগেে ঢেয়ে বাত প্রতিনিধি সাব দাবানল।
নিঃশব্দ শাশায়েন গাঙাখা না। আমবা বসে বইলাম। এবা
দশটাব সময় কালোব মক। বে আমাদেব এবা থেবে ছ'জন
পাতানদি-গণেশ। প্র সাব লেখা-- ডেকে পাঠালো।
অগ্রাণ সকা একুদে সঙ্গ পানামর্শ কবে আমবা সেখানে
গেলাম—নাবা সাহেব স্থলি ববাব কানগ জানাবাব জগুই
আমাদেব ডেকে নিফে গায়েছে। মিন সাত লক্ষ জাতাব একটি
ডাঙা দেখিবে আমাদেব বাগাবান স্টা কবলো, য ঐ লোহার
ডাঙাব সাহায্যে নাব স্বভাব দুর্বৃত্ত কবেদো তাকে খুন কববাব
জগু তেডে এসেছিবে। হাই অ'গ্নবক্ষার্থে ও জেলে শৃঙ্খলা
বক্ষাব জগু এবা স্থলি চান্দে ব'ধা হযেছে।

নোবল সাহেব বলবাব সময় টোবলোন ওপব উপুড় হযে

বিপ্লবের পাত

যুদ্ধের গতি ফিবেতে শুরু করেছে। বর্মী পার হয়ে ইক্ষলের উপত্যকা হয়ে নেতাজী সুভাষ সৈন্য সহ ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। অক্ষয়কিন্দ্র আন্দোলন পবাজয়ের মুখে মিত্র শক্তির আক্রমণ ছলনা হয়ে গেল। অশ্রুস্রব হচ্ছে। এসোলিনী পলাতক অবস্থায় চলছেন। হাতে বন্দী হয়ে নির্ভর হত্যার দায়ে নির্ভরতম ভাবে পান হাবালো। গোয়েবেলস্ জী, পুত্র ও কন্যাসহ আশ্রয় নিয়েছেন। হিটলার ভগ্নে ভিতর নিজেকে নিশেষ করেছে কিভাবে তা সঠিক কেউ জানেনা। জাপান নবাবিস্কৃত এটম বোমার আক্রমণে প্রচণ্ডতম ধ্বংস-লীলার সম্মুখীন। মিত্রপক্ষে দাবী—তয় বিনা সর্ভে আত্মসমর্পন নতুবা এটম বোমার পরশ লালায় সমগ্র জাতি পৃথিবী হতে বিলুপ্তি। দুটি সহবকে সমগ্র অধবাসীসহ সম্পণ্ণ নিশ্চিহ্ন হবে দিয়েই তবে মিত্র শক্তি জাপানকে দিয়ে বিনা সর্ভে আত্মসমর্পনের দাবী জানিয়েছে। জাপান ও নিকোয়ায় হয়ে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে।

ভারতের মানচিত্রে ইংরেজ রাজ-পুরুষদের বিভিন্ন পবিকল্পনা এসে দেখা দিতে লাগলো। ইংলেব মন্ত্রীসভা যুদ্ধের চাপে একক বক্ষণশীলের মন্ত্রীসভা থেকে প্রমিক হয়ে বসে মিলে জাতীয় মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়েছে। গ্রামব দল ও ব্রিটিশ জনসাধবণের চাপে নতুন শাসনতন্ত্র বচনান প্রয়াস চলেছে। কংগ্রেস ও মোস্লেম নেতবর্গের সাথে এ বিষয় দীর্ঘ আলোচনাও শুরু হয়েছে। মোল্লেম-লীগ পরিচালিত সাম্প্রদায়িক নেতবর্গ কৌশলী জিন্নাব নেতৃত্বে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ। কংগ্রেস

বিপ্লবের পথে

নেতৃত্বের সঙ্গে বৃটিশের আপোষ আন্দোলনের সুযোগে দ্বি-জাতি
তত্ত্বের ওপর ভাবতর্কে দ্বি-জাতিত্ব বর্জন-চাবত্ব প্রপাতিস্থান
বাহু স্থাপন করবে প্রয়াস—খাতিয়া-চাবত্ব বৃটিশ বক্ষণশীল
স্বার্থের অন্তকূল স গায়ে আঁচলে নবমপন্থা কথ্যসীবা
খণ্ডিত ভাবে নিভেদেব শ্রেণে প্রাণ লেগে আপোষ করতে
রাজী। মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসর্গে করে শিল্পী ভাব হয়ে
আছে—বাংলা স্বর্ণমেন্ট গায়েব শায়ে সুদৃঢ় ও কোশলী
স্ববাধি, প্রধান মন্ত্রী।

আমরা মুক্তিয জ্ঞাত আবার অংশন শুরু করবো, ঠিক করছি।
১৯৪৬ সালের ৩১শে আশ্বিনে মধ্যে যাক না পেলে
অনশন করবো একথা সব গণকে জানা জ্ঞানিয়ে দিবেছি।
কম্যুনিষ্ট পার্টির একটি খবরে জানা গেলো মুক্তি-সংগঠন প্রাদেশিক
কমিটির অধিকাংশ সভ্যই শুধু দেবার অংশী ওকালত করে
জনকে কেউ কেউ মুক্তি দিতে চান। শান্তি, শান্তি ও
সীতানাথ দেবার এ চিন্তা করে মনে ছিলো। যা হোক
আমাদের অধিকাংশই অনশনের জন্য তৈরি হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে জিন্না-পারমাণব বোম্বার্ডিং-কালক ভায়া সব হয়ে
গেলো—অথচ ভাবতের চুক্তিপত্রের তাত থেবে যাচবার জ্ঞাত
হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা অপরিহার্য। বাপে প্রযোজন। এই
হত্যাকাণ্ডে সহস্র সহস্র হিন্দু-বনাবী নিধিচায়ে জবাই হবার
পর অথচ ভাবতে বিশ্বাসী শিষ্টাচার হিন্দু নন্দনাবী বিকল্প
হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠলো। বণবাতাব বাস্তবায়ন শবের সূত্রে

বিপ্লবের গাথ

পূর্ণ হলো—অগ্নি, তত্ব্যাকাণ্ড, লুট ও ধ্বংসের নাবিকীয় ব্যাভিচাবেব নিষ্ঠুরতম অভিময়। পূর্ব বাংলায় হিন্দুৰ জবাই যেমন নিবিচানে চললো, তেমনই ভারতের অন্যান্য জায়গায় মুসলমানদেব ও জবাই চললো। পূর্ব বাংলাৰ জবাব দল - বিহাব বিহাব শবীফে। ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়াৰ যেন শেষ নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিশ্বস্ত জাতিব মনের ভিত্তব বৃহৎ ফাটল ধললো। এক অথণ্ড ভারতীয় জাতিকে দুই জাতিতে পাবিত কৰা সহজ হলো—সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাবা জযী হলো।

কলকাতায় দাঙ্গাব প্রথম বক শেষ হয়েচে। জাতিব বৃকে গভীর ক্ষত চিহ্নগুলি সাম্প্রদায়িক ঈর্ষানল জ্বালিয়ে বেখেচে। শ্মশান প্রেতগুলি শানিত ছুঁবনা হাতে অসহায় নব নারীৰ ওপব অশুভ দৃষ্টিপাত নিয়ে নতন বনে দোবায় স্কক বববার জন্ম দাঁড়িয়ে। সমাৎ ও মনে। এহঁ ধ্বংস-স্তুপেৰ ওপব সুনাবদি মন্ত্রীসভা আমাদেব মুক্তিৰ আদেব দায়েচে। আবেগহীন পদক্ষেপে আমবা বন্দীশালান বাইনে এসে দাড়ালাম। আমাদেব সঙ্গে এলোনা, একমাএ দনাউপুবেব নবন্তে চন্দ্র ঘোষ। সবকারী মুক্তি নামাগুলি লিখবাব সময় নবন্তে চন্দ্র ঘোষেব নাম উল্লেখ না থাকায় মুক্তি পেতে তান প্রাব দু'মাস দেবী হয়ে গিয়েছিল। বাইবেব ধ্বংসলাগাব মাঝে দু'চাব জন বন্ধু আমাদেব নেবাব জন্ম দাঁড়িয়ে আছেন, বৃবেব স্কক জনাব জটলা। পিছনে বেখে এলাম—চিবতবে তাঁদেব যারা ফাঁস র মধ্যে জাতিৰ মুক্ত সাধনায় অকাতবে প্রাণ বিলিয়ে দয়েছেন বা যাবা বন্দীশালায় বোগে বা পীডনে প্রাণাদতে বাধ্য হয়েছেন।

বিপ্লবের পথে

আর যায গেল, আশুপ্রাদোষক মানন্য তবণ
বিপ্লবী অমিয় পাল যাকে মস্তক বিকশিত কর
বাঁচিতে পারিয়ে
দিয়েছিল (আরও তাকে নানি নেবার কথা কেউ আবেদন
করেনি)। যাবা মুক্তি পেলো, আমলাসহ তাদেব নাম—

১। মেজুস, বাচাব বোমান মামল — শচীন কনুপ্ত।

২। চট্টগ্রাম অস্বাধীন লুপ্ত মামলা — লোকনাথ বসু, নরেশ গোস্ব,
অনন্ত সিং, অধিকা চক্রবর্তী, নারায়ণ সেন, নারায়ণ সিং, নারায়ণ
গুপ্ত সন্দেহাবস্থা দণ্ডিত, স্ববোধ চৌধুরী।

৩। ভালহাটসী স্বেচ্ছা বোমান মামলা — ডঃ ভূপাল বসু।

৪। চৌধুরী মামল — বিজয় দাসগুপ্ত।

৫। বাজু হত্যা মামলা — নরেন্দ্রনাথ সিং, বামণ্ডা ঘোষ, শ্যামলা
সেনগুপ্ত।

৬। বিপ্লবী গুটি মামলা — নরেন্দ্রনাথ বসু।

৭। হিজলী মামলা — প্রণব চক্রবর্তী অধিকা চক্রবর্তী,
প্রমথ নাথ, নরেন্দ্র বসু, অধিকা নরেন্দ্র, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেন্দ্র
ব্যানাজি।

৮। চবপাড ডাকাতি মামলা — সত্যকম ঘোষ, নরেন্দ্র সেন
ঘোষ।

৯। প্রাসারি গুটি মামলা — বিনয় বায়।

১০। আহসান উল্লাহ মামলা — হবিপদ ভট্টাচার্য।

১১। চাঁদপুর ইলাপক্ট মামলা — বালী চক্রবর্তী।

১২। কর্ণওয়ালিস গুটি মামলা — ডঃ নরেন্দ্র নাথ, নরেন্দ্র দাস।

১৩। মিজা ডাকাতি মামলা — বালী দাস, নরেন্দ্র, নরেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেন্দ্র
পতিভূষণ।

বিপ্লবের গথে

১৪। বড়বাক্সার ডাকাতি ও হত্যা মামলা—সুবোধ চন্দ্র দাস।

১৫। ইটাখোলা ডাকাতি ও হত্যা মামলা—বিনোদ দেব।

১৬। বিশ্বাসঘাতক পাটি সভা ও পুনঃ ৮৮ হীবালাল চক্রবর্তী
হত্যা মামলা—অমূল্য বায় ও পবেশ সেন।

১৭। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অতিবিক্ত মামলা—বিনোদ দত্ত,
হিমাংশু ভৌমিক।

১৮। গবর্নর গুটিং মামলা—(লেবং, দার্জিলিং) মধু ব্যানার্জি,
মনোরঞ্জন বানার্জি, স্বকুমার ঘোষ।

১৯। বার্ক হত্যা অতিবিক্ত মামলা—শান্তি সেন।

২০। ওয়াটসন গুটিং মামলা—শ্রীল চ্যাটার্জি, প্রমোদ বসু।

২১। দিনাজপুর ডাকাতি ৭ অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা - নবেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

২২। উত্তর-বঙ্গ সড়ক মামলা ও ডাকাতি—হেমচন্দ্র বক্সী, জ্ঞান
গুপ্ত।

২৩। ফরিদপুর গোয়েন্দা হত্যা মামলা—অমূল্য চৌধুরী, আশু
ভরদ্বাজ।

২৪। দাশপুর দারোগা হত্যা মামলা—কানন গোস্বামী, মুগেন
ভট্টাচার্য, বিনোদ বেরা, ভূতনাথ মায়।

২৫। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা—প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন
গুপ্ত, নরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, ধীরেন ভট্টাচার্য, বতীন চক্রবর্তী, পরেশ গুহ,
সত্যেন মজুমদার, দ্বিজেন তলাপাত্র, সুরেন ধর চৌধুরী, জ্যোতিষ
মজুমদার, নিবন্ধন ঘোষাল, হরিপদ দে, অমূল্য সেন, সীতানাথ দে,
পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, বিমল ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র চৌধুরী।

২৬। টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা—প্রীত্বর্জন পূর্বকার্থ, পূর্ণানন্দ
দাশগুপ্ত, প্রফুল্ল সেন, নিবন্ধন ঘোষাল, আশু-বিনোদ পাল, ধীরেন্দ্র মুখার্জি,
জীবন ধূপী,।

বিপ্লবের পথে

- ২৭। কলকাতা ডিনামাইট প্রাপ্তি মামলা—খোঃগদ্দ বখাঈজি।
- ২৮। কলকাতা অস্ত্র প্রাপ্তি মামলা—বাধাবল্লভ গোস্বামী।
- ২৯। চট্টগ্রাম বাথুয়া ডাকাতি মামলা—২২ ফর চক্রবর্তী, ১৯২৮ চক্রবর্তী।
- ৩০। বাঁকুড়া ষড়যন্ত্র মামলা—প্রাণ গোপাল মুখার্জি, বং ও দণ্ড।
- ৩১। কুড়িগ্রাম অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—পূঃশঙ্কু গুহ।
- ৩২। কুমিল্লা অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—ঈশ্বরেন চন্দ্রবর্তী।
- ৩৩। হুগলী অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—হাবন্দ চৌধুরী।
- ৩৪। বাঁকুড়া অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—বিমল গণপার, ২১৩০।
- কর্মকাব।
- ৩৫। চরমুণ্ডবিয়া ডাকাতি ও হত্যা মামলা—ঈশ্বরেন বং।
- ৩৬। আজাবিয়া ডাকাতি—মদন বায় চৌধুরী।
- ৩৭। কুমিল্লা অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা—অমৃতেশ্বর মুখার্জি।
- ৩৮। মাদাবৌপু ডাকাতি মামলা—অমৃতেশ্বর চ্যাটার্জি।
- ৩৯। কুড়িগ্রাম ডাকাতি মামলা—কুমুদ মুখার্জি, বাঃমোহন করঞ্জাই, নরেন দাস।

যারা কারাগারে রোগ বা পীড়নের ফলে প্রাণ দিলো—

যন্ত্রারোগে—

- ১। ফকীর্নগর নন্দী - চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা।
- ২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য—আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।
- ৩। মোহিত অধিকারী—অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলা (বিদ্যাব)।
- ৪। বামরুক্ষ দে—সূর্য সেনকে আশ্রয় দেবার মামলা।

যারা অনশনে প্রাণ দিলো—

- ১। হবেন্দ্র মুন্সী—ঢাকা জেল।
- ২। মহাবীর সিং—আন্দামান জেল।

বিপ্লবের গাথ

৩। মোহিত মৈত্র - আন্দামান জেল।

৪। মোহন দাস—আন্দামান জেল।

যার মৃত্যুর কারণ আজও জানা যায় নি -

১। দীনেশ ভট্টাচার্য।

যে পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ হারালো—

১। আনল দাস (ঢাকা জে ৭, ১৭ই জুন ১৯৩২)।

জাতির মুক্তি সাধনায় যারা কঁাসীর মধ্যে অকাতরে প্রাণ
বিলিয়ে দিলো—

১। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা—সুর্গ্য সেন, তাবকেশ্বর দাতিদাব।

২। কলকাতা কংগ্রেসালিস ষ্ট্রীট গাউং মামলা—দীনেশ মজুমদার।

৩। ম্যাজিস্ট্রেট ডায়াস হত্য। মামলা (মেদিনীপুর)—প্রজ্ঞাৎ
ভট্টাচার্য।

৪। ম্যাজিস্ট্রেট বাক্ত হত্য। মামলা (মেদিনীপুর)—ব্রজকিশোর
চক্রবর্তী, বামকৃষ্ণ বায়, নিম্মল জীবন লোষ।

৫। কাব্যাক্ষ মিস্যাসন হত্য। মামলা (রাইটার্স' বিল্ডিং, কলকাতা।)
—বিনয় বসু, স্ববীৰ গুপ্ত (বাদল), দীনেশ গুপ্ত

৬। গবনর গুটিং মামলা (লেবং, দার্জিলিং)—ভবানী ভট্টাচার্য।

৭। ঢাবাব ভেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাখ্যা সেন হত্য। মামলা—
কালীপদ মুখার্জি।

৮। ফরিদপুর চরমুগুরিয়া ডাকাতি ও হত্য। মামলা—মনোবজ্ঞন
ভট্টাচার্য।

৯। চাঁদপুর ইন্সপেক্টর হত্য। মামলা—বামকৃষ্ণ বিশ্বাস।

১০। ঢাকা গ্রাম পঞ্চীদের হুলি ও হত্য। মামলা - মতিলাল মল্লিক।

১১। দাবোং হত্য। মামলা—রোহিনী বড়ুয়া।

১২। ঝাঁকোলা ডাকাতি ও হত্য। মামলা—আনন্ড ভট্টাচার্য।

শুদ্ধিপত্র

- ৪০ পৃষ্ঠা—৭ লাইনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্থলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।
- ৫১ পৃষ্ঠা—১৬ লাইনে শ্রীপবেশ গুহের স্থলে শ্রী পবন দাশ গুপ্ত।
- ৫১ পৃষ্ঠা—১৪ লাইনে দলের নির্দেশ মত তিনিব জাতিয়ায় তিনি এদা
পরেশ চন্দ্র গুহ।
- ৬২ পৃষ্ঠা—২ লাইনে কোটাস স্থলে কোটাম।
- ৬৫ পৃষ্ঠা—৩ লাইনে হেলান দেওয়া স্থলে হেলান দেওয়া।
- ৭৩ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে শান্তি স্থলে শান্তি।
- ৭২ পৃষ্ঠা—১০ লাইনে কতুন স্থলে কতুন।
- ৮১ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে ভোলা বাস ও শ্রী দে স্থলে ভোলা বাস ও
চবপাড়। মামলায় দাঁড়ত শ্রীভূষণ চট্টাচার্য।
- ৮১ পৃষ্ঠা—১৪ লাইনে সাংগে স্থলে পাঁচ।
- ৮৭ পৃষ্ঠা—২ লাইনে সাত বছরের স্থলে পাঁচ বছরের।
- ১০২ পৃষ্ঠা—১২ লাইনে শেখব রত্ন, (এখন স্বর্গত স্থলে শেখব রত্ন
এখন স্বর্গত),।
- ১৪৬ পৃষ্ঠা—২ লাইনে সাত বৎসর স্থলে ২৫ বৎসর।
- ১৭১ পৃষ্ঠা—৭ লাইনে অজিত বসু নাম তিন ভাই পাঁচ বৎসরের দণ্ড
তালিকার মধ্যে থাকবে। সে অনেক পাবে এছবোটের বিচারে মুক্তি
পেয়েছিলো।
- ২০০ পৃষ্ঠা—১ম লাইনে টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা স্থলে টিটাগড় ষড়যন্ত্র।
- ২৪৩ পৃষ্ঠা—১৬ লাইনে “কে, সি” স্থলে “কে সি” (Cassey)।